দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে

দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে

আশাপূর্ণা দেবী

দৃশ্য
থেকে
দৃশ্যান্তরে

যবনিকা উত্তোলিত হলো একটি অস্পষ্ট ভোরের পটভূমিকায়। মঞ্চসজ্জা এই—একটি মোটামুটি চেহারার গেরস্থালী গড়নের দোতলা বাড়ির একতলার একখানা ঘর। সেকালের ধাঁচ, তাই বাড়ি যত গেরস্থালীই হোক, ঘরের মাপ ইঞ্চি মাপ. নয়। একালের হিসেবে বেশ বড়সড়ই। ওই ঘরে ঘরজোড়া চৌকির বিছানায় জনাকয়েক শুয়ে।

সেই কয়েকজনের মধ্যে থেকে হঠাৎ জেগে গিয়ে উঠে বসল সবচেয়ে ছোট্ট প্রাণীটা। না উঠে উপায়? তার ঘুম-জাগরণের মোহানার উপর যে ছড়িয়ে পড়ছে একটি দ্রুত উচ্চারিত শব্দছন্দ। সাধ্য কি যে আর শুয়ে থাকে?

ওর কাছে ওই শব্দছন্দটার নাম হচ্ছে 'জয় জয় গোবিন্দ!'...ঠাকুমা 'জয় জয় গোবিন্দ' করছেন!

তার মানে ঠাকুমা এখন গঙ্গা নাইতে বেরোচ্ছেন।

বেরোনো শব্দটাই তার কাছে দারুণ রোমাঞ্চকর। বেরোনো দেখলেই প্রাণের মধ্যে আহ্লাদের ঢেউ ওঠে। যেন কোথায় রয়েছে একটা অনন্ত রহস্যের পাথার, একটা অসীম বিস্ময়ের জগৎ, খুব আহ্লাদের, খুব ভাল লাগার কী যেন এক জায়গা এই বাড়ির চৌকাঠটা পার হয়ে বেরিয়ে পড়তে পারলেই পেয়ে যাওয়া যায় সেই সব নিধি।

এই ভাবে কি আর ভাবতে জানে ওই ক্ষুদ্র জীবটা? ভাবার ক্ষমতা জন্মেছে নাকি? যা কিছু ঢেউ ওঠে অনুভবের মধ্যে। সেখানেই আকুলি-বিকুলি, সেখানেই চাঞ্চল্য।

অতএব ঠাকুমার বেরোনোর সাড়া পাওয়ার পর তার আর শুয়ে থাকা অসম্ভব। এই আকুলি-বিকুলিটা বোধ করি কৌতূহল থেকেই। চেতনার প্রথম প্রেরণাই তো কৌতূহল। শিশুরা এই ব্যাধির শিকার।

অবশ্য কৌতূহলশূন্য শিশুরও অভাব নেই, থাকে তেমন শিশু। তবে এই যে ছোট্টটাকে দেখা যাচ্ছে এখন, এ একেবারে কৌতূহল-ব্যাধির মোক্ষম শিকার।

ঠাকুমার 'জয় জয় গোবিন্দ' যে তার ভোরবেলার সুখসুপ্তির ব্যাঘাত ঘটায়, সে তো ওই ব্যাধিটার প্রকোপও। উঠে বসে কান খাড়া করল, জানে এইবার 'খট' করে একটা শব্দ হবে। দরজার খিল খোলার শব্দ। আর সেই শব্দের পরই পুরনো শব্দছন্দ এগোতে থাকবে, 'নন্দের মন্দিরে কৃষ্ণ দিনে দিনে বাড়ে।' ...অতঃপর সে ছন্দ রাস্তায় পড়ে ছুটতে থাকবে—'নন্দ রাখিল নাম নন্দের নন্দন।'

তার সঙ্গে ওই ছোট্ট মেয়েটার কলজেটাও ছুটতে শুরু করবে 'ঠাকুমা' নামক ব্যক্তিটির গতিছন্দের পিছু পিছু।...নাঃ, এবার বিছানা থেকে নেমে পড়া দরকার।...আশ্চর্য। ঠাকুমার এই গঙ্গা নাইতে বেরোনোটা তো রোজকার

দেখা ব্যাপার ! তবু যে কেন দেখা চাই-ই চাই কে জানে।

একটা মানুষ আবছা ভোরে জনহীন রাস্তায় একা বেরিয়ে পড়ল, এ যেন একটা বিশেষ দ্রষ্টব্য। এ দৃশ্য মেয়েটাকে যেন চুম্বকের মত টানে। যেন দেখতে না পাওয়াটা একটা মস্ত লোকসান।

তাই সদ্যভাঙা ঘুমের চোখটা আস্তে খুলে দেখে নেয় সবাই ঘুমোচ্ছে কিনা। না ঘুমোলে অসুবিধে। তা ভাগ্যক্রমে এ সময় সবাই ঘুমন্তই থাকে। মা বাবা দিদি, আর পাশেই দু'ঘরের মাঝখানে দরজা খোলা একটা ঘরের মধ্যে একখানা চৌকিতে দুই দাদা। দরজাটার এত কাছ ঘেঁষে ওদের বিছানা যে মনে হচ্ছে সবাই বুঝি এই ঘরেই শুয়ে আছে।

সবাই ঘুমোচ্ছে দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে মেয়েটা আস্তে খাটের ধারের দিকে চলে আসে। ধারের দিকে এসেই উপুড় হয়ে প্রায় পিছলে পড়ে মাটিতে নামে। বেশ পরিশ্রম করেই এই নামাটা। মাটির সঙ্গে পায়ের আঙুলগুলোর ফারাক না ঘোচা পর্যন্ত বিছানার চাদরের খানিকটা মুঠোয় চেপে ধরে 'সড়সড়া'তে হয়।

পা-টা মাটিতে ঠেকলেই বাস !

আর তাকে পায় কে ?

ঘরজোড়া চৌকির মাথার কাছে বড় বড় তিনটে জানলা, শার্সি খড়খড়ি সম্বলিত। ঘরের মেঝে থেকেই তাদের শুরু দরজারই মত, তবে সারি সারি লোহার গরাদে আছে তাই 'জানলা'।

জানলাগুলোর খড়খড়ি একটু করে খোলা, বোধ হয় রাত্রে ঘরে বাতাস প্রবেশের পথ রাখতে, কিন্তু খিল ছিটকিনিগুলো শক্ত করে আঁটা। ওই ছোট মেয়েটা তো দূরস্থান, তার থেকে বছর দেড়েকের বড় দিদিরও সাধ্য নেই সেই ছিটকিনিতে হাত পৌঁছিয়ে জানলা খুলে ফেলে।

অতএব আর কি করা !

আঁখি পাখি যুগলকেই জানলার পাখিতে ঠেকিয়ে কোনোমতে দৃষ্টিটাকে বাইরে প্রেরণ !

যেখানে নাকি যত স্বপ্ন যত সুষমা যত রহস্য যত হাতছানি। তাই নিত্য দেখেও পুরনো হয় না।

তবে সব কিছুই নিঃশব্দে করতে হবে, সেটাও একটা রোমাঞ্চময় অনুভূতি। কেউ জেগে উঠলেই তো তাড়া খেতে হবে। ছোটদের যে কোনো নিজস্ব ইচ্ছের ব্যাপারে 'তাড়া' মারা আর বকুনি দেওয়াই তো সাংসারিক রীতি।

বুড়ো আঙুলে টিপ দিয়ে আপ্রাণ চেষ্টায় খড়খড়িটা ঠেলে ধরে দেখা হল সেই 'নিত্য দৃশ্য'।

এই জানলাগুলোর সামনে বাইরে যে কিছুটা পোড়ো জমি খোলা পড়ে আছে, যেখানে বিকেলবেলা পাড়ার কিছু বড় বড় ছেলেরা দু'পাশে খুঁটি পুঁতে আর একটা জাল টাঙিয়ে কী যেন খেলা করে, যে খেলায় যোগ দেয় ওই মেয়েটার সবচেয়ে বড় জাঠতুতো দাদাটি (যাকে দেখলে ওর বুক দুরদুর করে), সেই জমিটাকে এই বাড়ির বালখিল্যরা বলে 'মাঠ'।

দেখা গেল ঠাকুমা তাঁর দ্রুতধাবন ভঙ্গীতে সেই মাঠটুকু পার হয়ে মুহূর্তে রাস্তায় গিয়ে পড়লেন। ··ঠাকুমার হাতে বেশ বড়সড় একটা চকচকে পেতলের ঘটি, তাঁর মুখের ওপর গোল করে রাখা গামছার পুঁটুলি। ঠাকুমার গায়ে একটা নামাবলী।

দীর্ঘ সতেজ সোজা দেহটি নিয়ে ঠাকুমা চট্‌পট রাস্তায় পড়েই বাঁদিকে এগিয়ে গেলেন। অবধারিত যে একদম পাশেই যে কালীমন্দিরটি রয়েছে তার বন্ধ দরজার গায়েই একবার কপালটা ঠেকিয়ে তবে গঙ্গার ঘাটের পথ ধরবেন।

এই কালিবাড়িটির নাম 'গুহদের কালীবাড়ি'। অথবা 'হোগলকুঁড়ের কালীবাড়ি'।

তখন অবশ্য না জানলেও মেয়েটা পরে জেনেছিল, ওই কালীবাড়িটি বিখ্যাত সঙ্গীতগুণী 'গোবর গুহ'র জ্যাঠামশাই অম্বু গুহ মশাইয়ের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। তাই গুহদের কালীবাড়ি। আর পাড়াটার নাম 'হোগলকুঁড়ে'। বাড়ির বৌরা জানালার পাখিটি পর্যন্ত খুলতে না পেলেও, বাড়ির গিন্নীটি দিব্যি পাখির মত ফুড়ুৎ করে বেরিয়ে পড়েন যখন তখন। নিত্য গঙ্গাস্নান তো বরাদ্দ আছেই, তা ছাড়াও কালীঘাট, শেতলাতলা, মঙ্গলচণ্ডীতলা, বাগবাজারের মদন-মোহনতলা, চিত্তেশ্বরী কালী না কি, কোথায় না কোথায় তাঁর গতিবিধি!

কিসে চেপে যেতেন?

কিসে আবার? ভগবানের দেওয়া দু'খানা পা নেই? যে দুটোর ওপর ভর করে পায়ে হেঁটে 'চারধাম' করেছেন। করেছেন তা ছাড়াও বহু তীর্থ!

দেহেমনে দু'দিকেই অসম্ভব শক্তিমতী এই মহিলা মাত্র আটত্রিশ বছর বয়েসে পাঁচটি ছেলে ও আটটি মেয়ে, সর্বসাকুল্যে এই তেরোটি সন্তানের ভার সমেত বিধবা হন; যাদের মধ্যে শেষটি তখনো মাতৃজঠরে। তাতে কী? তদবধিই ছাঁটাচুল, শুভ্রথান, নির্জলা একাদশী, একাহার, নিত্য গঙ্গাস্নান এবং আশী বছর বয়েস ব্যাপী জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত গঙ্গাজল পান। কলের জল তো অপবিত্র, ওর মধ্যে চামড়া আছে না?

গঙ্গাজলের 'ভারী' দুদিকে দুটো পেতলের কলসী বসিয়ে বাঁকে করে গঙ্গাজল নিয়ে আসতো ঠাকুমার রান্নার জন্যে। অন্ধকার অন্ধকার একটা ঘর, যেটাকে ভাঁড়ারঘর বলা হলেও, ঠাকুমার রান্নাও হতো। সেই ঘরের মধ্যে জলটা 'ভারী' কিসের মধ্যে যেন ঢেলে দিয়ে যেত। আর খাওয়ার জল? সে কাজ ওই স্বহস্তে বয়ে আনা হালকা 'চাদুরে' ঘটিটির জলেই মিটে যেত। রোজই তো 'যোগান' পড়ছে। পৃথিবী উল্টে গেলেও তো 'নিত্য গঙ্গা'র নিয়মভঙ্গ হবে না। ঝুপঝুপ বিষ্টির মধ্যেও সেই ভোর সকালে মাঠটি পার হয়ে রাস্তায় পড়তে দেখা যেত তাঁকে। বিশেষের মধ্যে তেমন দিনে পাট করা গামছাটি ঘটির মুখ থেকে মহিলার মাথায় উঠত।

'জলের ছাট'এর সময় জানলার খড়খড়ির সামনের শার্সির পাল্লাটা থাকত চেপে বন্ধ করা! কাঁচের মধ্যে দিয়েই বহু চেষ্টায় যেটুকু দেখা যায়।···সেই গামছা মাথায় দ্রুত ধাবিত ছবিটি অপসৃত হয়ে গেলেও মেয়েটা বিহ্বল দৃষ্টিতে

তাকিয়ে থাকত অনেকক্ষণ। কী আছে গঙ্গায় যে বিষ্টিতে ভিজতে ভিজতেও সেখানে নাইতে যেতে হবে? কলে তো কত জল!…বিষ্টিতেই তো নেয়ে যাচ্ছেন, আবার কী নাওয়া?

কে জানে কত দূরে সেই গঙ্গার ঘাট? এই বৃন্দাবন বোস লেনটা সোজাই সেখানে যায়, না কি অনেক ঘুরে ঘুরে? যে রকম ঘুরে ঘুরে এঁকেবেঁকে যেতে হয় মেজ মামীমার বাড়িতে বাদুড়বাগানে!

বিষ্টির দিনে মনটা কেমন খারাপ হয়ে যেত। ভাগ্যি যে, সব দিন বিষ্টির নয়।

ঠাকুমা বেরিয়ে পড়ার পরই যেন বাড়িতে শব্দের হাট বসে যেত। দাপুটে মায়ের পাঁচ-পাঁচটি কর্তা কর্তা দাপুটে ছেলেদের কণ্ঠ গর্জনের শব্দ (না না, অন্য কিছু না, ওটাই ওঁদের স্বাভাবিক কথা বলা), চেঁচিয়ে কাঁদার উপযুক্ত বাল-বাচ্চার উদ্দাম কান্নার শব্দ, মহিলাদের অবয়বহীন কলকোলাহলের শব্দ, উঠোনে নামানো পাহাড়প্রমাণ বাসনগুলো উদ্ধার হওয়ার খনখন ঝনঝন শব্দের সঙ্গে বাসনমাজুনীর খ্যানখ্যান চিৎকারের শব্দ, এবং প্রায় রোজই 'বেলা করে' আসা ঠিকে বামুনমেয়ের, রান্নাঘরে দু দুটো রাক্ষসের মত উনুন জ্বলে যাওয়া দেখে উদ্দাম ধিক্কারের শব্দ! কেন, বৌদিদিরা এতক্ষণ ভাত-ডালের হাঁড়ি দুটো বসিয়ে দিতে পারেনি? কী এতো রাজকায্যো তাঁদের?

হ্যাঁ, এই সবই তো বলতেন তিনি প্রতিদিনই বেলা করে এসে কলে পা ধুতে ধুতে।

আশ্চর্য, 'বৌদিদি'দের মুখে 'টুঁ' শব্দটি নেই।

থাকবে কোন্ সাহসে? বামুনদি রাগ করে চলে গেলে ত্রিভুবন অন্ধকার নয়? অতএব বামুনদির পরবর্তী ঝঙ্কার গিয়ে পড়ে সেই বাসনমাজুনীর ওপর —যে নাকি ভোর-সকালে এসেই উনুন ধরিয়ে দিয়েছে। কেন? একটু দেরী করে দিলে হয় না? এসে মাত্তরই উনোনে আগুন? ঘুঁটে কয়লার দাম নেই?

আচ্ছা কাল থেকে আর দেবনি, দেকি কেমন করে বাবুদের টাইমের ভাত দ্যাও।

বলে বাসন আছড়ানির শব্দ।

একেবারে শব্দব্রহ্ম।

এইসব উচ্চ নিনাদের মধ্যেই আর একটি উচ্চ গম্ভীর শব্দ ধ্বনিত হয়।

কালীবাড়ির ঘণ্টাধ্বনির শব্দ। ভারী গম্ভীর গভীর। আবার যেন ভয় ভয় করা।

আজও যেন সেই ধ্বনি হঠাৎ হঠাৎ কোথাও ধ্বনিত হয়ে ওঠে।

একটু বেলা হলে মেয়েটা, আর তার সমবয়সী দুই তুতো ভাইবোন টুক করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ত 'পাহাড়ে চড়ে' ফুল পেড়ে আনতে।

বেলাটা তো হওয়া দরকার। বড়রা একটু এদিক ওদিক না হলে তো আর

বেরোনো যায় না ? তা ওনাদের চা খাওয়া মিটলেই ওনারা এদিক ওদিক সরেই যেতেন। কেউ চান করতে, কেউ দাড়ি কামাতে, কেউ বা আর কিছু করতে। আপিস যেতে হবে না ? তাড়া নেই ?

সবাই যে আপিস যেতেন তা বোধ হয় নয়। কাকাদের কেউ ডাক্তার, কেউ মাস্টার। তা হোক, জামা জুতো পরে নিয়মিত বেরিয়ে যাওয়া মানেই তো আপিস যাওয়া !

উনিশশো এগারো বারো সালে 'চা' জিনিসটা যে এ যুগের মত এমন সমাজের সর্বস্তরে প্রতিটি শিরায় শিরায় প্রবাহিত হতো, তা হয়তো নয় ! অনেকের বাড়িতে তখনো তার অনুপ্রবেশ ঘটেনি। তবে এ বাড়িতে, মানে ঠাকুমার এই পঞ্চপুত্র সম্বলিত সংসারে চায়ের ঢালাও কারবার। ভোর না হতেই 'চা চা' রব। ঘুম থেকে উঠেই গলা শুকোচ্ছে।

তবে কি আর মহিলাদের ? তা নয় অবশ্য। শুধু কর্তাদেরই। তাঁদের বন্ধু-বান্ধব এলে চা। তাঁদের তাসের আসরে দু'চার রাউণ্ড চা।

ওই মেয়েটার মামারা হেসে বলতো, 'কাক ডাকে কা-কা। তোদের বাবা বলে চা চা। তাই না রে ?'

মামারা সব দিব্যি কেষ্টবিষ্টু, তা সত্ত্বেও তাঁদের প্রাতরাশে চায়ের প্রবেশাধিকার ঘটেনি তখনো। বোধ করি কখনোই। কিন্তু সে তো পরবর্তী কথা।

বাবা জেঠামশাই আর কাকারা চা-পানান্তে এদিক ওদিক হলেই পাহাড়ের টানে বেরিয়ে পড়া।

কিন্তু 'পাহাড়' মানে কী ?

কোথায় সেই ব্যাপারটা ?

এখন তাকিয়ে দেখে ব্যাপারটা কী হাস্যকরই না লাগে ! অথচ তখন কী উৎসাহ ! কী রোমাঞ্চ ! হয়তো বকুনি খাবার ভয়টা প্রবল ছিল বলেই অত রোমাঞ্চ।

ব্যাপার এই—ওই যে জানলার সামনের পোড়ো জমিটুকু শিশুর চোখে যা মাঠ, তার গায়েই তো কালীবাড়িটি। অনেকগুলো সিঁড়ি দিয়ে উঠে তবে কালী-বাড়ির দরজা, কাজেই দেবীর পাশে মাঠের দিকে মন্দিরের যে একটা ছোট জানলা ছিল, সেটাও মাটি থেকে অনেকটা উঁচুতে। সেই জানলার নীচে কী বাবদ কে জানে, জমানো ছিল ভাঙা আস্ত রাশীকৃত ইঁটপাটকেলের স্তূপ। শ্যাওলা ধরে গেছে, মাঝখানে মাঝখানে গাছ গজিয়ে গেছে। এটাই পাহাড়। এ পাহাড়ে চড়তে এলে বকুনি খাওয়া তো অবধারিত। বিছে থাকতে পারে না খাঁজে খাঁজে ? সাপ ব্যাঙই বা নয় কেন ?

কিন্তু বাসনা যে অদম্য !

কোনো ভয়ই ঠ্যাকাতে পারবে না তাকে। ফুলগুলো পেড়ে আনতে হবে না ? মন্দিরের গায়ের ওই উঁচু জানলাটা থেকেই যে নিক্ষিপ্ত হতো আগের দিনের

পুজো করা যত ফুল বেলপাতা।

ফুল না ফুলের সম্ভার ?

অবান্তর বেলপাতাগুলো সরিয়ে সরিয়ে তাদের উদ্ধার করা।

জবা। জবাই বেশী।

লাল টকটকে বড় বড় জবা। বড় বড় জবার মালা। তাছাড়া ইয়া ইয়া সোনার বরণ গাঁদার স্তূপ, আরো কী সব নাম-না-জানা ফুল। কোনটাতেই 'বাসি'র মালিন্য বিশেষ দেখা যেত না। অথবা অবোধ শিশুদের চোখে ধরা পড়ত না সে মালিন্য।

হাঁচড়েপাঁচড়ে হামা দিয়ে-হাঁটু ছড়ে কোনোমতে ফুলগুলো সংগ্রহ করে ফেলাই হচ্ছে অবশ্যকর্তব্য!

আহা! কী অকিঞ্চিৎকরই ছিল সেই উচ্চতাটি। অথচ ওদের কাছে পাহাড় ডিঙোনোই।

ফুলগুলো নামিয়ে নিয়ে এসে কী করত ওরা ?

আহা, করবে আবার কী ? কে কতগুলো পাড়তে পেরেছে, সেই বাহাদুরি-তেই তো কর্তব্য শেষ! তবে 'ঠাকুরের ফুল' পায়ে ঠেকাতে নেই। তাই দেয়াল ঘেঁষে সাজিয়ে রাখা মাত্র।

প্রতিদিন এই একই অহেতুক বৃথা খেলা।

তা কারই বা তা নয় ? বিজ্ঞ বয়স্করাই কি ওই বৃথার জন্যেই নিত্য পাহাড় ভাঙে না ?

এর পরই ঠাকুমার ফিরে আসা। এখন এক হাতে সেই চকচকে ঘটিটি গঙ্গা-জলপূর্ণ এবং আর এক হাতে ভিজে গামছায় মোড়া একটি বড়সড় পোঁটলা। তবু তেমনি সোজা সতর্ক দ্রুত পদক্ষেপ। গঙ্গার ঘাটের বাজার থেকে সওদা করে ফেরাও তাঁর একটি নিত্য কর্তব্য।

হিসেব করলে দেখা যায় তখন তাঁর বয়েস বাষট্টি-তেষট্টি।

সারা জীবনের কঠোর-কঠিন সংগ্রামের কোনো চিহ্ন নেই শরীরে, চিহ্ন নেই প্রায় জীবনব্যাপী কৃচ্ছ্রসাধনের।

বছরে গোটা চব্বিশ-পঁচিশ নির্জলার ব্যাপার থাকলেও, পঞ্জিকার সারা বছরের উপবাসের উপহারের কোনোটাই ছাড়বেন না কী ? হলেও পরম শাক্ত বাড়ির বৌ, তা বলে 'গোস্বামী' মতটাই কি ফ্যালনা ? পরাহটাকেই বা গণ্য করা হবে না কেন ?

তাছাড়া 'বার' করার ব্যাপারটাও তো হাতের মুঠোয়। সোমবারে যদি শিবের বার তো মঙ্গলে মঙ্গলচণ্ডীর। শনিবারের জন্যে তো স্বয়ং শনিঠাকুরই আছেন।…অম্বুবাচীতে নাকি মর্ত্যের মৃত্তিকা অপবিত্র হয়ে পড়েন। তাতে কী ? চারটে দিন আর আকণ্ঠ গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে গঙ্গার মধ্যেই আহ্নিক সেরে গঙ্গার ঘাটের ডাবওলার কাছ থেকে একটা ডাব কিনে তার মুখ কাটিয়ে গলায় ঢেলে নিয়ে দিন কাটিয়ে দেওয়া যায় না ? সোজা সহজ ব্যবস্থা।

সবটাই যখন নিজের হাতের মুঠোয়, তখন সহজ করে নিতে অসুবিধে কী?

কিন্তু সে যাক, চেহারায় বা ভঙ্গীতে ধরা পড়ে না কোনো ক্লান্তির। গঙ্গা নেয়ে ফেরা মাত্রই, হাতের জিনিস নামাবার আগে পাঁচ বৌয়ের কোনো এক বৌ (বোধহয় যে সামনে থাকতেন) ছুটে এসে বড় একঘটি জল নিয়ে তাড়াতাড়ি ঠাকুমার পা ধুইয়ে দিতেন এবং ভাঁড়ারঘরের জানলায় ঝোলানো ঠাকুমার আর একখানি গামছা টেনে নিয়ে পা মুছিয়ে দিতেন। গঙ্গা নাওয়ার গামছাটা বেশ লাল টুকটুকে, এ গামছাটা রং-জ্বলা, ছেঁড়া-ফাটা। গা-মোছা না বলে 'পা-মোছা' বলাই উচিত।

পা ধোয়া-মোছার পর ঠাকুমা তাঁর আনীত ফলগুলো নামিয়ে তা থেকে একটা দুটো করে নিয়ে সেই অন্ধকার-অন্ধকার ভাঁড়ারঘরটার দরজার কাছে নামিয়ে রেখে, বাকি সব সুচারুভাবে কেটে ভেঙে বা ছিঁড়ে বালখিল্য বাহিনীকে ভাগ করে দিতেন। ভাগটা যে বেশ 'সমান' হতো এমন মনে করার হেতু নেই। কিন্তু 'ছেলে' আর 'মেয়ে'ই কি সমান? অর্থাৎ নাতি আর নাতনী?

এই ঘটনার পরই জয়রাম আসতো ধামায় করে বাজার নিয়ে। সেই বাজারের মধ্যে থেকে প্রথমেই কিছু আলু পটল বেগুন ডাঁটা এবং তার সঙ্গেও কিছু ফলটল ভাঁড়ারঘরের দরজার বাইরে চাতালটায় নামিয়ে রেখে ধামাটা নিয়ে যেত অন্যদিকে। ঠাকুমা ওসবের ওপর গঙ্গাজল ঢেলে দিয়ে তবে ঘরে তুলতেন।

ফল তো লাগবেই, রাত্রে তো ওটাই আহার। রাত্তিরে তো আর ঠাকুমা অন্য সবাইয়ের মতন ভাত-রুটি খাবেন না। রান্না করা জিনিসই না।

আর ব্রেকফাস্টও তো ওই ফলমূলেই। তবে ফলমূলদের কেটে ছাড়িয়ে খেতে হয় এমন কুসংস্কার ছিল না ঠাকুমার। কাটা ফল নাকি তাঁর দু'চক্ষের বিষ।

বৌরা কেউ যদি শুদ্ধাচারে দশমী দ্বাদশী হিসেব করে পাথরের থালায় থালাভর্তি ফলটল সাজিয়ে রাখত, তিনি নাকি ঠেলে দিয়ে বলতেন, 'আমার দরকার নেই, যাদের দাঁত নেই তাদের দ্যাও গে।'

দাঁতের গরবে গরবিনী ঠাকুমা আশী বছর বয়েস পর্যন্ত দাঁত দিয়ে আখ ছাড়িয়ে খেয়েছেন, খেয়েছেন ইয়া ইয়া ডাঁসা পেয়ারা, আস্ত আস্ত খোসাসমেত শশা, বড় বড় নাসপাতি। স্রেফ কামড় দিয়ে দিয়ে। তখন আপেলের চলন ছিল না তেমন, তবে নাসপাতিটা ছিল, আর ওটা ঠাকুমার বিশেষ প্রিয় ছিল। বলতেন 'ন্যাসপাতি'। নাতি-নাতনীরা শুনে হাসতো উচ্চারণের ভুল ভেবে।

'বালভোজন' সেরে তবে ব্রেকফাস্টে বসতেন ঠাকুমা, তসর থান ছেড়ে সাদা থান পরে। সেও বেশ একটা কৌতূহলোদ্দীপক আকর্ষণীয় দৃশ্য। ওই ভাঁড়ারের মধ্যেই দরজার কাছে রান্নার খুরসী পীঁড়িটা নিয়ে বসতেন। বাঁ হাতের কাছে সেই চকচকে মাজা পেতলের ঘটিটি। সামনে গুটিকয়েক গঙ্গাজলে ধোওয়া আস্ত ফল, আর একটি ছোট্ট পাথরবাটিতে একটু নুন আর এক ড্যালা মিছরি। নুন দিয়ে দিয়ে ফলগুলি শেষ করে মিছরিটা কড়কড়িয়ে চিবিয়ে গঙ্গাজলের ঘটিটি উঁচুতে ধরে আলগোছে যতটা সম্ভব জল খেয়ে নিয়ে ব্রেকফাস্ট সমাপ্ত করে

বঁটি নিয়ে তিনি স্বপাকের কুটনো কুটতে বসবেন। বৌয়েরা কেউ উনুনটা ধরিয়ে দেবে।

কিন্তু জলযোগে মিছরি কেন? একটু সন্দেশ রসগোল্লা জোটে না? ছি ছি, জুটবে না কেন? পাঁচ-পাঁচটি বয়স্ক পুত্রের জননী না? আর যে জননী তাঁদের কাছে 'স্বর্গাদপি গরীয়সী'। জুটবে না মানে?

তবে কথা হচ্ছে ওনার ভোগের উপযুক্ত বস্তু তো সহজে আহরণ সম্ভব নয়। সেই তো অনেকটা দূরে বিশেষ একটি দোকান, যেখানে 'ভাজা মিষ্টি'র স্পর্শদোষ নেই, কেবলমাত্র দই রাবড়ী সন্দেশ রসগোল্লারই সম্ভার এবং সেই সম্ভারে হাড়ের গুঁড়ো দিয়ে ফর্সা করা 'অমেধ্য' দোবরাচিনির কারবার নেই, কেবলমাত্র কাশীর চিনিই ঢুকতে পায়। তাছাড়া সেই দোকানি রসগোল্লায় 'সবেদা' মিশিয়ে পাপ অর্জন করে না। শুধু এই নয়, তাদের নিয়েও তো আসতে হবে কাচা কাপড়ে খালি পায়ে। অতএব সেটা একটু সুদূরপরাহত। তবে ছানার জন্যে নাকি অত বিধিনিষেধ নেই। তাই প্রায়শঃই দেখা যেত ঠাকুমা ভাতটাত না রেঁধে আখের গুড় মেখে থাবা করে ছানা খাচ্ছেন। ভাত বর্জনের দিন তো পাঁজিকায় কম নেই।

ছানায় দোষ নেই, ওটা জুতো পরেও আনা যায়।

॥ ২ ॥

এইসব বিধিনিষেধ রহস্যবাড়ির অন্য সব ছোট ছেলেমেয়েদের কি সম্যক জানা ছিল? বোধ হয় না। তবে ওই মেয়েটার জানা হয়ে গিয়েছিল। হয়ে গিয়েছিল ওই কৌতূহল আর লক্ষ্য থেকে। সেই বাবদ একদিন সে একটা দৃশ্যে শিহরিত হয়ে বলে উঠেছিল, ওমা! বাবা, তুমি জুতো পরে ছানা এনে ঠাকুমার ঘরে রাখলে? দেখো তোমার পা ফুলবে!

পা ফুলবে?

বাবা হতভম্ব।

ফুলবেই তো। পাপ হলেই তো পা ফোলে। তোমার পাপ হল না?

হায় ভাগ্য, যার জন্যে চুরি করা সেই বলে চোর। স্বয়ং ঠাকুমাই কিনা খটখটিয়ে বলে উঠলেন, শোনো একবার পাকা কটকটে মেয়ের কথা! বাপের ওপর তম্বি! একটু 'সমেহা' মান নেই? মেয়েকে শিক্ষাসহবৎ দিতে হয় রে! পরের ঘরে যেতে হবে না?

মা পরে বুঝিয়েছিলেন ছানায় নাকি দোষ হয় না।

মেয়েটা অবাক হয়ে বলেছিল, কী করে জানলে দোষ হয় না? ভগবান বলেছেন?

হ্যাঁঃ, ভগবানের আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই! তাই এইসব বলতে আসবেন!

তবে কে বলেছে বল না মা?

জানি না। আমিও জানি না। থাম তো।

ছোটদের প্রশ্নকে থামিয়ে দেওয়াই বিধি। মেয়েটা থামে, তবে চুপ করে ভাবতে থাকে, সত্যি কে ওই বড়দের বলে দেয় কোন্‌টা দোষ, কোন্‌টা দোষ নয়। কোন্‌টা ছেলেদের বেলায় দোষ হয় না, মেয়েদের বেলায় দোষ হয়। সেরকম দৃষ্টান্ত তো হরদমই দেখছে সে। নোংরা জিনিস ছুঁয়ে ফেললে ছেলেদের আড়াই পা বাড়ালেই শুদ্ধ; মেয়েদের বেলায় জামা ছাড়ো, গঙ্গাজল মাথায় দাও!

লোকে বলেছে, হ্যাঁঃ! সেই তখনকার কথা নাকি মনে আছে তোর! তখন তো তোর দু-আড়াই বছর বয়েস! শুনে শুনে বলছিস। ছোট থেকেই তো তোর 'কেন কী বিত্তান্ত' বলা রোগ।

কিন্তু শুনে-শুনেই যদি বলবে তো পরিস্থিতিটা দেখতে পায় কী করে সে?

সেই ঘর দরজা, সামনের দেয়ালের গায়ে একটা কয়লার হাত মোছা দাগ, জানলায় পান খাওয়া চুনের দাগ, বাবা এদিকে দাঁড়িয়ে, ওদিকে ঠাকুমা।···

শালপাতায় মুড়ে আনা ছানা থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরেছে তার দাগ, আর তার মাঝখানে দাগী আসামী মেয়েটা দাঁড়িয়ে।

হৃষ্টপুষ্ট গড়ন, কেবলমাত্র একটা পেনি পরা।

কিন্তু মেয়েটার কী কোনো একটা নাম নেই? শুধু 'মেয়েটা'?

না না, নাম একটা আছে বৈকি! বেশ ভালই নাম। (শেষ বয়েস পর্যন্ত যেটাতে চেপে চড়ে বেড়াচ্ছে সে।)।

এ বাড়ির ছেলেমেয়েদের সকলেরই দিব্যি ভাল ভাল এক-একটা নাম আছে। ছেলেদের তো তিন পুরুষের ঐতিহ্যবাহী ছন্দবন্ধ মিলোনো নাম। যে কোনো গুণবাচক শব্দের সঙ্গে একটা 'ইন্দ্র' লেপটে জুড়ে দিয়ে দিয়ে শৌখিনভাবে গড়া।

মেয়েদেরও মিলোনো না হলেও শৌখিন। কিন্তু সে-সব নাম তো পোশাকী! তোলাই থাকে। তবে হ্যাঁ, ডাকবার জন্যে অবশ্যই এক-একটা আটপৌরে নামের দরকার। কী ছেলেদের, কী মেয়েদের।

তা তার জন্যে তো যত রাজ্যের উনচুটে-উদ্‌ভুটে, অদ্ভুত কিম্ভুত সব শব্দের পসরাও রয়েছে বাংলা ভাষায়। সেইগুলো থেকেই বেছে নিয়ে নিয়ে কাজে লাগানো।

ওই সব ডাকনামগুলো যে আমৃত্যু তাদের ঘাড়ে চেপে থাকবে, এ কথা কে ভাবতে যাচ্ছে? যা-তা একটা শব্দে ডাকায় কত আরাম! আর যতক্ষণ না ডাকাডাকির দরকার হচ্ছে, ততক্ষণ তো ছোটটা, পুঁচকেটা, হাঁদাটা, দস্যিটা, মেয়েটা ইত্যাদি বলেই চালানো যায়।

এই মেয়েটার ব্যাপারেও তাই। তবে বলতে সুবিধার জন্যে আপাততঃ তাকে রামী বামী শ্যামী ভামীর মত একটা নাম দেওয়া যেতে পারে—'আমি'। মন্দ কী? দস্যিটা, হাঁদাটার থেকে তো ভাল। আর সত্যি বলতে এই নামটা তারই অবদান!

নিজের জিনিসপত্রকে চিহ্নিত করতে সে বলে, 'আমি'র জামা, 'আমি'র পুতুল, 'আমি'র খাবার।

শুনে ওর সমবয়সীরা হি-হি করে হাসে। বলে, এ মা! ঠিক কথা বলতে পারে না। ভুল কথা বলে।

কিন্তু ও বেচারার মাথায় ঢোকে না, এর মধ্যে ভুল কোথায়? আমিই তো আমি।

সে যাক, ওই আমিটার গঠনভঙ্গীটি এমন মজবুত, আর স্বাস্থ্যটা এত জোরালো যে তার স্বাভাবিক বিচরণটুকুই দস্যিপনা বলে গণ্য হতো। আর কারণে অকারণে ওই জানলার ধারে দাঁড়িয়ে হাঁ করে রাস্তা দেখাটাই ছিল হাঁদামি পদবাচ্য।

কী আছে রাস্তায়?

কী এত দেখিস?

সমবয়সী তুতো ভাই-বোনের দল হি-হি করে হাসতো। হাঁদাগঙ্গা! রাতদিন রাস্তা দেখে। রাস্তায় বুঝি সব সময় চতুর্দোলা চেপে বর যাচ্ছে?

'আমি'টা তার দিদির থেকে বছর দেড়েকের ছোট হলেও আড়েদীর্ঘে অধিক। আর খায়দায়ও দিদির থেকে বেশী। দিদি এ নিয়ে ধিক্কার দিলেও লজ্জার বালাই দেখা যায় না তার মধ্যে।

ঠাকুমাকে গঙ্গা নেয়ে ফিরতে দেখামাত্রই ছুটে আসা চাই তার। যদি ঠাকুমা তাঁর গামছার পুঁটুলির মালপত্র ভাগ করার সময় তাকে ভুলে যান!

তাছাড়া পুঁটুলিটি খুলে যখন ঠাকুমা একে একে একটির পর একটি নমুনা বার করতে থাকেন—শশা কলা আতা পেয়ারা বৈঁচি ফলসা কাঁচা আম বিলিতি আমড়া পানিফল টোপাকুল ট্যাঁপারি নারকুলে কুলেদের, দেখতেই কী কম মজা?

সব ফল অবশ্যই একই সময় নয়, জিনিসগুলো নানা সময় দেখা দিত। তবে একটা জিনিস সব সময়—কালীঘাটে গেলেই ঠিক এসে হাজির হবে—আস্ত আস্ত ছাড়ানো নারকেল।

এ হচ্ছে 'কালীঘাট স্পেশাল'।

এখনও সে-ঐতিহ্যর ধারা বহন করে চলেছে কালীঘাট। তীর্থস্থানগুলিই দেশের চিরকালীন চেহারাটা বজায় রেখে চলে।

বাড়িতে কাছাকাছি বয়েসের অনেকগুলো ছেলেমেয়ে থাকলে খেলাও যেমন ঝগড়াও তেমন, এ তো অবধারিত। আর ঝগড়া মাত্রেই তো মারামারি।

'আমি'টার সঙ্গে গায়ের জোরে কেউ পেরে ওঠে না। কাজেই মার খায় অন্যরাই বেশী। আর তার জন্যে গঞ্জনা জোটে তার মায়ের। দস্যি মেয়েকে সামলাতে পারো না? দ্যাওর ও ভাসুরের ছেলেমেয়েগুলো মারা পড়ুক, এই চাও তুমি?

অতএব রাগে দুঃখে মায়ের মাথায় এল ফন্দী। মেয়েটাকে তাকে তুলে

রাখা যাক। থাক জব্দ হয়ে। তা তাকে তুলে রাখাই। একটা উঁচু জানলার চওড়া ধাপির ওপর বসিয়ে রেখে সরে পড়া। নিজে নিজে নামতে পারবে না।

সেকেলে দেওয়াল, জানলার ধাপি হাতখানেক চওড়া, পড়ে যাবার ভয় নেই। তবে থাক না বসে, যতক্ষণ না মায়ের কাজ সারা হয়।

কিন্তু খালি হাতে বসিয়ে রেখে দিলেই তো নাবিয়ে দাও নাবিয়ে দাও বলে চ্যাঁচাবে। অতএব হাতে একখানা যাহোক বই ধরিয়ে দিয়ে সরে পড়া।

মা'র ভাঁড়ারে তো বইয়ের অভাব নেই। মা'র তো জীবনের সার-সত্য বই। আর মেয়েটারও বই একটা হাতে পেলেই সর্বদুঃখ নিবারণ !

কবে যে সে পড়তে শিখেছিল, আর কবেই যে পড়তে জানতো না, তা তার মনে পড়ে না। ছেলে তো নয় যে হাতেখড়ি হবার আগে বই ছুঁতে নেই।

ভাবলেই দেখতে পায় লোহার শিক দেওয়া ছোট্ট একটা জানলার মধ্যে বসে আছে সে, হাতে একটা বই। হয়তো মলাট ছেঁড়া কোনো একটা গ্রন্থাবলী। হয়তো বা দাদাদের পাঠ্যপুস্তক। যাতে পদ্য আছে। যা মুখস্থ করা যায়। পদ্য মুখস্থ করাটাই তো যেন সার-সত্য।

এই ঘরটা ওর সেই দাদাদের শোবার ঘর। এই জানালাটা কালীবাড়ির পিছনের দিকে। মন্দিরের এই পিছনে ছোট্ট একটা দরজা আছে, এখান দিয়ে মাঝে মাঝে পুরুতমশাইকে বেরোতে দেখা যায়। গলায় পৈতে, পায়ে খড়ম, হাতে হয়তো পুজোর কোনো বাসন। খড়ম থাকলেও হাঁটলে শব্দ হয় না, কারণ এই দিকটাতে ডাঁই হয়ে আছে গাদা গাদা শুকনো ফুল বেলপাতা। এদিকে বেলগাছও আছে। তারও ঝরা পাতা।

জানলা দিয়ে হাওয়া আসে, তার সঙ্গে ভেসে আসে সেই শুকনো ফুল-পাতার কেমন একটা বুনো বুনো গন্ধ, ভাল লাগা আর ভাল না-লাগার একটা অদ্ভুত মিশেল।

হাঁদা মেয়েটা হঠাৎ হঠাৎ পদ্য মুখস্থ বন্ধ করে হাঁ করে সেই পতিত জমিটুকুর দিকে তাকিয়ে থাকে। বড় বড় বেলগাছটাছ ছাড়াও ঝোপ ঝোপ কিছু গাছপালাও আছে ওখানে। কী সব ফুল ফোটে। তুলে নিয়ে পুজো করা হয় না কেন ? ওগুলো যে নেহাতই অনার্য ফুল, ঠাকুরের পায়ে পড়ার যোগ্য নয়, তা তো আর তখন জানত না সে !

ইস, এই জানালাটা যদি হঠাৎ শিক খুলে গিয়ে দরজা হয়ে যায় ! কী মজাই হয় ! এখান থেকে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে নামলেই কী গায়ে লাগবে নাকি ? জানলার নীচ পর্যন্তই তো শুকনো পাতার গদি !

জানলাটা সেই শিলাপটে খোদাই হয়ে থাকা যত সব অবিস্মরণীয় চিত্রের একটি চিত্র।

এখানে বসে বসে হাতে বই নিয়ে কী যে ভাবত সে কে জানে। জব্দ হয়ে থাকার দুঃখ নিয়ে ? কই না তো ! ওই বুনো বুনো গন্ধে সে কেমন অন্য-মনস্ক হয়ে যেত। ভাবতে ভুলে যেত মা কখন এসে তাকে উদ্ধার করবেন।

তবে মাঝে মাঝে মা ছাড়াও কেউ কেউ উদ্ধারকার্যে হাত বাড়াত।

কাকাদের বাইরের ঘরের বন্ধুজনের আসরে হঠাৎ-হঠাৎ ওই 'আমি'টাকে দ্রষ্টব্য হিসেবে ডাক পড়ত—নিয়ে যাওয়া হতো তাকে। এতটুকু মেয়ে এত এত পদ্য মুখস্থ বলতে পারে অক্ষর পরিচয়ের সিঁড়ি নিয়মের বালাই না মেনে, একেবারেই বই পড়তে শিখেছে নিজে নিজে, এটা একটা কৌতুক-কৌতূহলের রসদ বৈকি!

বড়রা কেউ একজন তাকে তাক থেকে পেড়ে নামিয়ে খালি গায়ের অথবা ময়লা পেনির ওপর একখানা ঘাগরা পরিয়ে টেনে নিয়ে যেত বাইরের ঘরে, বসিয়ে দিত ওনাদের আসনের বড় গোল টেবিলটার ওপর। অতঃপর তার গুণপনা প্রদর্শন। বন্ধুজনের কাছে তারিফ পাওয়া।

মুখস্থ পদ্যর স্টক ফুরিয়ে গেলে যে কোন একটা বই টেনে নিয়ে তার গড়-গড়িয়ে পড়ার পাঠটাও প্রদর্শন করা হতো। হোক মহাভারত, হোক বা অভিধান! অবশেষে টেবিল থেকে নামিয়ে দেওয়া হতো ভেতরে যা বলে।··বাইরের লোকের সামনে একটু 'মজা' উপভোগ করানোর উপকরণ ছাড়া আর কোন মূল্যবোধ ছিল তার সম্বন্ধে? কিছু না! নামকরা স্কুলের মাস্টারমশাই কাকারও। অন্য সময় কেউ ডেকেও শুধোতো না।

বরং তার মায়ের একটু ইচ্ছের স্ফুরণ দেখলে বলা হতো, এই মেয়েকে আবার পড়ানোর চেষ্টা? মাথা ফুঁড়ে বিদ্যের গাছ গজাবে যে।

অতএব চেষ্টার প্রশ্ন ওঠে না।

কিন্তু বরাবর তো আর 'তাকে তুলে' দিয়ে আটকে রাখা যায় না, হঠাৎ একদিন মেয়েটা নিজেই দেখে মোহিত হয়ে গেল, সে নিজে নিজেই নেমে পড়তে পেরেছে। কী ভাবে কে জানে। কী সুখ। যেন লড়াইয়ে জিতে ফেলার গৌরব অর্জন!

হঠাৎ একটা সকালে দিদি উল্লসিত মুখে এসে বলল, এই জানিস, কাল রাত্তিরে আমাদের আর একটা বোন হয়েছে।

আমি স্তম্ভিত! ধ্যাৎ! কখন?

বললাম তো রাত্তিরে। ইঃ! যা শীত, আমি না শীতে কাঁপছিলাম! জেঠিমা বললেন, তুই এখানে কী করতে? যা পালা!

তুমি দেখেছ?

হ্যাঁ 'তুমিই'! হলেও এক দেড় বছরের ছোট-বড়, এ বাড়িতে বড়কে 'তুই' বলার প্রথা ছিল না।

দিদি বলল, দেখব কী, তাড়িয়েই তো দিলেন!

আমি দেখব।

আঁতুড়ঘরে যাবি? এই শীতে নাইয়ে মারবে না?

আহা, আমি তো শুধু ঘরের বাইরে থেকে দেখব—ফর্সা না কালো?

কিন্তু নতুন বোনের মূর্তিটি দেখবার জন্যেই কি এত উৎকণ্ঠা? সেখানে

মা নেই ? যিনি বিশ্বাসঘাতকের মত সহসা অদৃশ্য হয়ে গেলেন। এখন তো শুধু একটু দেখা ছাড়া আর কিছু করার নেই।

আঁতুড়ঘর দেখার অভিজ্ঞতা এদের নতুন নয়। সারা বছর ধরে কেউ না কেউ তো থাকেই ওঘরে। ঠাকুমার ছেলের ঘরে এবং মেয়ের ঘরে ষষ্ঠীর কৃপার তো কামাই নেই। 'আমি'র থেকে তিন বছরের ছোট এই বোনটির জন্মানোর মধ্যকালীন সময়ে কত শিশুই তো ভূমিষ্ঠ হয়েছে এই অন্ধকার-অন্ধকার ঘরটার মধ্যে। কিন্তু ওই বয়েসেই আমিটা কী করে জেনে ফেলেছিল, হঠাৎ বেদখল হয়ে যাওয়া মাকে দেখে প্রাণের মধ্যে থেকে যে নিঃশ্বাস উঠে আসছে, সেটাকে চাপতে হয়। মাকে বুঝতে দিতে নেই।

দিদি অন্য রকম।

দিদি তার থেকে বেশ কিছু বড় বড় তুতো দিদিদের সঙ্গে খেলা করে। দিদির দস্তুরমত একটা 'সংসার' আছে। সে সংসারের ছাঁচটা প্রায় ঠাকুমার সংসারের মতই। ছেলে বৌ, নাতিনাতনী, এমন কি ঝি বামুনমেয়ে সব।

বাবার বাতিক ছিল দোকান ঘোরা। কোথায় নাকি 'মুর্গিহাটা' নামক একটি মনোরম ঠাঁই আছে, সেখানে নাকি নেই হেন জিনিস নেই। সেখান থেকে বাবা প্রায়শই কাঁচের পুতুল এনে এনে বিতরণ করতেন বাড়ির সব মেয়েকেই। বড় পুতুল মেজ পুতুল কচি পুতুল।

অনেকেরই ভেঙে যেত হারিয়ে যেত, পা খসে যেত, দিদির সংসারের সবাই কিন্তু অটুট অক্ষত। তারা জামাকাপড় পরে পুঁতির মালা গলায় দিয়ে বাক্সের মধ্যে শুয়ে থাকত, সময় সুবিধে মাফিক দিদি সেই বাক্সটি নিয়ে ওপরে চলে যেত। ওপরেই তো সবাই। সারি সারি ঘরে ঠাকুমা আর ঠাকুমার বাকি চার ছেলে। সামনে অনেকখানিটা খোলা ছাত। দড়ি টাঙিয়ে কাপড় শুকোনো হত। ঠাকুমার মেয়েরা শ্বশুরবাড়ি থেকে এলে তুতো ভাই-বোনদের তো মেলা বসে যেত।

ঠাকুমার কর্তা সুবিবেচনার পরাকাষ্ঠা দেখাতে প্রথম দিকের দুটি কন্যাকে পাত্রস্থ করে গিয়েছিলেন, বাকি ছটিকে ঠাকুমাই পাত্রস্থ করেছেন। এবং নেহাৎ ফ্যালনা পাত্র ধরেও নয়।

সে যাক, মেয়েরা তো প্রয়োজনকালে মায়ের কাছে আসবেই। প্রকৃতির ঋতুচক্রের আবর্তনের মতই সেই 'প্রয়োজন' বেশ পালাক্রমেই চলত। এবং মহাশক্তিময়ী গৃহিণীটি সারাক্ষণ দেবদ্বিজ কালীগঙ্গা করে বেড়ালেও, তাঁর পাঁচ ছেলে পাঁচ বৌ এবং তাদের সন্তানসন্ততিকূল (মাথাপিছু পাঁচটি ধরলেও কোন্ না পঁচিশটি) আর বহিরাগত মেয়েরাও নাতি-নাতনীর বাহিনী সমেত সংসারটি কী অবলীলায় কব্জা করে রেখে দাপটের সঙ্গে সংসার করতেন ভাবলে অবাক লাগে।

পান থেকে চুন খসুক দিকিনি কারুর ? হুঃ!

কে জানে কোথায় এই শক্তির রহস্য।

এ যুগের গৃহিণীদের কাছে কি অবিশ্বাস্য বিস্ময় নয় ?

দিদিরা ওই ছাতে শুকোতে দেওয়া কাপড়গুলোর আড়ালে রোদ বাঁচিয়ে সংসার ছড়িয়ে বসতো। এখানে 'আমি'টা তেমন পাত্তা পেত না। 'সংসার-রসের' রসগ্রহণ করতে পারে না ও। সকাল থেকে বাড়িতে যেসব ঘটনা কাণ্ড কথাবার্তা চলে চলেছে, সেইগুলোকেই আবার পুতুলের সংসারে স্থাপন করার মধ্যে কী এত আহ্লাদ আছে ?

পুতুল-গিন্নীকেও যে থান পরে নামাবলী গায়ে দিয়ে গঙ্গা নাইতে যেতে হবে, তার কী মানে ? পাড়ার ওই আমলের বাড়ির গিন্নীর মতন চওড়া লালপাড় শাড়ি পরে, কপালে ইয়া টিপ পরে, ডাবর নিয়ে বসে বসে পান সেজে সেজে খেতে পারে না ?

কিন্তু হাঁদাটার কথা কে শোনে ? বলে, যাঃ! আমরা কেন অন্য লোকেদের মতন হতে যাব ? গিন্নী লালপাড়! ধ্যেৎ!

অথচ তেমন কাপড়ের অভাব ছিল না। বাবা যদি পুতুল আর পুঁতি আমদানীকারক তো মা'র তাদের প্রতিপালনে অংশগ্রহণের দায়িত্ব।

মা'র নিয়মই ছিল, শাড়ি ছিঁড়লেই তার একটা দিক থেকে পাড় ঘেঁষে কেটে কেটে পুতুলের মাপে ছোট ছোট শাড়ি বানিয়ে দেওয়া। পাড়ের তেমন জৌলুস না থাকলে তাদেরকে রঙে ছুপিয়ে ছুপিয়ে লাল হলদে নীল সবুজ বেগুনী বানিয়ে দেওয়া। লালের অভাব কী ? আলতাই তো রয়েছে। হলদের জন্যে হলুদবাটা, নীলের জন্যে কাপড়ে দেবার নীল। আর নীল এবং হলদেতে মিলিয়ে সবুজ, আর নীল আর লালে মিলন ঘটিয়ে বেগুনী।

মা'র এইসব অপকীর্তি ধরা পড়ত হাতের ছোপে। মা'র ছোট জায়েরা দেখে মুখ টিপে হাসতেন আর মার বড় জা বলতেন, চব্বিশ ঘণ্টা পুতুল খেলেও সাধ মিটছে না তোর ? আবার শিঙ ভেঙে বাছুরের দলে ? পুতুলের বিয়ে-সাদী কিছুই তো বাকী নেই!

বলতেই পারেন। মায়ের তো ইতিমধ্যেই কতক খেলতে হয়নি। ওই হাঁদাটা যখন নাকি বছরখানেকের, তখন মায়ের প্রথম সন্তান বছর বারোর মেয়েটার তো বিয়ে হয়ে গেছে।

দূরে শ্বশুরবাড়ি তাই আসা-যাওয়ার পাট নেই। হাঁদা তো তাকে দেখেইনি প্রায়। তবে দেখতে পেলো শীগগিরই। ছোটখাটো ফর্সা ধবধবে প্রায় পুতুলের মতই শরীরটাকে ভারাক্রান্ত করে এসে পড়ল একদিন বড়দি। আর কিছুদিনের মধ্যেই হঠাৎ একটা রাত্তিরে সেই অন্ধকার-অন্ধকার ঘরটার বাসিন্দা হয়ে গেল ? যে ঘরের চৌকাঠ ডিঙোলেই স্নানের হুকুম।

মায়ের হাতে তখনো পুতুলের কাপড় ছোপানোর রঙের ছোপ। এতদিন পরে, জীবনের এত চড়াই উৎরাই পার হয়ে এসেও কি অতৃপ্ত শৈশবের খেলাঘর হাতছানি দিত তাঁকে ?

ওই ঘটনার কদিন পরেই বাড়িতে আবার সেই শিশু-উৎসবের আয়োজন। বছরে দু-একবারই যেটি হতে দেখা যায়।

'আটকৌড়ে।'

যেটা নেহাতই শিশুগণকে নিয়ে।

তাই বলে কি মেয়েগুলোর কোনো ভূমিকা থাকবে? দূর, তারা তো মাত্র দর্শকের ভূমিকায়। তারা হাঁ করে দেখবে, বাড়ির ছেলেরা এবং পাড়া থেকে ডেকে আনা ছেলেরাও কী ভাবে একখানা খৈ-ভর্তি কুলোকে পিটিয়ে পিটিয়ে লাট করবে আর বীরবিক্রমে ছড়া আওড়াবে 'আটকৌড়ে বাটকৌড়ে ছেলে আছে ভাল—'

তাদের উদ্দাম পিটুনিতে কুলোর খৈ ছিটকে ছিটকে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে ছড়িয়ে পড়বে। যত বেশী ছড়াবে, নাকি নবজাতকের ভবিষ্যৎ জীবনে তত বেশী ঐশ্বর্যের বিস্তার।

ওই কুলো-পিটুনী ছেলেদের ভাগ্যে অতঃপর মাটির হাঁড়িতে এক হাঁড়ি করে খৈ মুড়কি আটকড়াই ভাজা আর আট জোড়া, নিদেনপক্ষে আটটা মিষ্টি এবং খৈ-মুড়কির অন্তরালে লুকিয়ে রাখা 'গুপ্তধন'।

আগে থেকে বোঝা যাবে না কী আছে। তাই পরম রোমাঞ্চ। কিন্তু কী সেই গুপ্তধন? হায়! গেরস্থঘরে বড় জোর একটি করে দুয়ানি, কি আরও জোর হলে একটি করে সিকি। ব্যস! বড়লোকের বাড়িতে এবং নবজাতকের 'আদর' অনুযায়ী হয়তো আস্ত টাকা-ফাকা থাকে, কিন্তু সে কি আর এরকম বাড়িতে? যেখানে বছরে একাধিকবার এ উৎসবের আয়োজন করতে হয়। একটাই শুধু উদারতা, মেয়ে জন্মালেও এ উৎসব হয়। হতেই তো হবে। আটকৌড়ের ঘটা না করলে মেয়ে যে আঁটকপালী হবে।

আঁটকপালী সেটা আবার কী?

কী আশ্চর্য! না বোঝবার কী আছে? শব্দটাতেই তো মালুম!

কপালটায় যার বজ্র আঁটুনি। খোলামেলা নয়। আর সেটা না হলেই তো মুশকিল!

আর যাই হোক, এই একটি ব্যাপারে মেয়েদের জিত। তাদের কপালেই তো পুরুষের ধনসম্পদ। স্ত্রীভাগ্যে ধন, শাস্ত্রের বচন! আবার ওই স্ত্রীর এয়োতের জোরেই পুরুষের পরমায়ু। ওই এয়োতটিকে শক্ত করে বাঁধতেই না মহিলাকুলকে হাতে লোহার বেড়ি পরে থাকতে হয়।

যে যত বেশী পতিব্রতা, তার হাতের লোহার সংখ্যা তত বেশী!

॥ ৩ ॥

কী আশ্চর্য! না বোঝবার কী আছে? শব্দটাতেই তো মালুম! কপালটা যার খোলা নয়, বজ্র আঁটুনি! তা সেটা মুস্কিলের বৈ কি।

আর যাই হোক, এই একটা জায়গায় মেয়েদের জিৎ! তারাই নাকি পুরুষের ভাগ্যনিয়ন্তা। তাদের ভাগ্যের জোরেই পুরুষের ধনসম্পদ, তাদের 'এয়োত'

নামক এক অদৃশ্য শক্তির হাতেই পুরুষের আয়ু। তাই না ওই এয়োতটাকেই শক্ত করে বেঁধে রাখতে, হাতে লোহার বেড়ি পরে বসে থাকতে হয় মেয়েদের। যত বেশী পতিব্রতা, তত বেশী সংখ্যায় লোহা ধারণ।

পাঁচ সাত দশটা পর্যন্ত লোহধারিণীও দেখা যেত বৈ কি!

তা বলে কি আর ভাগ্য-দুর্বিপাকে কখনো সেই লোহসম্ভার খুলে ফেলতে হত না? সে কথা স্বতন্ত্র। 'পূর্বজন্ম' বলে একটা ব্যাপার নেই? আর তার আদালত নেই?

অতএব পুরুষ জাতির আয়ু আর ভাগ্য যে মেয়েদের হাতেই, এ সত্যকে উড়িয়ে দেওয়া উচিত নয়। যে মেয়েমানুষ পূর্বজন্মে মহাপাপ করেছে, তার স্বামী বেচারাকে আর কে যমের হাত থেকে কাড়তে পারে?

বড়দি তাঁর ক্ষুদে শাবকটিকে নিয়ে তাঁর পাহাড়চূড়োর শ্বশুরবাড়িতে চলে গেলেন। বাবাঃ, পাহাড় বলে পাহাড়! একেবারে হিমপাহাড়। এ বাড়ির কোনো মেয়ের এমন বিদঘুটে জায়গায় শ্বশুরবাড়ি নয়! কিন্তু উপায় কী? শ্বশুরের যে ওইখানেই কাজ। ওই পাহাড় কেটে রাস্তা বানানো, আর বেয়াড়া ঝর্ণাগুলোকে বাঁধ দিয়ে জব্দ করার তদারকীর চাকরি!

বর? আহা তিনি তো কলকাতায় একটা মেসে পড়ে থেকে কলেজের পড়া করে মরছেন। বৌকে তার বাপেরবাড়ির থেকে নিয়ে ওই পাহাড়চূড়োয় পেঁছে দেওয়া পর্যন্তই তাঁর দায়িত্ব।

তা তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন করতে তৎপর দেখাতে ত্রুটি করলেন না। বুক ভেঙে গেল এই 'আমি'দের। 'দিদি' 'ছোটবোন' আর 'আমি' এই তিনটে টুকরো নিয়েই তো একটা অখণ্ড বস্তু। যদিও ছোট বোনটা নিজেও ক্ষুদেই; তবু সেও ওই মর্মবেদনার শরিক।

আহা কেমন সুন্দর ডল পুতুলের মত দেখতে সেই বাচ্চাটা! কুচি কুচি হাত পা নেড়ে নেড়ে খেলা করতো!

কিন্তু শুধুই কি ওই 'মন-কেমন'টুকুই? সেটা বললে সততা বজায় থাকে না।

'মাঠ'-এর ধারের একতলার এই ঘরখানা থেকেই একজনা সেজেগুজে রেলগাড়ি চড়তে চলে গেল, এ যে একটা হৃদয় খাঁ খাঁ করা বেদনা!

চলে যাবার আগে তাই আকুল প্রশ্ন, 'বড়দি, রেলগাড়িটা কু খসখস করবে?'

এ মা! তা করবে না? রেলগাড়িটা ছাড়ার সময় ইঞ্জিনের 'কুউ' আর চলার সময় সমস্তক্ষণ চাকার খস খস!

ইস! তোমার কী মজা বড়দি!

মজা? আমার খুব মজা দেখছিস তোরা?

হঠাৎ বড়দি কাপড়ের কোণটা মুখে চেপে প্রায় ডুকরে উঠল।

এ কী রে বাবা! এটা কী হল!

আমি আর দিদি ভয় পেয়ে ছুটে পালিয়ে এলাম। এবং দিদিই ওই আকস্মিক ডুকরে ওঠার কারণটা আবিষ্কার করল।

শ্বশুরবাড়ি যেতে হচ্ছে তো ! মনে কত কষ্ট, আর আমরা কিনা বললাম 'মজা' ! খুব দোষ করে ফেলেছি রে !

ছ বছরের দিদি তার চার বছরের বোনকে জ্ঞানদান করে, আমাদের পাপ হল।

পাপপুণ্যেও সংহিতাটা বড় জোরালো ছিল এ বাড়িতে।

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, আমি তো শুধু রেলগাড়ি চড়ার জন্যে মজা বলেছি। আমরা কি জন্মে কখনো রেলগাড়ি চড়েছি ?

তা সত্যি ! তার সেই চার বছরের জীবনে এমন অলৌকিক ঘটনা ঘটেনি।

দিদি বলল, তাহলে কি হবে, মনে কষ্ট দেওয়া হল তো ? সেটাই তো পাপ।

পাপের ভারে বিড়ম্বিত, আর মর্মদাহে কণ্টকিত আমিটা বড়দির সামনে আর যেতেই পারে না। দূর থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে বড়দির ফর্সা ফর্সা পায়ে চওড়া করে আলতা পরানো হল, বড়দি একখানা নতুন শাড়ি পরল, আর সেই শাড়ির আঁচল দিয়ে ঘন ঘন চোখ মুছতে মুছতে মুখটা লালে লাল করে ফেলল। কোরমাখানো লালপাড় শাড়ি থেকে তো রং উঠবেই।

বাড়িতে কত লোক !

সবাই ভীড় করেছে যাত্রাকালে, আহা কোন্ দূরে শ্বশুরবাড়ি, আবার কত-দিনে আসবে মেয়েটা ! কান্নার ফোঁসফোঁসানি চলছে। মায়ের সঙ্গে ঠাকুমা, জেঠিমা, খুড়ীমাদের মধ্যে তফাত কিছু নেই। মা বরং চাপতে চেষ্টা করছেন, ওঁদের সে চেষ্টা নেই।

ঠাকুমার নাকি নাতি-নাতনী, তবু কাঁদো-কাঁদো হয়ে বড়দিব বরের হাত ধরে বললেন, আবার শীগগির শীগগির এনো দাদা।

তার মানে দূরে শ্বশুরবাড়ি হওয়ায় বড়দি বিশেষ একটু মূল্যবান হয়ে গেছেন। যা সহজলভ্য নয়, তাই তো মূল্যবান।

ঠাকুমার আরো সব নাতনীদের শ্বশুরবাড়ি কলকাতার মধ্যেই, এখানে সেখানে, টুনুদির বুঝি বদ্যিবাটি না কোথায়, আর কার যেন রেলগাড়িতে দুটো ইস্টিশন শ্যামনগর না রামনগর কী যেন। তাদের তো সব সময়ই দেখতে পাওয়া যায়, শ্বশুর-শাশুড়ীর কাছে গিয়ে একটু খোসামোদ করতে পারলেই হল। যে কেউ গিয়ে একখানা সেকেণ্ড ক্লাস ঘোড়ারগাড়ি ভাড়া করে নিয়ে আসতে পারে। আবার ফেরত দেবার সময় সঙ্গে অনেক মিষ্টিটিষ্টি দিলে, ভবিষ্যতের পথটাও মসৃণ করে রাখা যায়।

কিন্তু বড়দি ?

কে যেতে পারবে তাঁকে সহজে আনতে ? ওই জামাইবাবু যখন ছুটিতে বাড়ি যান, তখনই যা আনা নেওয়ার ব্যবস্থা। কিন্তু বড়দিদির শ্বশুর পাঠালে তো ? বৌমাকে তিনি এত ভালবাসেন, না দেখলে নাকি থাকতে পারেন না।

ঠাকুমা বলেন, 'ভালবাসা না ঢেঁকি ! বোবাহাবা নিরীহ মেয়েটা চব্বিশ ঘণ্টা খেটে মরে ওনাদের সেবা করে, তাই ! তাদের বৌ নইলে ঘর চলে না, আঁধার ঘরে দীপ জ্বলে না।'

কথার মাঝখানে মাঝখানে ছড়া আওড়ানোটি ছিল সেকালের বাকভঙ্গী। জেঠিমা পিসীমারা দুপুরে তাসের আড্ডায় কত যে ছড়া আওড়াতেন, হাসির বান ডাকতো। ছোটরা অবশ্য কার্যকারণটা সব বুঝতো না, তবে একশো তাড়া খেয়েও নড়তোও না সেখান থেকে।

ঠাকুমাও মাঝে মাঝে ছড়া আওড়াতেন তবে তার মধ্যে হাসির ছিটেফোঁটা বড় একটা থাকতো না।

ঠাকুমা তাঁর শান্ত নামের নিরীহ ভালমানুষ নাতনীটার জন্যে মায়ায় গলে বলেন, 'পরের মেয়ে পেলুম হাতে, ঘি পড়ল তপ্ত ভাতে। মেয়েটাকে হাড় পিষিয়ে খাটিয়ে মারবে, আর মুখে বলবে, না দেখে থাকতে পারি নে।'

অথচ সেজপিসীর মেয়ে রাধীদি?

সেও তো নাতনী? কিন্তু তার বেলায়?

তাকেও শ্বশুরবাড়িতে খুব নাকি খাটতে হয়। শুনে সকলেরই দুঃখ হয়, কিন্তু ঠাকুমা কিনা অনায়াসে বলেন, ঠিক হয়েছে, বেশ হয়েছে! রাধীর উপযুক্ত হয়েছে। কথাতেই বলে

'হলুদ জব্দ শিলে,
চোর জব্দ কীলে,
আর ব্যাদড়া মেয়ে জব্দ হয়
শ্বশুরঘরে গেলে।'

রাধী কি কম ব্যাদড়া ছিল? কুঁড়ের রাজা। অবাধ্যর শিরোমণি।

শুনে আমিদের বড় দুঃখ হতো। ঠাকুমাকে মনে হতো কী নিষ্ঠুর! এও মনে হতো রাধীদি কালো কুচকুচে বলেই বোধ হয়। ইস্!

আশ্চর্য কাণ্ড, সেই ঠাকুমাই রাধীদির একবার খুব শক্ত অসুখ করায় কী যে করলেন। রোজ সকালে মা কালীর খাঁড়া-ধোয়া জল এনে নিজে ছুটতেন রাধীদির শ্বশুরবাড়ি দর্জিপাড়া না কোথায় যেন, সেই জলটি খাইয়ে আসতে।

একদিন আবার কোথা থেকে যেন একটা মাদুলী নিয়ে এসে পরিয়ে দিয়ে এলেন রাধীদিকে। আর রাধীদি সেরে উঠলে, কালীঠাকুরের কাছে বুক চিরে রক্ত দিয়ে এলেন।

বুক চিরে রক্ত!

কথাটা শুনে 'আমি কোম্পানী' শিউরে উঠে ঠকঠক করে কাঁপতে থাকে যতক্ষণ না ঠাকুমা কালীবাড়ি থেকে ফেরেন। কী জানি কী ভয়াবহ দৃশ্যই না দেখতে হবে। ওই তো রোগা বুক ঠাকুমার, চিরে ফেলার পর তার মধ্যে থেকে কী দেখতে পাওয়া যাবে? শুধুই হাড়? নাকি বুকের মধ্যে যে বাক্সটায় মনটন থাকে, সেটাও বেরিয়ে পড়বে?

কিন্তু ঠাকুমা ফিরে আসার পর দেখা গেল সেসব ভয়ানক কিছু না, শুধু ফর্সা থানের ভেতর থেকে দেখা যাচ্ছে বুকের মাঝখানে একখানা বেলপাতা সেঁটে আটকানো। ওতেই নাকি রক্ত পড়া আটকানো হয়েছে। আর বুক চেরাটাও তো বেলগাছের কাঁটা দিয়ে। তাই নিয়ম।

পরে অবশ্য মা জেঠিমার কাছে জানা গেল, এটা কোনো ব্যাপারই নয়। ঠাকুমার কাছে এটা 'জলজাত'! কারুর 'শক্ত' অসুখ করলে ঠাকুরের কাছে 'রক্ত' মানত করবেন, এটা তো খুবই স্বাভাবিক। আর ঠাকুরকে দিতে হলে বুকের রক্ত ছাড়া কী আর আঙুল কেটে রক্ত দেবেন?

ঠাকুমার নিজস্ব আত্মজনই তো বিশাল, পিতৃকুল শ্বশুরকুল এবং নিজের ডজনাধিক পুত্রকন্যার তদনুসারেই তাদের সন্তানসন্ততি ব্যতীতও পরিচিত জন। পাড়াপ্রতিবেশী, কোন্ ঘরেই না অসুখবিসুখ লেগেই আছে? অতএব? ঠাকুমার 'মানৎ' করার এবং মানৎপুজো দিতে যাবার ব্যাপারটা অতএব অব্যাহত অনাহতই! সমগ্র ভারতে যেখানে যত 'জাগ্রত' দেবদেবী আছেন, ঠাকুমার প্রার্থনার বাণী পৌঁছে যাচ্ছে তাঁদের সকলের কাছে। যদিও তিনি প্রধানতঃ মা কালীর চরণাশ্রিতা, তা বলে তেত্রিশ কোটির কাউকেই কি নিশ্চিত থাকতে দেবেন নাকি? তেমন তেমন ক্ষেত্রে বিষ্ণুমন্দিরে একশো আট তুলসী চড়িয়ে মা কালীর গলায় একশো আট জবার মালা ঝুলিয়ে সোজা চলে গেলেন তারকেশ্বরে 'হত্যে' দিতে। দত্তগিন্নীর ছেলে ফটকে না কে, বলা নেই কওয়া নেই, হঠাৎ একদিন পাগল হয়ে গিয়ে দিগম্বর হয়ে নাচ শুরু করে দিল। ঠাকুমা ছুটবেন না তারকেশ্বরে? পাড়ার লোক বলে কি ফেলনা? ফটকে তার মায়ের ছেলে নয়? স্ত্রীর স্বামী নয়? কাচ্চা-বাচ্ছার বাপ নয়? তাহলে? তাকে তার 'সাহেবে'র আপিসের চাকরি ঘুচিয়ে অবাধে নাচতে দিলে চলবে? সেই নাচনে সংসারটা ভেসে যাবে না দত্তগিন্নীর?

আর জলজ্যান্ত একটা মানুষ, হাত পা চোখ কান বুদ্ধি বিবেক থাকতে তাকিয়ে বসে দেখবে সেই ভেসে যাওয়া? একটু বাঁধ দিতে চেষ্টা করবে না? 'ধর্ণা দেওয়া' 'হত্যে দেওয়া' এসব শব্দগুলো তবে আছে কী করতে? বাবা তারকনাথই বা বসে আছেন কোন্ কর্মে লাগতে?

অতএব 'বাবা'কে তাঁর কর্তব্যকর্ম সম্বন্ধে অবহিত করে দিতে ছুটতেই হয় মহিলাটিকে তারকেশ্বরে হত্যে দিতে।

তা শুধুই কি দত্ত-গিন্নী? আরো কত গিন্নীর সঙ্গেই তো পরিচয় ঠাকুমার গঙ্গার ঘাটে, কালীঘাটে, যত সব ঠাকুরতলায়, নিত্য চোখোচোখি মুখোমুখি নয়? তাদের সুখদুঃখু দায়দায়িত্বর শরিক হতে হবে না? মনিষ্যি না মেষ?

মহিলাটি কবরেজবাড়ির মেয়ে, কবরেজবাড়ির বৌ, তাঁর নিজের এক পুত্র ভাল পাসকরা ডাক্তার, কিন্তু ওষুধের থেকে অনেক বেশী আস্থা রাখেন মহিলা তেত্রিশ কোটির ওপর।

কাজেই অবধারিত যে বাড়ির এই শিশুবাহিনীর কারো কোনো অসুখটসুখ করলেই তাকে ঠাকুরের চন্নামেত্তর, তুলসীতলার মাটি, মা কালীর খাঁড়া-ধোয়া জল এবং মসজিদের জলপড়া খেতে হবে।

এতগুলো ছেলেমেয়ে, কিছু না কিছু তো লেগেই আছে। অতএব গৃহভৃত্যের প্রায় নিত্যকর্মেরই অন্তর্গত সন্ধ্যার মুখে ছোট একটা পেতলের ঘটিতে জল ভর্তি করে তার মধ্যে একটি পয়সা ফেলে, আর একটি লোহার চাবি বা পেরেক

অর্থাৎ লোহশলাকা গোছের ডুবিয়ে নিয়ে কোনো মসজিদের দরজার পাশে গিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকা। কথাটি বলা চলবে না।

নমাজকারীরা নমাজ সেরে বেরিয়ে আসার কালে ঘটির জলে একটি করে 'ফু' দিয়ে চলে যান। (তাঁদেরও এটি জানা ব্যাপার।)

সকলের নিষ্ক্রমণ-পর্ব সাঙ্গ হওয়া মাত্রই ঘটির মুখে হাত চাপা দিয়ে তীরবেগে সো-জা চলে এসে পীড়িত শিশুর হাঁয়ে ঢেলে দিয়ে তবে নিশ্চিন্দি। লোহা পেতল তামার (পয়সা তো তামাই হবে। তাছাড়া আর কিছু হওয়া সম্ভব কে জানতো?) স্পর্শযুক্ত জলে 'নমাজ পবিত্র' ফু' যে অব্যর্থ কার্যকরী ছিল সেটা সন্দেহাতীত। তা না হলে নিত্যই ছুটতে হতো কেন লোকটাকে মসজিদের দরজায় গিয়ে দাঁড়াতে? ব্যর্থ হলে কি উৎসাহ কমে যেত না?

এ বাড়ির শিশু কোম্পানীর 'খেলা'র একটা শাখাই ছিল একটা ঘটি যোগাড় করে জল ভরে তাতে চাবি ঢুকিয়ে কোনো একটা দরজার পাশে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকা।

বাকিদের কাজ তো বলাই বাহুল্য, সেই জলে ফুৎকার দান। গঙ্গা নাইতে যাওয়াও ছিল খেলার অপর একটি শাখা। শিশু অনুকরণপ্রিয়, তাই পরিবেশের ছাঁচে তার গড়ন।

পরিবেশের ছাঁচেই তার ছাঁচ।

তবে ওই 'আমি' নামের মেয়েটার বড়ই দুঃখ, ওই সব স্বর্গীয় জলের স্বাদ পাবার সৌভাগ্য তার কদাচ ঘটে না। এমনই লোহার মত শরীর যে অসুখও তার ধারেকাছে ঘেঁষতে পায় না। বামুনদিব ভাষায় 'মেয়ে তো না, পাথরকুচি।'

বড়দির জন্যে যে ঘোড়ারগাড়িটা এসে বহুক্ষণ অপেক্ষা করছিল, সে এবার তাগাদা লাগাল এবং সতেজে জানাল, আর দেরি করলে দু আনা পয়সা বেশী দিতে হবে।

অতএব তৎপরতা। দ্বিতীয় প্রস্থ পায়ের ধুলো নেওয়ার ব্যাপারে ঠেলাঠেলি। কারণ দরজার সামনে সবাই এসে ভীড় করেছে, তার সঙ্গে চলছে কান্নার ফোঁস-ফোঁসানি। এদেরই মধ্যে পায়ের কাছাকাছি চলে এসেছে 'পাপ করে ফেলার' ভয়ে কাঁটা আমি নামের মেয়েটা। বড়দিকে নমস্কার তো করবে, কিন্তু কোন্ সাহসে? ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ অনুভব করল মাথার ওপর একটি কোমল স্নেহস্পর্শ! গালের কাছে একটু আঙুলের ছোঁওয়া!

এ কী? এ কোন্ স্বর্গলোকের অমৃত স্বাদ? কোন্ মন্দাকিনী ধারার স্নিগ্ধতা? তার মানে বড়দি তাকে ক্ষমা করেছেন।

মেয়েটা হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠল।

কে যেন বলল, আহা ওটাকে একটু দ্যাখ কেউ! মন-কেমনে মরছে।...সেই মৃত্যু থেকে উদ্ধার করতে অবশ্য এল না কেউ, নিজেই চুপ করে গেল। কিন্তু এ কান্না কি তার 'মন-কেমনের দুঃখের?' তা তো নয়, এ কান্না তার গভীর এক আনন্দের। দুঃসহ যন্ত্রণামুক্তির আনন্দের।

মা বলেন, লোকের মনে কণ্ট দেওয়ার বড়ো পাপ আর কিছু নেই। সেই পাপ করে ফেলেছিল সে। তবু বড়দি তাকে ভালবাসলেন! আদর করলেন!

এ আনন্দই কম আলোড়নের?

অপরাধবোধের যন্ত্রণা কী দুঃসহ!

ক্ষমা পাওয়ার আনন্দ কী অভিভূতকারী! অপরাধটা যে হাস্যকর তুচ্ছ, সেটা বোঝবার বয়েস নয়, তাই পাপের বোঝাটা ছিল গুরুতর। অতএব তার থেকে মুক্তির আনন্দটিও অগাধ।

শিশুর উপলব্ধির জগৎ তৈরী হয় কোন্ বয়েসে? আর স্মৃতির রেখাটা পিছোতে পিছোতে কোন্‌খানে গিয়ে ঝাপসা হয়ে মিলিয়ে যায়?

তিন জোড়া সাদা ধবধবে, আর তিন জোড়া লাল টুকটুকে মোজা! লম্বা লম্বা 'ফুল মোজা'! ছোট বড় মাঝারি। সব ছোটটা ছোট বোনের, মেজটা আমির দিদির, আর বড়টা আমির। বাড়ন্ত গড়নের দায়ে জামা জুতো মোজা ইজের সবই তার দিদির থেকে বড়। অবশ্য এ হেন অপূর্ব সুন্দর মোজা একসঙ্গে দু জোড়া, এ তো পুজোর সময়ও ভাগ্যে ঘটে না। এ এক দুর্লভ ভাগ্যের দান। শুধু কি মোজা? গার্টার নয়, ঘুন্টিদার নতুন জুতো নয়? মোটকা মোটকা গরম ফ্রক নয়? মাথায় বাঁধবার রিবণ নয়? মুখে মাখবার ভেসলিন? কী বিভোর আনন্দে বারে বারে শুধু দেখা।

বিভোরতা ধাক্কা খেল।

দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন বামুনদি।

বলে উঠলেন, হঠাৎ তোরা কী এত রাজ্যপদ পেলি রে? ক্রমাগত জিনিসের ওপর জিনিস আসছে?

হ্যাঁ, এ টোনে কথা বলার অধিকার আছে তাঁর! স্বেচ্ছায় কেউ অধিকারটা তাঁর হাতে তুলে দিয়েছে, না নিজেই অর্জন করে নিয়েছেন তিনিই জানেন, তবে একমাত্র ঠাকুমা এবং জেঠিমা ব্যতীত সকলের সঙ্গে তাঁকে এরকম সুরে কথা বলতে শোনা যায়। কেউ পছন্দ করে না, তবু রাগ দেখাতেও সাহস পায় না।

আমিরাও অবশ্যই এটা পছন্দ করল না, তবু উত্তর তো দিতে হবে? বলে উঠল আমি, বাঃ, আমরা বুঝি রাঁচী যাব না? রাঁচীতে এখন ভীষণ শীত নয় বুঝি?

তাই বুঝি? রাঁচী যাবি তোরা? তাই বলি, তোদের এতো সব জিনিস, মেজ বৌদিদির দু'দু'জোড়া কাপড়, সেমিজ! ভাবছি ব্যাপার কী?

আমি রেগে বলে উঠল, দেখে তোমার হিংসে হচ্ছে বুঝি?

অ্যাঁ! কী বললি? অ-মা! আমি কোতায় যাব? পুঁচকে মেয়ের কথা শোনো! শিক্ষেদীক্ষে তো বেশ ভালই হচ্ছে মেয়েদের।

ফরফরিয়ে চলে গেলেন তিনি।

দিদি কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলল, তুই ওকথা বলতে গেলি কেন? দ্যাখ এখন বাড়িতে কী কাণ্ড হয়!

উনি কেন ওরকম বলবেন ?

উনি তো বড়। বড়রা তো ছোটদের যা ইচ্ছে বলতেই পারে রে। তোরই দোষ হলো !

আশ্চর্য, এখন এই 'দোষ' ঘটবার ব্যাপারে তিলমাত্র পাপবোধ এল না আমির ! বলে উঠলো, হলো তো হলো !

কিন্তু ব্যাপারটা কী এতই সোজা ?

হলো তো হলো ?

জনে জনে সকলের কাছে একচোট করে বকুনি খেয়েও মেয়েটাকে গোবিন্দদার কাছে খেতে হল না কানমলা আর গাঁট্টা ? কেন কে জানে এ সংসারের শিশু-বিভাগের দণ্ডমুণ্ডের কর্তার পোস্টটা দিয়ে রাখা হয়েছে গোবিন্দদাকে। যখন যে যা দোষ করে বসবে, তাকে নিয়ে গিয়ে হাজির করা হবে তাঁর এজলাসে। এবং কাঠগড়ার আসামীর প্রতি তিনি যে শাস্তি বিধানই করুন, বাড়ির আর সকলকে তার নীরব দর্শক হিসেবে থাকতে হবে। প্রতিবাদ ? অসম্ভব। তাহলে গোবিন্দদার মানসম্মান ধুলোয় চলে যাবে না ? কে বলতে পারে গোবিন্দদা নিজেই চলে যাবেন কিনা এ বাড়ি থেকে !

শাস্তিটা অধিক হচ্ছে বুঝেও অতএব সবাই নিশ্চুপ। তবে বাদে ঠাকুমা। ঠাকুমার দৃষ্টিগোচর হলেই বলে ওঠেন, আহা ইস্ ! ওটাকে অমন গোবেড়েন ঠ্যাঙাচ্ছিস কেন গোবিন্দো ? সেই যে বলে না—রাজার থেকে গজার দাপট বেশী, রোদের থেকে তপ্ত বালির ঝাঁজ ! তোর হয়েছে তাই ! ছেড়ে দে তো !

অতএব আসামীর ফাঁসি মকুব। তবে ঠাকুমা আর কতক্ষণ বাড়ি থাকেন ? আর বাড়ি থাকলেও কতটুকু এইসব লীলাক্ষেত্রে উপস্থিত থাকেন ?

কিন্তু গোবিন্দদা কে ?

ওমা কে না জানে বড় পিসিমার কোলের ছেলে। গুটি বারো সন্তানকে সুশৃঙ্খলে পৃথিবীর আলো দেখিয়ে ত্রয়োদশটির বেলায় হঠাৎ নিজেই চোখে অন্ধকার দেখে পৃথিবীর আলোর মায়া কাটিয়ে বিদায় নিয়েছেন ভদ্রমহিলা। কাজেই শৈশব কেটেছে গোবিন্দর এ বাড়িতেই দিদিমার হেফাজতে। প্রকৃতপক্ষে অবশ্য মামীদেরই। দিদিমা কি বুড়ো বয়েসে কাঁথাকানি নাড়তে বসবেন ? না দুরন্ত ছেলেকে ধর-ধর করতে যাবেন ?

তা মানুষ-টানুষ হয়ে চলে গিয়েছিলেন গোবিন্দ, এখন আবার কলকাতায় এসে বসেছেন চাকরির চেষ্টায়। চাকরি অবশ্য বারেবারেই জুটেছে, 'বেকার' বলে শব্দটা তো এতো মাত্রায় ছিল না সেকালে। 'আত্মীয় পোষণ' শব্দটাও এমন গর্হিত নিন্দনীয় ছিল না। আত্মীয় সমাজে কেউ একজন আপিসে চাকরি করলেই ভাইপো ভাগ্নে শালাপো শালীপো, পাড়াপড়শীর ছেলেকে নিয়ে গিয়ে ঢুকিয়ে দেবে এ তো স্বাভাবিক। সেটাই মনুষ্যত্ব !

গোবিন্দও সেই স্বাভাবিক ব্যবস্থার ফললাভ করেছিলেন কয়েকবারই কিন্তু অত খাটুনি না পোষালে ? কাজেই আপাততঃ তিনি এ বাড়ির বালখিল্যদের গার্জেন কাম দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ! তা তিনি যদি কারো মুণ্ডচ্ছেদ করতেও চান,

কার কি সাধ্য আছে প্রতিবাদ করার ? একটু এদিক-ওদিক হলেই তো তিনি বলে বসবেন, নাঃ, আর নয়। এবার মানে মানে সরে পড়াই ভাল।

কী ভয়ংকর রূপ নেবে সেই 'সরে পড়া'টি কে জানে ? কল্পনাতেই মামীরা কোন্ ছার, বাঘাবাঘা মামারাও ভয়ে কাঁটা।

শুধু 'নির্ভয়' আসল লোকটি।

দিদিমা!

তিনি এরকম কথার আভাস শুনলে বলেন, সাধে আর বলেছে 'জন জামাই ভাগনা, তিন হয় না আপনা।' মামাদের এত যত্ন তোয়াজ, তবু তেজ দ্যাখো! সরে পড়ে যাবেন কোথায় ? গুপ্তিপাড়ার সেই ভাঙা দালানকোঠা তো, দাদাদের সংসারে কুলছাপানো!

তা তিনি যাই বলুন, আর সবাই তটস্থই থাকে। দিক কুচোকাচাগুলোকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, এবেলা ওবেলা ফাঁসি এবং যখন তখন 'রামধোলাই', রাম-চিমটি, শ্যামচিমটি, আড়াইপ্যাঁচের কানমলা, বোম্বাই গাঁট্টা।

তা আসামীদের ওসব গা-সহা হয়ে গেছে। সেক্ষেত্রে শুধু 'একটু ঠোকন গাঁট্টা বা এক প্যাঁচের কানমলায় কী এত এসে যাচ্ছে ? তাদের জীবনে যে এখন সেই অলৌকিক ঘটনাটি ঘটতে যাচ্ছে।

কুউ—খস খস রেলগাড়ি চড়ে রাঁচী যাওয়া!

॥ ৪ ॥

কিন্তু রাঁচীতে কেন ?

কেন আবার, এখন সেটা মামারবাড়ি না ? রাঙামামা থাকেন না সেখানে ?

তামিদি রামীদি রাধাদিদের মত মাত্র একটাই মামারবাড়ি নয় তো আমিদের। ওদের কেষ্টবিষ্টু সাত মামার মধ্যে জনাচাবেক অবিভক্ত বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার যে কোনো ভাল শহরেই কিছুদিন কিছুদিন করে 'বাড়ি' লাভ করে বসবাস করে থাকেন। অবশ্য কোর্টকাছারি থাকা জায়গা হওয়া চাই।

এখন রাঙামামা রাঁচীতে। এবং দিদিমা সেখানেই অবস্থান করছেন, অতএব আপাততঃ ভাগ্নে-ভাগ্নীদের সেটাই মামারবাড়ি। অর্থাৎ আমিদের মায়ের বাপের-বাড়ি। দৈবক্রমে নিজে দিদিমা হয়ে পড়েছেন বলে কি মা বাপেরবাড়ি যাওয়ার দাবিটি ছাড়বেন ? সাত দাদা আর তিন দিদির নীচেয়, তিনিই তাঁর মায়ের কোলের মেয়ে না ? তাছাড়া এখন তো তাঁর বাপেরবাড়ি আসা দরকারই।

গোবিন্দদার ঘোষণা, রাঁচীতে কারা যায় জানিস ? পাগলরা!

আহা! রাঙামামারা তাহলে পাগল ?

গোবিন্দদা বলল, 'আহা, ওনাকে তো চাকরির জন্যে যেতে হয়েছে।'

আর মা ?

মামীর কথা বাদ দে। পাগলই তো। নতুন কিছু না। বাপেরবাড়ির

নামে পাগল। কই মামা যাচ্ছেন রাঁচীতে, তোর দাদারা ?

বাবার বুঝি আপিস নেই ? আর দাদাদের একজামিন ? একজামিন হয়ে গেলেই যাবেন।

তা ওরা যাবে, চলে আসবে। তোদের তিনটেকে পাগলাগারদে ভরে ফেলবে। আর ফিরতেই পাবি না।

ফেলবে তো ফেলবে। পাব না তো পাব না।

বলে দিদি মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়। এখন ওদের রেলের টিকিট কেনা, বাক্স-বিছানা রেডি, তাই আর তেমন ভয় নেই। এই যাত্রাকালে, যখন কপালে ফোঁটা দেবার জন্যে দইয়ের ভাঁড় পর্যন্ত এসে গেছে, মা-কালীর নির্মাল্য মানে শুকনো জবা আর শুকনো বেলপাতারা মায়ের প্যাঁটরার মধ্যে ঢুকে গেছে, তখন কি আর গোবিন্দদা আড়াই প্যাঁচ-এর প্রেসক্রিপশনটি কাজে লাগাতে আসতে সাহস করবেন ? ঠাকুমা নেই ধারে-কাছে ?

দাদারা যেতে পাবেন না, ওঁদের একজামিন। খুব খারাপ লাগছিল, তবু নিজের আনন্দটাকেও তো অবহেলা করা যায় না ? যত গোছগাছ হচ্ছে, ততই আহ্লাদে চোখে জল এসে যাচ্ছে আমির।

দিদি, আমরা তাহলে সত্যিই রেলগাড়ি চড়তে যাচ্ছি ?

দিদি এত বিহ্বল নয়, দিদি আত্মস্থ। তাই দিদি চুপিচুপি বলে ওঠে, এই, তুই এত হ্যাংলা কেন রে ? লোকে শুনলে হাসবে। কেউ যেন কখনো রেলগাড়ি চড়ে না ? আমিই তো চড়েছি।

ধ্যাৎ !

ধ্যাৎ মানে ? ধানবাদে যাইনি আমি মার সঙ্গে নমামার বাড়ি !

আহা রে ! আমায় ফেলে রেখে ?

তুই তো তখন জন্মাসইনি।

জন্মাইনি ! তুমি তাহলে কত বড় তখন ?

বয়সে বড়কে 'তুই' বলার আইন ছিল না এ বাড়িতে। হলেও এক দেড় বছরের বড়। বড়কে আবার তুই বলতে আছে নাকি ?

দিদি বলল, কত বড় তা কি মনে আছে ?

হি হি, তুমি তখন নিশ্চয় কাঁথায় শোওয়া।

বেশ, তাই তো তাই। কাঁথায় শোওয়া বলে কি রেলগাড়ির সাহেবরা আমায় উঠতে দেয়নি ? ফেলে দিয়েছে ?

তা বটে ! যুক্তিটা অকাট্য !

আচ্ছা দিদি, রেলগাড়িটা কেন রাত্তিরে রাঁচী যায় ? দিনের বেলা যায় না কেন ?

তাই নিয়ম।

ভারী জ্ঞানী মনে হয় তখন দিদিকে দেখে।

কেন নিয়ম ?

তোকে নিয়ে আর পারা যায় না! রাঙামামার বাড়ি গিয়েও এরকম হাঁদা-হাঁদা কথা বলবি তো? নিয়ম মানেই নিয়ম! লোকে বেশ ঘুমোতে ঘুমোতে কত কত দূরে চলে যাবে!

ঘুমোতে ঘুমোতে?

ভারী উত্তেজিত হয় আমি, রাস্তা দেখবে না?

সেই তো। আমিও তাই ভাবি। আমি কিন্তু ঘুমোব না!

আমিও নয়। ইস! জন্মে এই প্রথম রেলগাড়ি চড়ব, ঘুমোব?

প্রতিজ্ঞার কাঠিন্য কখন কোন্ ফাঁকে ঝুরো-ঝুরো হয়ে ছড়িয়ে মিলিয়ে যায় দোলনার আবেশময় ছায়াচ্ছন্ন স্বপ্নের মধ্যে। দু বছরের, পাঁচ বছরের এবং ছ বছরের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। প্রথম 'কু-উ' ধ্বনিটাই যা সমস্ত চৈতন্যে রোমাঞ্চের ধাক্কা দিয়েছিল। তারপর—

তারপর—ভোরের আবহাওয়ায়—

কিচ কিচ ক্যাঁচ ক্যাঁচ ক্যাঁচ!

মন্থর গতিতে এগিয়ে চলেছে পুশপুশ-গাড়িখানা, তার চৌকো ঘরের মত দেহটার মধ্যে মুখ পর্যন্ত কম্বল চাপা দেওয়া, ঘুমে দলাপাকানো তিনটি মেয়ে, আর চাঙ্গা হয়ে বসে থাকা, র‍্যাপার মুড়ি দেওয়া তাদের মা, এবং সমবেতর গার্জেন কোট-ফোট পরা সতুদাকে ভরে নিয়ে। চলেছে রাঁচী শহরের দামী অঞ্চল ডেপুটিপাড়ার দিকে। কিন্তু গাড়ির মধ্যে তো অন্ধকার, কতটা বেলা হয়েছে কে জানে!

ব্যাপারটা তো ঠিক সুবিধের লাগছে না।

কম্বলের মধ্যে থেকে মুখ বার করে একজন বলে উঠল, রেলগাড়িটা এত আস্তে আস্তে যাচ্ছে কেন?

রেলগাড়ি!

অকাল-গম্ভীর সতুর গলা থেকেও হাসির ঝলক উঠল, এখনো তোরা রেলগাড়িতে আছিস? হা-হা!

রেলগাড়িতে নেই;

বুকটা ছাঁৎ করে উঠল আমির। অবশ্যই তার দিদিরও। নিশ্চয় একটা কিছু অঘটন ঘটে গেছে।

তড়বড়িয়ে উঠে বসল ওরা।

বড় দুজন যা করে ছোটটিও তো ঠিক তাই করবে। তবে সে বাড়তি একটা কিছু করল, বলে উঠল, রেলগাড়িটা কোথায় গেল?

সে? সে তো আকাশে উড়ে গেল।

অবাক কাণ্ড, মার কথায় ছেলেমানুষদের মত হাসি-হাসি সুর।

যাঃ! রেলগাড়ি বুঝি আকাশে উড়তে পারে?

তাহলে তোরাই আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছিলি। রেলগাড়ি রেলগাড়ি করে এত ছটফট করা হচ্ছিল মেয়েদের, গাড়ি ছাড়বামাত্রই তো ঘুমে কাদা। টেনে টেনে

নামাতে গিয়ে প্রাণ বেরিয়ে গেল। এ হচ্ছে পুশপুশ-গাড়ি! রাঁচীতে এই রকম গাড়ি চলে।

অ্যাঁ! আমরা রাঁচীতে এসে গেছি?

হতাশায় প্রায় হাহাকার করে ওঠি আমি।

রেলগাড়ির জানলা দিয়ে কিছু দেখা হল না। জানতে পারা গেল না অনেক অনেক দূর চলে যাচ্ছি!

কী লোকসান! কী লোকসান!

যেন অনেক অলৌকিক বস্তুতে ভরা একটি আশার পাত্র, হাতে এসেও অসতর্কে হাত থেকে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

ভীষণ কষ্ট লাগছে, কান্না পাচ্ছে। যে লোকসানটা নিজের দোষে ঘটল, তার পরিমাপ সহজ নয়। কেঁদে ফেলা যাবে না।

কাজেই ফ্রকের কোণ তুলে চোখ মুছতে মুছতে আস্তে আস্তে এগিয়ে চলা। একটানা কিঁচকিঁচ কিনকিন শব্দ শুনতে শুনতে।

কিন্তু ক্ষতির পরক্ষণেই যে ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা!

এ কি অভাবিত দৃশ্য!

মা! মা! ও কী? দ্যাখো দ্যাখো। আকাশের গায়ে সোনা দিয়ে অ্যাত্তো বড়ো করে 'ওঁ' লেখা!

মেয়ের এই উদ্দাম কণ্ঠের প্রশ্নে মাও বিহ্বল ভাবে তাকালেন। তারপর বললেন, আকাশের গায়ে নয় রে, ওই মন্দিরের চূড়োয়। বলেছিলাম না তোদের, এখানে মোরাবাদী পাহাড়ের ওপর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দাদা তপস্যা করবার জন্যে মন্দির তৈরী করে রেখেছেন। চূড়োয় ওঁ লেখা।

অতো অতো সোনা দিয়ে?

সোনার মতনই দেখাচ্ছে। খুব ঝকঝকে তো। রোদ পড়ে আরো ঝকঝক করছে। আসলে অবশ্য পেতলই।

কিন্তু পেতল বললে মানছে কে? ওই একাক্ষরী মন্ত্রটির লিখনের গায়ে সকালের রোদ পড়ে যে একটি স্বর্গীয় স্বর্ণময় সৌন্দর্য বিচ্ছুরিত হচ্ছে, তাকে পেতল বললেই হল?

না গো মা, সোনা। দেখছ না তোমার বালার চেয়েও চকচকে! সোনা দিয়েই লেখা!

মা হাসলেন, বললেন, তা সেও একরকম সত্যি। বড় হলে বুঝবি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দাদার নাম কী মা?

উত্তরের আগেই হেসে উঠলেন সতুদা।

বললেন, ছোটপিসি, পাস করে বেরিয়ে সব প্রথম তোমার মাথাটারই চিকিৎসা করব। এই ছোলা-মটরদের তুমি এখন থেকে রবিঠাকুর চেনাচ্ছ?

সতুদা ডাক্তারী পাস করেছেন আগেই, এখন নাকি আরো পড়ছেন পাগলদের ভাল করবার ডাক্তারী। এরপর রাঁচীর এই পাগলাগারদের ডাক্তার হবেন। কিন্তু

তিনি তাঁর ছোটপিসির মাথার চিকিৎসা করবেন কেন শুনি ?

সতুদাকে যেন কেমন লাগে। দেখলেই ভয়-ভয় করে। অপমানও হল। তাদের তিনটি বোনকে ছোলা-মটর বলার মানে ?

রাগ হয় না ?

মা অবশ্য রাগ করলেন না। শুধু গম্ভীর হয়ে বললেন, চেনাবার জিনিস ছোটবেলা থেকেই চেনাতে হয় রে সতু।

কেটে গেল সুর।

পুশপুশ-গাড়ি আস্তে আস্তে রাস্তা থেকে বাঁদিকে খোয়াইতে নামতে লাগল। রাস্তা থেকে অনেকটা নীচে খোয়াইমত জায়গায় বাড়ি রাঙামামার। সামনের বারান্দাটায় খাপরার চাল। কী রকম যেন ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা দেখতে। আর হাড় হিম করা ঠাণ্ডাও। বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়তে পারলে হয় !

রাঁচীর আকাশটা কী নীল ! রাঁচীর বাড়িগুলো কী খোলামেলা ! কোনো বাড়িটা কোনো বাড়ির সঙ্গে ঠেকানো নয়। দোতলা তেতলাই বা কই ? অনেকটা জায়গার মধ্যে একটা বাড়ি। ফুলগুলো কী সুন্দর ! আর নামটা কী অদ্ভুত ! 'পুটুস ফুল'। চারিদিকে একদম ফুলের জঙ্গল। ফ্রকের কোঁচড়ে কতই বা ধরবে ? একবার করে বারান্দায় ঢেলে রেখে আবার ছুটে গিয়ে কোঁচড় ভরতে লেগে যাওয়া। কী মজা ! কেউ কিছু বকছে না, বলছে না—ফুল নিচ্ছিস কেন রে ?

ছুটোছুটি করতে অনেকটা জায়গা পাওয়া কী আহ্লাদ !

কিন্তু আহ্লাদ জিনিসটা বড়ই ক্ষণস্থায়ী। স্রেফ আকাশের গায়ে ফুটে ওঠা রামধনুর মত।

বকুনি খেতে হল মায়ের কাছেই।

জামাটার কী দশা করেছিস ? এইমাত্র ফরসা জামা পরলি ! কোঁচড়ে এই বুনো ফুলের বোঝা ! হ্যাঁরে নীলা, এ দাগ উঠবে ?

নীলা তার আট বছরের মুখে একটি পাকাচোকা ব্যঙ্গহাস হেসে বলে, কি জানি বাবা ! আমরা তো আর কখনো জামায় করে 'পুটুস ফুল' আনতে যাই না। পুটুস ফুল আবার ফুল ! তোমার এই মেয়েটি এক কিম্ভূত ছোটপিসিমা ! বেজায় বোকা বাবা !

মেয়েটা অবাক হয়ে ভাবে, কেন 'ফুল' নয় ? সিল্কের মত হালকা শরীরগুলি নিয়ে, লাল হলদে বেগুনী নানা রঙে গাছ আলো করে এই সৌন্দর্যের সম্ভার ফুল বলে গণ্য হবে না ?

সৌন্দর্যেরও আভিজাত্য থাকা দরকার এ বোধ তো ছিল না মেয়েটার, তাই অবাক হয়ে তার মামাতো দিদিকেই কিম্ভূত ভাবে, বোকা ভাবে।

কিন্তু সে ভাবলে আর কী হবে ?

প্রতিক্ষণই তো এ সংসারে তার কিম্ভূতত্ব আবিষ্কৃত হচ্ছে।

তোর বোনটা এমন হাবা কেন রে মণি ? নিজের জামাজুতোকে বলে কিনা

'আমি'র জামা, 'আমি'র জুতো !—বললুম যে, এ মা, 'আমি'র আবার কী ? আমার বলতে পারিস না ? তা হি হি হি, বললো কি জানিস ?' কেন, আমার বলতে যাব কেন ? ভামিদি রামীদি কি তাদের জিনিসকে ভামার জামা, রামার জুতো বলে ? কী বোকা বাবা !

হেসে গড়িয়ে পড়ে।

আবার বলে, তোরাই বা ওকে আমি বলে ডাকিস কেন রে ?

মণি তাড়াতাড়ি বলে আহা, সে তো মজা করে। অবিশ্যি মজা করতে করতে ওটাই অব্যেস হয়ে গেছে। ছোটবেলায় ওকে কেউ 'তোমার নাম কি খুকু ?' জিগ্যেস করলে বলতো কিনা—'আমার নাম আমি'। তাই সবাই হেসে হেসে ওটাই বলে—

বিচ্ছিরি লাগে !

বাণীদি মুখ ঘোরায়, সেদিন নীতুর মার না ওর ওই 'আমি' শুনে কী হাসি কী হাসি ! কেন বাবা, ভাল একটা নাম নেই ওর ?

থাকবে না কেন ? মণি লজ্জিত মুখে বলে, আছে তো ! আমি মণিমালা ও দীপমালা।

ইস ! এমন সুন্দর নাম থাকতে । আর কি নীতুর মা আসবে ? আর তোর ওই ছোট বোনের ? ওর ?

ওর এখনো নামটা তত ঠিক হয়নি। মা একবার বলেন বনমালা, আবার বলেন ফুলমালা। তো ঠাকুমা বলেন, থাক বৌমা, আর মালায় কাজ নেই ! মালা গাঁথতে বসলে আরো সাতটা মেয়ে হবে।

হি হি হি, তোর ঠাকুমা তো বেশ মজার কথা বলে !

আমি একধারে বসে সরু সরু করে কাগজ কেটে পুতুলদের ভাত বানাচ্ছিল, খুব বিরক্ত হয়ে বলে উঠল, ঠাকুমা বলে ? বলে কী আবার ? বলেন বলতে পার না ?

ও বাবা ! ও মণি, তোর ওই বোনটা দেখতে তো দিব্যি ভালমানুষ, ভেতরে যে একেবারে ফোঁস-কেউটে ! তা যাকগে, ওকে তো বাবা দীপু বলে ডাকলেই হয়। তা না, আমি ! হি হি হি !

আমিকে অতঃপর এখানে দীপু বলেই ডাকা হয় এবং ছোট বোনকে ফুলমালা। অর্থাৎ ফুলি। মামারবাড়িতে এসে নামের প্রুফ কারেকশান হল এদের।

কিন্তু শুধুই কি নামের ? আরো কত কীই যে কারেকশান করবার আছে এই দীপু নামের মেয়েটার তা যেন উঠতে বসতে অনুভব করে এরা।

বেচারী আমি (মনে মনে যে নিজেকে আমিই বলে) ভেবে পায় না তাকে নিয়েই বা সকলের এত মাথাব্যথা কেন ? মাকেও বলে সবাই, দিদিকেও বলে, ও এরকম কেন গো ? ও এরকম কেন রে ?

মা অবশ্য তেমন গায়ে মাখেন না, বলেন, ওর কথা বাদ দে। ও ওই রকমই। অর্থাৎ মার কাছে ও বাদের খাতায়। কিন্তু দিদি আড়ালে রেগে রেগে বলে,

তুই এমন অর্ভাব্য কেন রে ? সবাই আমরা ঘরে বসে খেলছি, তুই একা একা রোদে ঘুরে বেড়াচ্ছিস !···আরও বলে, যেখানে যা বই পাস টেনে নিয়ে পড়তে বসিস কেন রে ? সবাই হাসে, ভাবে, পড়তে পারিস না, দেখিয়ে দেখিয়ে বিদ্যে ফলাচ্ছিস ! রাঙামামার ঘরে একটা ইয়া মোটকা ডিকসনারি না কি ছিল, তুই নাকি নিয়ে এসে পড়ছিলি ? সবাই হেসে কুটপাট। ডিকসনারি আবার পড়ে নাকি মানুষ ?

আমি খুব রেগে গিয়ে বলে, পড়ে না তো আছে কী করতে ? আর এ বাড়িতে পড়বার মতন বই আছে কিছু ? মা যে কটা এনেছিলেন, সে তো দশবার করে পড়া হয়ে গেছে।

তা যাক গে, সব সময় এত পড়ার দরকার কী তোর ? রাঙামামার খাবার সময় রাঙামামী হেসে হেসে বলছিলেন, ইস্কুলে না দিয়েই এই ! দিলে না জানি কী হত ! তোকে নিয়ে সবাইয়ের হাসির ধুম। তুই এতো উল্টোপাল্টা ! তোর জন্যে আমি লজ্জায় মরি !

দিদির লজ্জাজনিত মৃত্যুতে দুঃখিত হয় আমি, কিন্তু ভেবে পায় না যারা সর্বদা তাকে নিয়ে এত কথা বলে তারাই বা কী ? খুব সোজা-সোজা ? মোটেই উল্টো পাল্টা নয় ?

দিদিমা তো এ বাড়ির গিন্নী ? তো তিনি পুজোটুজো কিছু করেন না কেন ? শীতে জড়সড় হয়ে জামাটামা পরে, (হি হি, আমিদের ঠাকুমার গায়ে জামা ভাবা যায় ?) র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে সব সময় বিছানায় বসে থাকেন ! আবার আরো অবাক হয়, নীলাদি বাণীদিরা অনায়াসে বলে, বারণ করেছেন তো বারণ করেছেন, ঠাকুমার সব বারণ শুনতে গেলে চলে না !

শুনলে ভয় করে না ? আমির তো ভয়ে গায়ে কাঁটা দেয়। ঠাকুমাকে সবাই ভয় করবে, ঠাকুমার সব কথা মেনে চলবে—এটাই তো নিয়ম। ঠাকুমার বারণ মানা হবে না ? ও বাবা !

আমিদের সেই মাঠের ধারের বাড়িটার ছবি সামনে ফুটে ওঠে। ঠাকুমার ওপর যে কোনো কথা চলে, ঠাকুমার বারণ যে না শোনা যায়, একথা কেউ ভাবতেই পারে না। বাবা কাকারা জেঠামশাই পর্যন্ত তো ঠাকুমার ভয়ে তটস্থ। যা বলবেন তাই। বামনুদি না কতদিন হেসে হেসে বলেন, এ বাড়ির বাবুরা যা মাতৃভক্ত, মা যদি বলে, যা অমুকের ঘরে আগুন দিয়ে আয়, তো দিতে ছুটবে। শুধোবে না, 'মা, কেন আগুন দেব ? কী করেছে ওরা ?'···বামুনদি না এমন ইয়ে ! ঠাকুমা কেন অমন বিচ্ছিরী কথা বলতেই বা যাবেন ? কিন্তু সে যাক, দিদিমাও তো এ বাড়ির ঠাকুমা ? অথচ দিদিমাই যেন তাঁর ছেলেকে ভয় করেন। সব কথায় বলবেন, 'ওরে বাবা, বাবুলাল রাগ করবে। বাবুলাল এসব পছন্দ করে না।'

এগুলো সব উল্টোপাল্টা নয় ?

কিন্তু আমির যুক্তি কে শুনছে ?

তার থেকে একা একা বাইরে ঘুরে বেড়ানো অনেক সুখের। কী ভাল লাগে

এখানের নীল আকাশ, খোলা হাওয়া, শুকনো শুকনো মাঠের ধারে ধারে বুনো ফুলের ঝোপ, আর বাড়ির দরজা খুলে বেরিয়ে এসে চোখ তুলে তাকালেই মোরাবাদী পাহাড়ের ওপর সেই রোদে ঝকঝকে সোনায় লেখা একটি অক্ষর!

কলকাতায় এরকম হয় না!

ভাল লাগা, আর ভাল না লাগার এক আশ্চর্য সংমিশ্রণে দিন কাটে। আমিদের নাকি এখনো অনেকদিন এখানে থাকতে হবে। কেন কে জানে! ভেবে যেন তেমন ভাল লাগে না। মাও যেন কেমন হয়ে গেছেন, কেবল শুয়ে থাকেন।

মাঝে মাঝে এক-একটা ঘটনা ঘটে। তখন বেশ আলোড়ন ওঠে।

ক্লাসে ওঠার একজামিন দেওয়া শেষ করে দাদারা এলেন বেড়াতে। কটা দিন থাকলেন। কী ভাল লাগা, কী ভাল লাগা! মা আর তিন বোন ঘিরে ধরেছি দাদাদের। মা আহ্লাদে গলে গিয়ে বলছেন, তোরা একা আসতে পারলি? অ্যাঁ! তোরা একা আসতে পারলি? তোদের একা আসতে ছেড়ে দিলেন?

রাঙামামী নাকি মার থেকে দশ বছরের ছোট, তবু মুখ কুঁচকে হেসে বলেন, তোমার যেন সবতাতেই আদেখলেপনা ছোটঠাকুরঝি! বারো-তেরো বছরের ছেলে, তাও দুজনে। একা এসেছে তো গলে যাচ্ছ যেন! আমার সেজ ভাই তো দশ বছর বয়েসে একা ঘুরে গেছে। ওখানে কেউ তুলে দেবে, এখানে কেউ নাবিয়ে নেবে, এই তো ব্যাপার!

মা লজ্জা পেয়ে বলেন, তা নয়, ওদের ঠাকুমা তো এইসব রেলগাড়িটাড়িতে যাওয়া খুব ভালোবাসেন না। বারণ করেননি, তাই ভাবছি!

ওদের ঠাকুমা তো শুনি কিছুই ভালবাসেন না!

রাঙামামী তাঁর ফোটা গোলাপের মত মুখটিকে ফাটা ডালিমের মত লাল করে ফেলে মুচকি হেসে চলে যান, শেষ কথাটি বলে, তোমার শাশুড়ীটি বাড়ি-শুদ্ধ সকলকে বেশ একটি 'জুজুর ভয়' দেখিয়ে জব্দ করে রেখেছেন তো!

দিদিমার ছেলেরা নামী-দামী, তাই বেছে সুন্দরী সুন্দরী বৌ এনেছেন দিদিমা। কিন্তু সুন্দরীরা এমন বিচ্ছিরী করে মুচকি হাসি হাসে কেন? সতুদার মাও তো তাই!

তিনি তো থানকাপড় পরেন, শুধু সাদা ধবধবে একটা সেমিজ পরেন, কিন্তু ওইরকম হাসেন! একদম মানায় না। তবে সতুদার মা'র রংটা ঠিক রাঙামামীর মত লাল-টুকটুকে নয়। মা বলেন, পাকা সোনার মত।

আমি আর আমির দিদি বলে, মা যে কী বলেন। পাকা আমের মতন, কী পাকা পেয়ারার মতন বললে তবু মানে বোঝা যায়। সোনা আবার পাকা কী? গাছে ফলে থাকে বুঝি?

বেশ হৈ-হৈ করে গল্প হচ্ছিল, রাঙামামীর ওই লালটু হাসি হেসে চলে যাবার পর, যেন ভেস্তে গেল।

যাক, দাদারা তো এসেছেন।

ওঃ, কতদিন যেন দেখা হয়নি দাদাদের সঙ্গে।

দাদাদের হিসেবে নাকি মাত্র এক মাস, কিন্তু আমিদের মনে হচ্ছিল যেন এক বছর। দাদাদের গায়ে সেই কালীবাড়ির গা-ঘেঁষা বাড়িটার হাওয়া।

খুব ইচ্ছে হচ্ছে সে-বাড়ির সব কথা জিগ্যেস করে, কিন্তু দাদাদের যেন গা নেই। ওঁদের তাল বেড়াতে যাবার। দায়সারা উত্তর।

দাদা, বাড়িটা এখন কী রকম আছে?

কী রকম আবার? যেমন ছিল তেমনিই আছে!

ঠি-ক সেই রকম?

না তো কি উল্টে যাবে?

কালীবাড়িতে এখনো ঘণ্টা বাজে?

হাঁদার মত কথা বলছিস কেন? বাজবে না?

ঠাকুমা এখনো গঙ্গা নাইতে যান?

যাবেন না?

গঙ্গা নেয়ে ফেরার সময় সেই সব জিনিসপত্তর আনেন?

কেন আনবেন না? বাজারগুলো উঠে গেছে?

বাবা রোজ সকালে কুস্তি শিখতে যান?

কেন যাবেন না?

মুগুর ভাঁজেন?

ভাঁজবেন না? মুগুর দুটোয় মরচে পড়াবেন?

ছোটকাকার বন্ধুরা এসে বাইরের ঘরে বসেন?

তা কোথায় বসবেন? ফুটপাথে?

না, মানে রোজ আসেন?

আসবেন না?

কালীবাড়ি থেকে ঠাকুরমশাই জানলা দিয়ে ফুল ফেলেন?

ফেলবেন না? বাসি ফুলগুলো রেখে দেবেন?

বাবা সেজকাকা ন'কাকা রবিবারে রবিবারে মাছ ধরতে যান?

যাবেন না? রবিবারে বাড়ি বসে থাকবেন?

হাসি পিসিমা দুপুরে জেঠিমাদের সঙ্গে তাস খেলতে আসেন?

কেন আসবেন না?

প্রশ্নের বদলে উত্তর নয়, প্রতিপ্রশ্ন। তবে আর কথার ডালপালা গজাবে কোনখান থেকে। অথচ মনের মধ্যে লক্ষ প্রশ্নের ভিড়। যে বাড়িটা থেকে বেরিয়ে পড়ে রেলগাড়ি চড়ে চলে আসার জন্যে আকুলতার শেষ ছিল না, সেই বাড়িটা যেন এখন লক্ষ বাহু মেলে ডাক দিচ্ছে। ছবির মত ফুটে ফুটে উঠছে সব জায়গাগুলো।

রামীদি-ভাগিদিরা এখনো ছাতে জল-ড্যাঙাডোঙি খেলেন?

হঠাৎ দাদা বলে ওঠেন, কেন? তোরা বুঝি ভেবেছিলি তোরা চলে এসেছিস বলে কেউ আর কিছু করছে না? সব থেমে আছে?

এও প্রশ্নই। হেসে হেসেই বলা। তবু—

কেন কে জানে কথাটা শুনেই আমির চোখ উপচে জল এসে গেল। দাদাকে খুব নিষ্ঠুর মনে হল। দাদারা চলে গেলেন মোরাবাদী পাহাড়ে। রাঙামামা লোক সঙ্গে দিলেন। অত বড় বড় ছেলেরা হেঁটে যাবে না তো কি পুশপুশে চড়ে যাবে?

ওরা চলে গেলে তিন বোনে বসে নিজেরাই সেই মাঠের ধারের বাড়িটার স্মৃতিচারণ করে চলে।

ঠাকুমা হয়তো কালীঘাট থেকে কানে মাকড়ি, নাকে নথ পরানো 'গিন্নী পুতুল' এনেছেন।...হয়তো চাবি লাগানো ছোট্ট ছোট্ট ক্যাশ-বাক্স এনেছেন!... হয়তো একগাদা চাবি পরানো পরানো ক্ষুদে চাবির রিং এনেছেন। আর বাড়ির নাতনীদের ভাগ করে করে দিয়ে দিয়েছেন।...দেবেন না তো কী করবেন? যারা মজা করে রেলগাড়ি চড়ে মামারবাড়ি এসে বসে আছে, তাদের জন্যে তুলে রাখতে যাবেন নাকি? এত কী দায়?

মনশ্চক্ষে ভেসে ওঠে সেই লালচে লালচে ইঁটরঙা পোড়ামাটির ছোট ছোট হাঁড়ি কড়া থালা বাটি গেলাস কলসী, শিলনোড়া জাঁতা বেলুনচাকি।

কালীঘাটে গেলেই তো এগুলি আনা অবধারিত।

আর যেহেতু এইসব খেলনাপাতির অংশভাগ নাতিদের জন্যে রাখতে হয় না, তাই নিশ্চিন্ততা থাকে, পাবই নিশ্চয়। সেই কতবার দেখা চিরপরিচিত মাটির হাঁড়িকুঁড়ি, ক্যাশবাক্স, চাবির রিং গিন্নীপুতুল বেনেপুতুলরা এমন একটি স্বর্গীয় মহিমা নিয়ে দূরলোক থেকে হাতছানি দিতে থাকবে, একথা জানত না মণি আমিরা।

দাদারা সেখান থেকে আসার পরই ধরা পড়ল খবরটা।

রান্নাঘরের দেওয়ালে যে কুলুঙ্গিটার ভেতর একটা রেড়ির তেলের পিদ্দিম বসিয়ে বামুনদি রান্না করেন, সেই কুলুঙ্গিটার মধ্যে যে ভুষো কালিরা জমে ওঠে, তারা এখনো তেমনি জমছে কিনা সেটা জানবার কী এমন দরকার হচ্ছে কে জানে!

কিন্তু বিনা দরকারেও তো অনেক তুচ্ছ দৃশ্যও চোখের সামনে ভেসে উঠে উঠে ভাব দেখাচ্ছে যেন খুব দরকারী।

ছুটি ফুরিয়ে গেলো। দাদারা চলে গেলেন।

কিন্তু ওই চলে যাওয়াটার আগে তাদের বোনেরা যদি চুপিচুপি আবেদন জানায়, আমাদেরও নিয়ে চল না গো! তোমাদের সঙ্গে—

তাতে এত কী হাসির আছে?

ওমা শুনছো! এঁরা যাবেন আমাদের সঙ্গে। তোদের বুঝি ইস্কুল খুলে গেছে? নতুন বইখাতা কেনা হচ্ছে? পড়া তৈরী করতে হবে?

ঠাট্টা করেই বলা। কিন্তু ঠাট্টা যে কখনো কোনো সময় গাঁট্টা-তুল্য হয়ে ওঠে, সেকথা কে ভাবে?

'মাঈয়া শ্যামসুন্দরী।
মাঈয়া পাকাল কুন্দুরী।
মাঈয়াকো মু দেখো—
ঝলক বিজুরী!'

নিকষ কালো পাথরে কোঁদা এক মূর্তি, সর্বাঙ্গে উল্কির ছাপ, উল্কি দিয়ে অলংকারের সাধ মিটোনো।

কালোর ওপরে আরো কালো।

সেই নিকষ দুই হাত দিয়ে চেপে ধরেছে বছর-দুইয়ের একটা ফুটফুটে মেয়েকে। রোগা, চুল ঝুমরো। মেয়েটাকে সে তেল মাখাবে, চান করাবে। এটাই তার ডিউটি। কিন্তু মেয়েটা পরিত্রাহি চেঁচিয়ে বলছে, 'দাইয়ের কাছে নাইব না! দাইয়ের কাছে নাইব না! দাই কালো বিচ্ছিরী, ভূতের মতন!'

বেচারী 'কোল' রমণী, তার স্টকে যে পরম তোয়াজী গানটি ছিল, সেটিই প্রয়োগ করছে নিজস্ব বিশেষ একটি সুরে। কিন্তু—এ তোয়াজে ভবি ভুলছে না।

দিদিমা এসে দাঁড়ালেন।

দাইয়ের কাছে নাইবি না তো কার কাছে নাইবি? মা'র শরীর ভাল নয়!

মেয়েটা আপ্রাণ চেঁচিয়ে চলে, রাঙামামীর কাছে নাইব, রাঙামামী ফর্সা! লাল টুকটুকে।

চিলের মত চেঁচানি।

চেঁচাতে চেঁচাতে দম আটকানোর অবস্থা। তারও ফুটফুটে রং টকটকে হয়ে ওঠে।

এ বাড়ির ঠাকুমা, কোনো একটা 'জুজু'র ভয় দেখিয়ে সকলকে জব্দ করে রাখার কৌশল শেখেননি, নিজেই জুজু হয়ে থাকেন। তবু এই মরণ-বাঁচন কাণ্ডর পরিস্থিতিতে বলে ফেলতে বাধ্যই হলেন. আচ্ছা এক মেয়ে হয়েছে তো! অ রাঙাবৌমা, দাও মা একটু উদ্ধার করে। কেঁদে হত্যে হতে বসেছে।

অগত্যাই রাঙা বৌমাকেও বাধ্য হয়েই টুকটুকে মুখ টকটকে করে উদ্ধার করে দিতে হল বেয়াড়া ভাগ্নীকে।

আর তখন কিনা সেই বেহায়া মেয়েটা ঝিকঝিকে দুধেদাঁতের সারি বিকশিত করে 'রাঙামামী'র ভিজে হাতের ওপর একটু হাত বুলিয়ে বলল কিনা, তুমি কী সোন্দর! দাই বিচ্ছিরী!

হাতটাকে প্রায় মশামাছির মতই ঝেড়ে ফেলে প্রশংসিতা মহিলা বলে উঠলেন, তুমি আরো বিচ্ছিরী। সাতজন্মে এত বিচ্ছিরী মেয়ে দেখিনি আমি!

এবং তারপর স্বগতোক্তিতে জানিয়ে গেলেন, জন্মে কখনো তিনি এইসব নাওয়ানো-ফাওয়ানো করেননি। জানেনও না। তাঁর তিনটে ছেলেমেয়েই দাই টাইয়ের হাতেই মানুষ হয়েছে।

শুনে মরমে মরে গেল আমি আর মণি!

আর সংকল্প করে বসল, ওই বেয়াড়া বোনটাকে শাসন করে শায়েস্তা করতে হবে। তাতে আর কখনো এমন অসভ্যতা না করে!

করে বসল কাণ্ড!

যেই না দুপুর হয়েছে, বাড়ি সুনসান, মেয়েটাকে তার খেলার রাজ্য থেকে টেনে এনে 'তুই কেন তখন এমন করলি? কেন এমন করলি? আয় তোকে জেলখানায় পুরে দিয়ে আসি' বলে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে পুরে রেখে এল জেলখানায়।

কলকাতায় থাকতে 'জেলখানা' সম্পর্কে কোনো ধারণা ছিল না। 'চোর ডাকাতরা জেলে যায়' জানার পরিধি এইটুকু পর্যন্তই। রাঁচীতে এসে সঞ্চয় হয়েছে অভিজ্ঞতা। রাঙামামার কাছারীর চাপরাসীর হেফাজতে, দাদাদের সঙ্গে একটি 'দ্রষ্টব্য' হিসেবে দেখে আসা হয়েছে সেই গা-কাঁপানো শব্দ 'জেলখানা'।

বাইরে থেকে অবশ্য খুব একটা ভয়াবহ মনে হয়নি। বরং জেলখানার 'হাতা'র গাছগুলো বেশ নয়নমনোহর বলে মনে হয়েছিল।

গাছ থেকে ছোট্ট ছোট্ট কাঁচা আম পাড়িয়ে দিয়েছিল চাপরাসী।

তা দিক। জেলখানার সঙ্গে যে চাক্ষুষ পরিচয় ঘটিয়ে দিয়েছিল সেটাই আসল লাভ। গোবিন্দদাকে গিয়ে বলতে পারা যাবে তো। রাঁচীতে যেন শুধুই পাগলাগারদ আছে। জেলখানা নেই যেন? কত আম হয়, আবার একটা গাছে কী ছোট্ট ছোট্ট এঁচড়!

এটা তো একটা সঞ্চয়!

আরও একটা হল, বোকা বেয়াড়া ছোট্ট বোনটাকে শাস্তি দেবার একটা উপায় আবিষ্কার—'জেলখানা' কথাটা মাথায় এল তো দেখে এসেছে বলেই।

হাতের কাছে যখন জুটেও গেল একটা 'জেলখানা' ভাগ্যক্রমে। অথবা দুর্ভাগ্যক্রমে।

বাংলোর পিছনের দিকে একটুখানি এবড়োখেবড়ো নীচু জমি। সেখানে পড়ে আছে একটা মালিকহীন চাকাভাঙা পুশপুশ গাড়ি। এসে পর্যন্তই দেখছে এরা।

মাঝেমাঝেই গিয়ে তার মধ্যে ঢুকে বসে থাকে মণি আমি।

মণি বলে, চোখ বুজে ভাবি আয় আমরা যেন চলছি। চলেছি তো চলেছি!

দুপুরে মামাতো দিদিরা স্কুলে যায়। দাই আর পাঁড়ে কোথায় যেন চলে যায়। মামা তো কাছারীতেই। মা দিদিমার ঘরে ওই ছোট মেয়েটাকে নিয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমোন, দিদিমা রাঙামামীমাও তাই। এরাই দুটোতে সেই শীতের নির্জন দুপুরে এইসব বিদঘুটে খেলা আবিষ্কার করে খেলে। খেলাঘরও পাতায় কখনো ভাঙা পুশপুশ গাড়ির মধ্যে।

সেদিন সেই খেলাঘরটিই জেলখানায় পরিণত হলো।

ওকে তার মধ্যে পুরে রেখে এসে দুই দিদি চুপচাপ বাড়ি এসে বসে থাকে ওর মধ্যে যতই চেঁচাক, শোনা যাবে না তো আর।

মা জিজ্ঞাসা করলে বলবে, জানি না। ব্যাস্!

রেখে এসে প্রতি মুহূর্তেই অবশ্য প্রতীক্ষা করতে থাকে সেই প্রশ্নের। কিন্তু কোথায় কী?

মা'র কাছ থেকে কোনো প্রশ্ন নেই।

ক্রমশঃ কেমন একটা ভয় করতে থাকে। বন্ধ থেকে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে মরে যায়নি তো ফুলি? কাঁদছে না কেন? ধাক্কা মারছে না কেন? গোড়ায় যা করছিল। একটু একটু এগিয়ে এগিয়ে দেখে এসেছে, কান্নাটান্না শুনতে পায়নি। আর যেতে সাহস হচ্ছে না।

অতঃপর নিজেদেরই বুক উথলে কান্না।

যেন একটা প্রাণের প্রিয়জনের মৃতদেহ কোলে নিয়ে কান্না। অথচ চাপা কান্না।

হৈ-চৈ উঠল বিকেলে।

নীলা বাণী স্কুল থেকে ফেরার পর জলখাবার খেতে দেবার সময়।

এই কাজটি দিদিমা করেন।

দিদিমাই খোঁজ করলেন, সেটি কই? সেই সুন্দরীটি?

ওমা তাকে তো অনেকক্ষণ দেখিনি।

ঘরে ঘুমোচ্ছে নাকি? অ সরস্বতী, তোর ছোট মেয়ে তোর কাছে ঘুমোয়নি? তাই বা বলব কি! তুই কি আর আজ ঘুমিয়েছিস?

ও মা সে কী!

এই মণি, তোদের ছোট বোন কোথায়?

হঠাৎ ডুকরে উঠল আনি, পুশপুশ গাড়ির মধ্যে মরে গিয়ে পড়ে আছে।

ওমা, এ আবার কী কথার ছিরি?

ছোট্ ছোট্! কোথায় পুশপুশ গাড়ি! অ সরস্বতী, তুই আবার কোথায় যাচ্ছিস? তুই বোস। সবাই তো যাচ্ছে।

অবশ্য গেল সকলেই। দিদিমার সরস্বতীও।

তবে সেই নিকষ কালো উল্কিপরা দুই হাতে ফুটফুটে মেয়েটাকে সাপটে ধরে বাড়িতে নিয়ে এসে ফেলল। সকালের সেই ধিক্কৃতা রমণীটিই।

কিন্তু সহজে কী?

ঘণ্টা তিন-চার জব্দ হয়ে থেকে, হয়তো বা একটু ঘুমিয়ে পড়েও, জেলখানা থেকে ছাড়া পাওয়া মাত্রই, আবার তার সামনেই সেই ভয়ংকরী!

প্রথমটা ভূত দেখার মত শিউরে উঠেই, আবার সেই পরিত্রাহি চীৎকার, ও কেন আমার গায়ে হাত দিচ্ছে। ও কেন আমার গায়ে হাত দিচ্ছে। আমার গা কালো হয়ে যাবে।

আবার এই অসভ্যতা, আর লোকহাসানো।

'ক্ষীণজীবী' মত বলে তার এই দু'বছর বয়েসের মধ্যে মা'র কাছে যে কখনো

একটু ধমকও খায়নি, খেল সে একটা চড়।

আর গোটাকতক 'ঠাশ ঠাশ' আমি আর মণি।

কিন্তু তাতে কি? কিছু এসে গেল না।

ফুলি যে পুশপুশ গাড়ির মধ্যে মরে পড়ে থাকেনি, এই কৃতজ্ঞতায় তার দুই দিদি মার খেয়ে মরে যেতেও রাজী ছিল। 'মৃত্যু' কখনো দেখেনি ওরা, তবু মৃত্যুলোকের অনুভূতি পেয়ে গেল। কী আশ্চর্য এই অনুভূতির জগৎ!

জীবনে আর কখনো ওরা ফুলিকে শাসন করবে না। জীবনে কখনো বকবে না। যা চাইবে ফুলি, তাই দেবে ওরা।

খুবই খিদে পেয়েছিল।

তবু দিদিমার সাজিয়ে দেওয়া ছোট ছোট কাঁসার রেকাবিতে লুচি আলুর তরকারি বেগুনভাজা আর চিনি খেতেই পারল না। অথচ অন্য অন্য দিন নীলাদি বাণীদি ইস্কুল থেকে আসার আশায় মিনিট গোনে। ওরা এলে তবেই তো দিদিমা কর্মক্ষেত্রে নামবেন।

কিন্তু আজ আর খেতেই পারল না।

বেশ কিছুক্ষণের জন্যে যে 'মৃত্যুশোক' ভোগ করতে হয়েছে, তার জন্যে বুক চেপে ধরেছিল, এখন হঠাৎ সেটা খুলে যাওয়ায় বুকের মধ্যে দারুণ ওঠাপড়া!

বেশী আহ্লাদেও এমন হয়?

তা ঘটনা যাই হোক রটনা এই হলো, দোষ করে একটু চড় খেয়ে বিটকেল মেয়ে দুটো রাগ করে জলখাবার খেলো না।

পৃথিবীর চোখ তো এই রকমই।

সেই রাত্রে আর একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটল!

অথচ অ'প্রত্যাশিত' হবার কথা নয়। এ ঘটনা তো তারা জ্ঞানের আগে থেকেই দেখছে। শুধু এখানে আসায় পরিস্থিতিটা বিভ্রান্ত করেছে। দিদিমা অনবরতই বলেছেন, মাকে ব্যস্ত করিসনি, মা'র শরীর খারাপ।

কিন্তু তাতে অতো ভাবনার কী আছে? মা যখন ভাতটাত সবই খাচ্ছেন

রাত্রে ঘুমের মধ্যে এবং কম্বলের মধ্যে থেকে মনে হচ্ছিল কারা যেন চলছে ফিরছে, আলো জ্বালছে, কথা বলছে।

কে আর উঠে দেখতে গেছে?

সকাল বেলা দিদিমা ওঠালেন। বললেন, এই ওঠ্, একটা নতুন জিনিস দেখবি আয়।

নতুন জিনিস! কী সেই জিনিস!

রাত্তিরে তোদের একটি ভাই হয়েছে। দ্যাখ কী সুন্দর!

একটু বেলা হতে পাড়া থেকে কারা সব যেন এল। টুকটাক কথা!

তিন মেয়ের পর ছেলে! সইবার জন্যে নাম রাখতে হয় 'স দিয়ে। শৈল রাখুন।

না না, অষ্টম গর্ভের ছেলে, কেষ্ট ঠাকুরের নামে নাম দেবেন খুড়িমা।

কী অর্থ এই সব কথার ?

যেন একটা পাতলা রহস্যের আবরণে ঢাকা।

মনে হচ্ছে, বুঝি বুঝে ফেললাম, কিন্তু বোধগম্য হচ্ছে না।

তবে মাকে যে এখন বেশ কিছুদিন ওই ছোট্ট ঘরটার মধ্যে বাস করতে হবে সটা অবোধ্য নয়।

দেখা গেল 'দাই' ঠিক তারই মত একটি উল্কিতে সর্বাঙ্গ ঢাকা মহিলাকে এনে া'র ঘরে চালান করে দিল। তিনিই এখন থেকে মা'র গার্জেন।

সেই মহিলা আবার মা'র ঘরের দরজার দু'পাশে দুটো গোবরের পুতুল ানিয়ে বসিয়ে দিলেন এবং চারটে বড় বড় কড়ি নিয়ে এমন সংঘাতিক চোখ ানিয়ে দিলেন তাদের যে, মনে হল সত্যিকারের ড্যাবডেবে দুজোড়া চোখ। যেন ুকের ভেতরটা পর্যন্ত দেখছে!

আর ভাল লাগছে না।

কালীবাড়ির পাশের সেই জানলার নীচের বাসি ফুলপাতার বুনো বুনো গন্ধ াটুশ ফুলের বুনো গন্ধের মাদকতাকে ছাপিয়ে যাচ্ছে। প্রতিটি লোকের কথা ারাক্ষণ মনে পড়ছে। এমন কি বামুনদির জন্যেও মন-কেমন করছে।

মণিদির অভিব্যক্তি, যাই বলিস রে—এই পাঁড়ের থেকে বামুনদি অনেক াল। তবু তো বাংলা কথা বোঝেন।

আর পাঁড়ে ?

কী যে বলে হিঁয়া হুঁয়া করে! ডাল চাইলে ভাত দেয়।

হঠাৎ একদিন আর এক ঘটনা।

ভয়ঙ্কর ঘটনাই।

সন্ধ্যেরাত্রে আঁতুড়ঘরের মধ্যে ইয়া মোটা আর ইয়া লম্বা একটা সাপ! দয়ালধারে শুয়ে আছে।

চেঁচামেচি হৈ-চৈ।

মা চৌকির ওপর ছেলে কোলে নিয়ে ঠকঠক করে কাঁপছেন।

দাই একটা মাটির সরায় খানিকটা আগুন জেবলে ধরে দিল সাপটার ামনে।

পাঁড়ে একটা লাঠি নিয়ে হম্বিতম্বি করতে থাকে, কিন্তু ঢুকবে কী করে ? াঁতুড়ঘর না ?

একমাত্র ভরসা যদি যে নর্দমা দিয়ে ঢুকে পড়েছিল, সেইটা দিয়েই যদি বরিয়ে যায়। কিন্তু নড়ার লক্ষণ নেই যে!

সাপ খেলানেওলার সাপ দেখা আছে, কিন্তু ঘরের মধ্যে ?

কী হবে ? কী হবে ?

রাঙামামা নাকি লোক ডাকতে পাঠিয়েছেন। এসে মারবে সাপটাকে। এরই ধ্যে এক আশ্চর্য সমাধান।

পুরনো দাইয়ের একটা ভাই না কে, 'সাপ' শুনে ছুটে এসেছে একঝুড়ি দাঁত

বার করে।

কুথাকে ? কুথাকে ?

তা ওর আর আঁতুড়ঘরে ঢুকতে কী ?

ও তো আর রান্নাঘরে গিয়ে রান্না করবে না।

কিন্তু—

কিন্তু রান্না করবে। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, ওই সাপটাকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে রান্না করে খাবে। সপরিবারের আজ একটি মহাভোজের যোগাড়।

'আমি' ভেবেছিল ঠাট্টা।

লোকটা যখন ঘরে ঢুকেই ফট করে গামছা চাপা দিয়ে সাপটার মুন্ডুটা বাগিয়ে ধরে দাঁতের পাটি বার করে বলে উঠেছিল কথাটা, আর রাঙামামা বলেছিলেন, খাবি ? তাই এতো আহ্লাদ ! কী দিয়ে রাঁধবি ?

তখন কে আবার বিশ্বাস করতে যাবে ব্যাপারটা ঠাট্টা নয় 'সত্যি !

দিদিমা বললেন, ভাল করে দেখেছিস ? বিষ সাপ নয় ?

ওর দাইদিদি অভয় দিল, ও চেনে। সব সাপ চেনে। বিষ ছাড়া এই মোটকা সাপ 'কোল'দের নাকি বেজায় প্রিয়। আর তারো বেশী প্রিয় 'চুহা'। অর্থাৎ ধাড়ি ধাড়ি ইঁদুর। ছুঁচো পেলেও খুশির বান।

সাপ খায় ! ইঁদুর খায় ! ছুঁচো খায় ! ওরে বাবারে, আমি কী করব রে—

ডুকরে কেঁদে উঠল, সব ছোট্ট ফুলি নয়, তিনজনের মাঝখানের মেয়েটা !

নামের প্রুফ্ কারেক্শান করার পর যতই তাকে 'দীপু দীপু' করে ডাকা হোক, নিজেকে সে 'আমি' ছাড়া আর কোনো নামের খোলশের মধ্যে ভরে ফেলতে পেরে উঠছে না।

ওর কেঁদে ওঠা দেখে বাড়িসুদ্ধু সবাই হেসেই অস্থির। দিদিমা থেকে দাই পর্যন্ত।

তুই আবার কী করবি ? তোকে খেতে বলেছে নাকি ? ওরা অমন খায়।

এ সান্ত্বনায় কিছু হয় না। প্রতিবাদ উদ্দণ্ড !

কেন খাবে ? কেন খাবে ? মানুষ সাপ খাবে ? ইঁদুর খাবে ? ছুঁচো খাবে ? আমার মাথায় কষ্ট হচ্ছে, বুকে কষ্ট হচ্ছে।

কালো পাথরে গড়া যে লোকটা চিরকুট্টি গামছাখানা দিয়ে সাপটার মুখ-মাথাটা বেঁধে ফেলে সাপটাকে বিঁড়ের মতন পাকিয়ে লাঠির আগায় ঝুলিয়ে নিয়ে পা বাড়িয়েছিল, সে বেচারী 'খোঁকীটার' কান্নার কারণটি অনুধাবন করতে না পেরে বোধ হয় ভাবল, জিনিসটা নিয়ে যাওয়ার জন্যেই ওর এই হাত্ পা ছোঁড়া। তাই নিজস্ব ভাষায় যা প্রবোধ দিয়ে গেল, বোধ হয় তার সারার্থ, সাপটা বাড়িতে থাকলে কামড়ে দেবে, তুমি মইরে যাবে।

লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে গেল।

এদিকে মেয়েটাও তখন হাত-পা ছুঁড়ে ক্লান্ত হয়ে লম্বা : আমার মাথায় কষ্ট হচ্ছে, বুকে কষ্ট হচ্ছে। ও কেন সাপ খাবে ? আমি আর এখানে থাকব না। আমি চলে যাব।

রাঙামামা মা'র পিঠোপিঠি দাদা হলেও ছোট বোনের থেকে অনেক ভার-ভারীক্কি! পুরো একটা জেলার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা বলে কথা! বললেন, কী রে 'সুরো', তোর এই মেয়ে না বঙ্কিমবাবু পড়ে? হেমচন্দর পড়ে? রবিঠাকুরের পদ্য আওড়ায়?

মা কী একটা বললেন নিজ বন্দীশালা থেকে, তাঁর রাঙাদা বললেন, মাথায় ছিট আছে।

এবং একটু পরে বিরক্ত হয়ে বলে উঠলেন, আর এখানে থাকতে হবেও না। তোমাদের বাবার চিঠি এসেছে। লিখেছে শীগগির নিয়ে যাবে।

বাবা চিঠি লিখেছেন শীগগির নিয়ে যাবেন।

এ যেন আমাদের কাছে একটা স্বর্গীয় আনন্দের বার্তা। সেই 'শীগগিরটা' কত শীগগির তাই নিয়েই তিন বোনের জল্পনা-কল্পনা। হ্যাঁ, এ আলোচনায় ছোট্ট ফুলিও শরিক।

কিন্তু এখানে কী তারা কষ্টে আছে?

তা অবশ্যই নয়। খাওয়া শোওয়া খেলা বেড়ানো আরাম আয়েস। সবই তো কলকাতার থেকে ভালো। তবু কেন এখান থেকে চলে যাবার জন্য দিন গোনা?

একাদিক্রমে, অনেকদিন থেকে এই ছোট্ট মেয়েগুলোও একটা 'বোধে'র জগতে ঢুকে গেছে। বুঝে ফেলেছে, এখানে তাদের অধিকারের মাটি নেই। বাণীদি নীলাদি দেবেশ আর তারা ঠিক এক নয়।

কলকাতার বাড়িতে এই দুঃখজনক অনুভূতি নেই। সব তুতো দিদি দাদা ছোটমোটদের সঙ্গে তাদের অধিকারের কোনো তারতম্য নেই। অবশ্য 'ছেলে' আর 'মেয়ে'র মধ্যে যে আকাশপাতাল তফাৎ, সেটা আলাদা। সেটা তো ভগবানের নিয়ম। এখানের ভেদটা সূক্ষ্ম অদৃশ্য, তবু অনুভবের মধ্যে ধরা পড়ে।

নিরালা জায়গার অভাব নেই।

সেই পুশপুশ গাড়িটাই তো আছে।

সেখানে বসেই কলকাতার বাড়ির স্মৃতিচারণ আর দিন গোনা! এবং তারই ফাঁকে ফাঁকে মানবচরিত্র সম্পর্কে নিজ নিজ অভিজ্ঞতার ফসল বিনিময়।

মাথায় ছিটওলা হাঁদা গঙ্গারামটার মাথাতেই যেন বেশী খেলে। অবশ্য মণির মতে কথাগুলো উদ্ভুট্টি।

কিন্তু উদ্ভুটেটা অনায়াসেই বলে বসে, দিদিমার থেকে ঠাকুমা অনেক উঁচু, বুঝলে?

উঁচু? উঁচু কি রে?

মণির উক্তি, দু'জনেই তো গিন্নী!

তা হলেই বা কি, ঠাকুমা যা ইচ্ছে করতে পারেন, যাকে খুশি বকতে পারেন,

যাকে যা দিতে ইচ্ছে দিতে পারেন। কারুর সাধ্যি আছে কিছু বলার? সব্বাই ভয়ে কাঁটা। আর দিদিমা? হি হি। নিজেই ভয়ে কাঁটা। সব কথায় বলবেন, দেখি বাবুলাল কী বলে। দেখি রাঙাবৌমা কী বলে। দাইকে একটা পুরনো কম্বল দিলেন, তাও রাঙামামীকে জিগ্যেস করে তবে। এমন কি সতুদাকেও ভয় করেন। বলেন, না বাবা, সতু রাগ করবে। ধ্যেৎ! বাড়ির গিন্নী বুঝি লোককে ভয় করে আর জিগ্যেস করে কাজ করে?

সতি্য রে—

মণি বলে, যা বলেছিস। আমিও তাই ভাবি।

এমন অনেক কিছুই ভাবে ওরা। এবং তার সঙ্গে ভাবে বাবা এত দেরি করছেন কেন?

তবে আবার মণির কাছে বকুনিও কম খায় না দীপু বা 'আমি'।

সাপ নিয়ে তুই সেদিন অমন বিচ্ছিরী কাণ্ড করলি কেন? লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছিল আমার। সবাই তোকে 'পাগল' বলছিল!

অহরহই দীপু তার পিঠোপিঠি দিদির মাথা কাটা যাওয়ার কারণ হয়। কিন্তু তার তাতে লজ্জাটজ্জার বালাই নেই।

বলুক গে। 'পাগল' বললেই আমি পাগল হয়ে গেলাম নাকি? আর যারা সাপ খায়, ইঁদুর ছুঁচো খায়? তাদের তো পাগল বলা হলো না? মানুষ একটা উঁচু জাতি না? ওই সব খারাপ জিনিস খাবে? ভগবান কী বলবেন?

আহা ওরা তো কোল সাঁওতাল।

'আমি' রেগে বলে, কোল সাঁওতাল মানুষ নয়?

'ভগবান কী বলবেন?' এই চিন্তাধারাটি বোধ হয় মা ওদের জ্ঞান হবার সময় থেকেই ওদের রক্তধারায় ঢুকিয়ে দিয়ে বসে আছেন। অর্থাৎ ওদের 'বারোটা' বাজিয়ে দিয়েছেন। হঠাৎ কারুর সামনে বলে ফেললেই তো তারা হেসে গড়ায়।

হি হি। ভগবান বুঝি তোর সঙ্গে কথা বলেন? কী বলেন রে? কী রে কী খবর? কেমন আছিস?

দেবেশটাই তো সেদিন বলল একথা। দীপুর থেকে যে একছিটে মাত্র বড়।

ভগবান কথা বলেন, এমন প্রমাণ দাখিল করতে না পারলেও তারা তো ভগবানের সঙ্গে কথা বলে। ভগবান, বাবা যেন তাড়াতাড়ি আসেন। আমরা যেন তাড়াতাড়ি আমাদের সেই বাড়িটায় চলে যেতে পারি।

কিন্তু এমন আকুল আবেদনেও কি আর সেই বাড়িটায় ফিরে যেতে পারল তারা?

নাঃ, সে বাড়িতে আর ফিরে যাওয়া হয়নি এই মেয়ে তিনটের যারা 'মাঠের ধারের বাড়ি' 'মন্দিরের ধারের বাড়ি' বলে হেদিয়ে মরছিল।

বাবা এলেন, সবাইকে নিয়ে-টিয়ে ট্রেনে চাপলেন, হাওড়া ইস্টিশানে এসে ঘোড়ারগাড়ি ভাড়া করলেন, ওদের সকলকে চাপিয়ে দিয়ে মালপত্র গাড়ির ছাদে তুলে দিয়ে, নিজেও গাড়ির ছাদে কচুয়ানের পাশে উঠে বসলেন।

অবাক কাণ্ড ! গাড়িতে এতো জায়গা, বাবার গাড়ির মাথায় উঠে বসবার কী দরকার ছিল ?

রাঁচীতে কালকে বোঝা যায়নি, বাবা হাসছেন না, কথা বলছেন না। দিদিমার সঙ্গে তো বেশ অনেক কথাই হল। অবশ্য কী কথা হল, তা আমি'রা বুঝতে পারেনি। দিদিমার গলা তো আর ঠাকুমার মত নয় যে একতলা দোতলা সারা বাড়ির সবগুলো লোক কথার বিষয়বস্তু জেনে যাবে।

মণিদি বলেন, দিদিমার কথা শুনলে মনে হয় যেন হোমোপাথির শিশি থেকে ওষুধ ঢালছেন।

দিদিমার পর খেতে বসে রাঙামামার সঙ্গেও কথাটথা বললেন বাবা, সেও বোঝার অসাধ্য। ইংরিজি করে কথা বলাবলি হল ওঁদের। বেশ বুঝলাম আর কেউ যাতে বুঝতে না পারে, তাই সকলের অবোধগম্য ভাষা ব্যবহার।

রাঙামামী ?

ধ্যেৎ ! ম্যাজিস্ট্রেট-গিন্নী বলে কি ইংরিজি বুঝবেন নাকি ?

একটা মাত্র বাংলা কথা শুনলাম রাঙামামার মুখে, 'যাক, তাহলে সুমতি হ'ল।'

কী জানি কার সুমতি !

খাওয়ার পর বাবা আমাদের নতুন ভাইটিকে একটু আদরও করলেন। (কোলে অবশ্য নিলেন না। কাঁথায় শোওয়া কচি ছেলেমেয়েকে আবার ব্যাটা-ছেলেয় কোলে নেবে কী ? হাঁটতে শিখলে তখন বোঝা যাবে।) তারপর রাঙা-মামার বৈঠকখানা ঘরে শুতে চলে গেলেন। দুজনের জন্যে দুটো নেওয়ারের খাটে বিছানা পাতা ছিল।

আমরা ওখানে গিয়ে পর্যন্ত রাঙামামাকে তো বৈঠকখানা ঘরেই শুতে হতো।

পরদিনই তো চলে এলাম আমরা।

মা'র সঙ্গে তো কথা কইতে দেখলাম না।

মা'র মুখ থমথমে।

তা সে তো হবেই। বাপেরবাড়ি থেকে শ্বশুরবাড়ি আসবার সময় কে আবার আহ্লাদে ভাসে ? তবে বাবার মুখও থমথমে !

কিন্তু বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুরবাড়িতে এলেন নাকি মা ? এলেন তো একদম নিজের বাড়িতে। কোন্ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এমন একটা অঘটন ঘটনা ঘটা সম্ভব হলো ?

ঘোড়ারগাড়িটা যে রাস্তা দিয়ে আসতে লাগল, সেটা যে সেই কালীবাড়ির পাশের রাস্তা নয়, সেটা বুঝতে পারা যাচ্ছে ; শুধু বুঝতে পারা যাচ্ছে না, তা'হলে কেন্ রাস্তায় যাচ্ছে ?

অবশেষে একটা চওড়া রাস্তার ওপর চমৎকার একখানা একতলা বাড়ির সামনে গাড়িটা থামল।

বড় রাস্তার ওপর বড় বড় জানলা-দরজা বসানো বাড়িটার সামনে লাল টুকটুকে

চওড়া রক। দু'ভাগে ভাগ করা। মাঝখানে সদর দরজা। উঁচু দরজার গায়ে লোহার গুলি বসানো।

দাদারা দাঁড়িয়েছিলেন সেই খোলা দরজাটার সামনে। আমাদের নামার কালে যতটা পারলেন মালপত্র নামিয়ে নিয়ে নিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে রেখে আসতে লাগলেন। ঘোড়ারগাড়িটা চলে গেল। আমরাও মালপত্রের মত ঢুকে এলাম বাড়িটার মধ্যে।

এখন প্রশ্ন, কাদের বাড়ি এটা ?

আমরা কেন এ বাড়িতে এসে ঢুকলাম ? বাড়ির মধ্যে দেখছি আমাদের সেই চিরপরিচিত জিনিসগুলো সাজানো-গোছানো রয়েছে। সেই আলনা আলমারি বাক্স প্যাঁটরা খাট। দাদাদের পড়ার টেবিল আর চেয়ার দুটো।

আগে না দেখা একটা জিনিস দেখলাম।

মাঝখানের একটা ঘরের মাঝখানে একটা বেতের দোলনা টাঙানো। মা আমাদের নতুন ভাইকে তার মধ্যে শুইয়ে কলঘরে চলে গেলেন।

এতক্ষণে দাদাদের চুপি চুপি জিগ্যেস করলাম, এটা কাদের বাড়ি ?

ছোড়দা বললেন, কাদের আবার—আমাদেরই।

আমাদের ? আমরা এই বাড়িতে থাকব ?

ছোড়দা নিজের স্বভাবগত ভঙ্গীতে বললেন, থাকতে ইচ্ছে না হলে ফুটপাথে থাকতে পারিস।

আহা ! ফুটপাথে থাকতে যাব ! কিন্তু নিজেদের বাড়িতে না গিয়ে আমরা এখানে এলাম কেন ?

ছোড়দা বললেন, ওখানে আর কুলোচ্ছিল ? বাড়িটা কি রবারের ?

তার মানে দাদারা এই বাড়িবদলটা মেনে নিয়েছেন। দাদার কথা অবশ্য ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। দাদার মুখ গম্ভীর।

হঠাৎ 'মণি' নামের মেয়েটা রেগে বলে উঠল, আর ঠাকুমাকে না বলেটলে অন্য বাড়িতে চলে আসা খুব ভাল হল ? ঠাকুমা কী বলবেন ?

বলবার জন্যে এখানে বসে আছেন নাকি ? তিন দিন আগে থেকেই তো মনের দুঃখে তারকেশ্বরে গিয়ে বসে আছেন।

তারকেশ্বরে গিয়ে দু-চারদিন বসে থাকা অবশ্য ঠাকুমার পক্ষে নতুন কিছু না। পাণ্ডার বাড়ি রয়েছে না ? কত ভালবাসেন তিনি ঠাকুমাকে, 'মা' বলে ডাকেন।

কিন্তু সে যাওয়া তো আলাদা। পুজোটুজো দিতে। তাই বলে মনের দুঃখে ?

কিন্তু বাবা ঠাকুমাকে এতো ভালবাসেন, আর বাবা ঠাকুমার এতোখানি মনের দুঃখের কারণ হলেন ? বাবার ভয় করল না ? এইসব বাড়িটাড়ি ভাড়া করা তো আর বাবা ভিন্ন আর কেউ করে দিয়ে যায়নি।

বোঝা যাচ্ছে এইসব সাজিয়েটাজিয়ে রেখে তবে বাবা রাঁচী গিয়েছিলেন।

কিন্তু এখন বাবা কোথায় গেলেন ?

কোথায় আবার ? মাছ ধরতে। আজ রবিবার না ? তাও তো বটে, না হলে দাদারা স্কুলে যাননি কেন ?

একটা অজানা অচেনা পাড়ায়, হঠাৎ এসে পড়া প্রথম ক্ষণেই, বারো-চোদ্দ বছরের দুটো ছেলের হেফাজতে সদ্য সংসারটাকে রেখে দিয়ে শখের ব্যাপারেও চলে যাওয়াটাকে কিছুই অস্বাভাবিক মনে হল না কারুরই। সে আমলে ও বয়সের ছেলেরা বাড়ির দায়িত্ব নেবে, এটা কিছু আশ্চর্য ব্যাপার নয়। হলেও সে সংসারের সদস্য হচ্ছে গোটা চারেক চার রকম বয়সের শিশু। আর হেড্ মহিলাটির বয়স ত্রিশ ছাড়ায়নি।

কী আর করা ! দুর্গ থেকে বেরিয়ে মাঠে নামলে কে আবার 'দেখভাল্' করতে আসবে ?

আর কক্ষনো ও বাড়িতে যাব না আমরা ?

ফুলি হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠল, এতো সুন্দর ভাইটাকে দেখানো হবে না ঠাকুমাকে ?

সত্যিই বটে। এটা একটা মস্ত লোকসান। গৌরবের জিনিসটা ঠাকুমাকে দেখানো হল না। 'ছেলে' এতো ভালবাসেন ঠাকুমা।

নাইবার ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন মা। ভিজে শাড়ি পরে, ভিজে চুলে গামছা দিয়ে ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন, কান্নাকাটি কিসের ?

ও ফুলি বোকাটা কাঁদছে. ঠাকুমাকে নতুন ভাই দেখানো হল না বলে।

মা বললেন, আমরা কি বিলেতে চলে এসেছি, তাই দেখানো হল না বলে কান্না ? কাছেই তো, নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে আনা যায় না ? মাত্র তো তিন আনা গাড়িভাড়া !

হঠাৎ দাদা বলে উঠলেন. ঠাকুমার দেখতে দায় পড়েছে।

মা তাঁর বড় ছেলের মুখের দিকে একটু তাকিয়ে বললেন, তাহলে আর উপায় কী ? গোয়ালের গরুর মত একখানা ঘরের মধ্যে আট-দশজন লোক, সেটা যদি সবাই সহ্য করতে না পারে !

তারপর একটু আস্তে বললেন, নাইবার ঘরের মাপ দেখেছিস ? কলের জলের তোড় দেখেছিস ? নেয়ে যেন মনে হল নবজন্ম হলো।

ছোড়দা বলে উঠল, জলের তোড় আর হবে না ? কাছেই টালার ট্যাংক !

বাবা একগাদা খাবার কিনে রেখে গিয়েছিলেন। কচুরি আলুরদম রসগোল্লা জিলিপি। বলে গিয়েছিলেন নাকি, এবেলা আর কী করে রান্না হবে ? এই খেয়েই থাকতে হবে তোদের !

কথাটা শুনে বেশ স্বর্গীয় বলেই মনে হল 'আমি'র।

কিন্তু কী ভাবছি, বাবার ?

এমা ! বাবা আবার কবে মাছধরার দিন বাড়িতে ভাত খান ? যারা নিজেদের পুকুরে মাছ ধরবার জন্যে নেমন্তন্ন করে নিয়ে যায়, তারা ঘটাপটা করে খাওয়ায় না ? সৌজন্য নেই ?

তা বাবার সদিচ্ছা পূর্ণ হল না। একটু পরেই বামুনদি এলেন 'ও বাড়ি'

থেকে, একটা বড় গামলার মধ্যে আলাদা আলাদা বাটিতে ভাত ডাল মাছ তরকারি বসিয়ে কলাপাতা চাপা দিয়ে নিয়ে।

বললেন, বড় বৌদিদি পাঠিয়ে দিল। বলল, নতুন বাড়িতে পেথম এয়েচো, এইস্ত্রী মানুষ, একটু মাছভাত মুখে দিতে হয়।

খাদ্যবস্তুর পরিমাণ অবশ্য সাতজনতুল্য। এবং সকলেই কিছু 'এইস্ত্রী' নয়, তবু এই কথার পর আর মা'র কিছু বলার থাকল না।

বামুনদি বাড়িটা ঘুরে দেখে বললেন, মেলাই ঘর দেকচি। তা এই রাজসই বাড়িটির ভাড়া কত গো মেজ বৌদিদি ?

মা বললেন, জানি না।

ও বাবা উটোনে কতবড় চোবাচ্চা ! দেকো বাপু, বাপু, বাচ্চাকাচ্চা সাবধান। তোমার তো অজ্ঞান হয়ে বই পড়া। যাক—ভেন্ন হয়ে বাঁচলে তো ? য্যাতো ইচ্ছে বই পোড়ো এখেনে।···তো খোকারা যেন কাল ওবাড়ি থেকে ইস্কুলের ভাতটা খেয়ে যায়। তোমার তো কোলে কচি।

মা ঠাণ্ডা গলায় বললেন, তা হোক। যা হোক করে হবে। আপিসের ভাতও তো চাই।

ওমা ! বড়গিন্নী তো বললো যে দুদিন না গুছিয়ে নিচ্ছো, মেজবাবু ওখান থেকেই খেয়ে আপিস যাবে।

মা আরো ঠাণ্ডা গলায় বললেন, এটা কি একটা কথা হল ?

তা কী করব বল ? মা তো তারকেশ্বরে গিয়ে বসে আছে। বড়গিন্নীই বলচে প্রাণটা পুড়চে। তো তোমার তো কোলে কচি, রান্নার নোক রাকো তো আমার বুনঝিটাকে নিয়ে আসি। কাজেকম্মে খুব দড়, পোষ্কের পরিচ্ছন্নো। দুবেলা রেঁদেবেড়ে দিয়ে যাবে, পাঁচটা ট্যাকা করে দিও। আর পানদোক্তা বলে আর গণ্ডা আষ্টেক পয়সা। তোমারও ভাল হবে, তারও ভাল হবে।

মা আস্তে বললেন, দেখি তোমাদের মেজবাবু আসুন, জিগ্যেস করি।

বামুনদি খ্যা খ্যা করে হেসে বলে উঠলেন, সেই যে বলে না 'রাখালি, কত খ্যালা দ্যাখালি', এ হল তাই। মেজবাবুকে জিগ্যেসা করে তবে রান্নার লোক রাকবে ? তোমার কষ্ট খাটুনি বাঁচাতে একটা কেন পাঁচটা দাসদাসী রাকতে পারে মেজবাবু। অনেক ভাগ্যি করে এসেছিলে বাবা।

ছোট্ট ছোট্ট মানুষগুলোও অনুধাবন করছিল, মা এতে বেশ অপমান-বোধ করেছেন, কিন্তু এগুলো সইতেই তো অভ্যস্ত। জেঠিমা যে বামুনদিকে 'সখিত্বে'র পোস্টে তুলে রেখেছেন। তাঁর তো যত গালগল্প বামুনদির সঙ্গে। তাই বামুনদিরও বাক্-স্বাধীনতা প্রায় জেঠিমারই মত।

বামুনদি মা'র চুপ করে থাকা মুখের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, মেজবাবুর ছুতো রাকো, তোমার কতাটাই বলো। কোলে তিন-চার মাসের কচি, এতোগুলো কাচ্চাবাচ্চা, আপিস-ইস্কুলের ভাত, পারবে তো ? সে সাহস থাকে তো ভালো। আর না হয় তো বলো, ওবেলাই আমার বুনঝিটাকে নিয়ে আসবো।

মা একবার রান্নাঘরের খোলা দরজাটার দিকে তাকালেন, আস্তে বললেন, আচ্ছা।

কী দেখলেন সেই খোলা দরজা দিয়ে ?

দুটো বড় বড় উনুন, যেটা নাকি রান্নাঘরের সৃষ্টিকালেই সিমেণ্ট গেঁথে বানিয়ে রাখা। সেই উনুনের কাছাকাছি একটা নতুন মাটির হাঁড়ি আনা রয়েছে। যাতে হয়তো জনা-কুড়ি লোকের রান্না হতে পারে। বাবা নাকি দাদাকে ভার দিয়ে রেখে গিয়েছিলেন একটা হাঁড়ি কিনে রাখতে। পুরনো বাড়ির থেকে যেন ছোট হয়। দাদা তাই এনেছে। পুরনো বাড়িতে চল্লিশ-বেয়াল্লিশজনের ভাত রান্না হয়। তার থেকে কতটুকু কমালে কি যে দাঁড়ায় সেটা দাদার জানার কথা নয়।

মাটির হাঁড়ি ছাড়া আর কী হবে ? তখন তো আর 'অ্যালুমিনিয়াম' শব্দটা চালু ছিল না।

মা'র কি ওই হাঁড়িটা দেখে হৃৎকম্প হলো ? তাই 'বামুনদির বোনঝিতে'ও আচ্ছা বললেন ?

সব দুঃখ সব হাহাকার ঝাপসা হয়ে গেল হঠাৎ একসময় ছাদে উঠে।

এ কী ! এতো আলো, এতো হাওয়া কলকাতাতেও আছে ?

গতিবিধি ছিল ওই বৃন্দাবন বসু লেন থেকে সতুদাদের বাড়ি বাদুড়বাগানে, যে বাড়িতে দিনের বেলা হ্যারিকেন জেবলে কাজ করতে হয়। আলো না জেবলে খেতে বসলে ভাতের সঙ্গে আরশোলা খেয়ে ফেলাও বিচিত্র নয়। আর যাওয়া হতো কখনো কখনো মেজ পিসিমার বাড়ি দর্জিপাড়ায়, সেও প্রায় তাই। তাঁদের আবার ছাদ থাকলেও ওই কালীবাড়ির পাশের বাড়ির মতই ছাদে ওঠার সিঁড়ি নেই। কাজেই সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসে যেন চমকে গেল মেয়ে তিনটে। ছোড়দাও অবশ্য সঙ্গে এল। আহ্লাদের হাসি হেসে বলল, মা'র এবার কাপড় টাপড় শুকোবার কষ্ট গেল।

মণিদি দেখো ! আকাশটা রাঁচীর আকাশের মতনই নীল-নীল !

অ ছোড়দা, ছাদে যে একটা ঘরও রয়েছে। কী হয় এ ঘরে ?

কী আবার হবে ? দেখছিস না টিনের ছাদ, শুধু ভাঙা ইঁটের দেওয়াল। বাড়িওলার মিস্ত্রী খাটানোর জিনিসপত্তর রয়েছে।

হ্যাঁ রয়েছে বটে কিছু বাঁশটাশ কালিমাখা লোহার কড়া চুনমাখা ড্রাম। তাতে কী ? এ যে একটা অনন্ত ঐশ্বর্য ! মণিদির খেলাঘর পাতাবার আদর্শ ঠাঁই। ভাঙা পুশপুশ-গাড়ির থেকে অনেক ভালো। এটা একদম আমাদের। একদম নিজস্ব। খেলাঘর পাতিয়ে রেখে চলে যাওয়া যায়।

মণিদি, এই বাড়িতে নিয়ে আসার জন্যে আমরা বাবার ওপর রাগ করছিলাম !

হঠাৎ ছোড়দার হাঁ-হাঁ-করা বকুনি শোনা গেল, এই ফুলি, ধারে যাবি না। দেখছিস না ন্যাড়া ছাদ !

ফুলির নড়াটা ধরে টেনেই এনেছেন ছোড়দা।

ফুলি অবশ্য এ অপমানে বিচলিত নয়, কারণ ফুলি ভিতরে ভিতরে খুব 'মানী' হলেও এ যুগের শিশু তো নয়। কান ধরা নড়া ধরা—এগুলো তো তার অভ্যস্ত ব্যাপার। তাই হেসে হেসে বলে, ন্যাড়া ছাদ। হি হি, ন্যাড়া ছাদ আবার কী? ছাদের ঝুলি চুল থাকে?

চুল না থাক, পাঁচিল থাকে। সেটা না থাকলেই ন্যাড়া ছাদ।

এই সৌন্দর্যময়ীর সেইটুকুই অভাব। কেশবতী নয়। তা না হোক, মস্ত বড় তো! ধারে না গেলেই হল।

নেমে এসে ছোড়দা ঘোষণা করলেন, সিঁড়ির দরজাটায় সব সময় শেকল লাগিয়ে রাখতে হবে। ফুলিটা কখন গিয়ে পড়বে। ছাদটা ন্যাড়া তো।

যাক বাবা! শুধু ফুলির প্রশ্ন। শুনে প্রাণ বাঁচল 'আমি'র।

মা তখনো ছাদ দেখেননি। মা ঘর ঠিক করছেন। বাইরের দিকে রোয়াকের ওপর দুটো ঘরের মধ্যে একটা দাদাদের। শোওয়া এবং পড়া বাবদ। একটা বাবার 'বাইরের ঘর'। এতোদিন তো বাবা বাড়িতে ছবি আঁকতে বসার জায়গাই পেতেন না, যা আঁকা আপিসে গিয়ে। এ বাড়িতে বাবার ছবি আঁকার জায়গা হবে। আর বাইরের লোকটোক এলে বসবে। ভিতরে দালানের ওপর সারি সারি তিনটে ঘরের একটা মা'র ঘর'। বাবারও শেয়ার আছে অবশ্য এবং ছোট্ট ভাইয়ের। আর একটা ঘর আমাদের তিন বোনের সম্পত্তি। তার পরবর্তীখানা রান্নাঘরের মুখোমুখি। সেটা খাবার ঘর ভাঁড়ার ঘর দুই-ই। সব ঘরগুলোরই লাল টুকটুকে মেজে, বড় বড়। রাজ-ঐশ্বর্য আর কত বেশী!

ঝানুরা অবশ্য বললেন—তা হবে নাই বা কেন? মাসে মাসে পঁয়ত্রিশ টাকা করে ভাড়া দিতে হবে না তার জন্যে? সোজা নাকি? একটা কেরানীর মাইনে!

যিনি বললেন, তিনি অবশ্য বাবার বুদ্ধিহীনতার দোষ দিলেন। পয়সা হলেও যে বাজে অপব্যয় করতে হয় না তা বলে উপদেশও দিলেন। তা যাক গে, 'আমি'দের তাতে কী? তাদের তো একটা জগৎ খুলে গেল।

আপার সার্কুলার রোডের সেই বাড়িটার প্রেমে পড়ে গেল 'আমি'।

দাদাদের ঘরে পড়ার জন্যে একটা টেবিল পাতা হয়েছে, ও-বাড়িতে যেটার ওপর মা'র প্যাটরা তোরঙ্গ চাপানো থাকতো। কিন্তু তাতে কী, জানালার ধারে একটা পড়ার টেবিল। তাও আবার রাস্তার ধারের জানলা!

বিছানা অবশ্য এখন মাটিতেই পাতা হয়েছে দুই ভায়ের! ও বাড়ির সেই সরু চৌকিটা তো আর আনা হয়নি। কিন্তু তাতে কী? এ আবার মেজে নাকি? রাস্তা থেকে চারটে সিঁড়ি উঠে বাড়ি!

মা এসে দাঁড়ালেন ঘরে। আমরা তিন বোনও অবশ্য মা'র পিছু পিছু।

মা দাদার দিকে তাকিয়ে বললেন, কী? তোমাদের জন্যে খুব খারাপ ব্যবস্থা করা হয়েছে মনে হচ্ছে?

দাদা মাথাটা একটু নীচু করে হাসলেন। ছোড়দা বলে উঠলেন, ভাবতেই

পারিনি!

মা একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন জানলার সামনের চওড়া রাস্তাটার দিকে তাকিয়ে। তারপর আস্তে বললেন, নিজে অনেক খারাপ নাম কিনে তোমাদের জন্যে ভাল ব্যবস্থাই করতে চেয়েছি। গলি থেকে বার করে বড় রাস্তায় এনে পেঁছে দিলাম। এখন যা পারো।

চলে এলেন ঘর থেকে।

হঠাৎ মনে হল মা'র মধ্যে যেন অনেক দুঃখ আছে।

কই, এতোদিন তো বুঝতে পারা যায়নি!

সারাদিনের নতুন প্রেমে পড়ার রোমাঞ্চের মধ্যেও ভীষণ একটা ভয় ছিল, বাবা নিশ্চয় এই অন্য বাড়িতে চলে আসার জন্যে অন্যরকম হয়ে যাবেন। হয়তো আর কোনো দিন হাসবেন না, গল্প করবেন না। মা'র দিকে রাগ-রাগ করে তাকাবেন। ওমা, সন্ধ্যেবেলা একদম সব ভয় ভেঙে ভূত!

'আমি'দের জ্ঞানে যা কোনদিন ঘটেনি, তাই ঘটেছে। (শুধু ওদের কেন, বোধ হয় ওর দাদাদের জ্ঞানেও) বাবা একটা মস্তবড় পাকা রুইমাছ ধরে এনেছেন।

বাবার সঙ্গে বাবার যে প্রাণের বন্ধুটি গিয়েছিলেন, তিনি চেঁচাতে চেঁচাতে ঢুকলেন. ওরে ভোম্বল ডাম্বোল (এ দুটি তাঁরই দেওয়া নাম), শীগগির তোদের মাকে কড়ায় তেল চাপাতে বল। এই মাছভাজা খেয়ে তবে যাব। তোদের বাবা একটা সাত-সেরি মাছ ধরে এনেছে।

বন্ধুটন্ধুর সামনে অবশ্য মা'র বেরোনোর প্রশ্ন নেই, বাবা ভেতরে এসে বললেন, ও ছাড়বে না, এখন খাটতে হবে তোমায়। এতো বড় মাছটা কুটতে পারবে তো?

কিন্তু মাকে পারতে হবে কেন? বামুনদি তাঁর বোনঝিকে সাপ্লাই করে যাননি বিকেলবেলা? অতএব সবই সুশৃংখলে ঘটলো।

রাত্তিরে বাবা প্রসন্নমুখে বললেন, বাড়িটা দেখছি বেশ পয়মন্ত। এতোবড় মাছ কোনোদিন ধরেছি বলে মনে পড়ছে না।

হঠাৎ দেখে অবাক হয়ে যায় 'আমি', মা'র কাঁধের ওপর বাবার হাত, আর মা'র চোখে জল!

বাবা মা'র কাঁধে হাত রেখে কথা বলছেন! কী অদ্ভুত আশ্চর্য! এ দৃশ্য ওরা আগে কখনো দেখেছে? বাড়িটা তাহলে সত্যিই পয়মন্ত।

তাছাড়া সত্যিই প্রথমদিনেই বাবার এতবড় সাফল্য। এতখানি বিজয়-গৌরব। মার চোখে জল, তবু মুখটা যেন হাসিভরা।

সেই সাত-সেরি মাছটা অবশ্য মুখে মুখে এবং দিনে দিনে সের তিরিশে দাঁড়িয়েছিল। (আর বাড়লে যে সুতো ছিঁড়তো, ছিপ ভাঙতো) তা দাঁড়াবে না? বেঁচে থাকলেই 'বাড়' থাকে।

বড়ো রাস্তা।

কী মোহময় আকর্ষণীয়! জীবনের অসংখ্য দিন পার হয়ে এসেও 'আমি' নামের সেই মেয়েটিকে আজও যেন বড়ো রাস্তা টানে।

তবে? তখন সেই শৈশবকালের নিশ্চিন্ত দিনে সারাদিনটা জানলার ধারেই কাটাতে প্রাণ চাইবে না? ওই বড়ো রাস্তার ওপর দিয়েই তো চলেছে জনজীবনের জীবনপ্রবাহ।

শব্দ আর দৃশ্য।

দুটোকে একত্রে পাওয়া কম পাওয়া? অতএব—

সকাল থেকেই শুরু হয়ে যায় জানলায় দাঁড়িয়ে থাকা। 'ও-বাড়ি'তে শুধু শব্দই ছিল। দৃশ্যের মধ্যে মাত্র বাড়ির লোকেদের রাস্তায় বেরোনো আর ঢোকা।

শুধু শব্দই ছিল। ঠাকুমা গঙ্গা নাইতে বেরিয়ে যাবার পরই বাড়িতে শব্দের হাট বসে যেত।…দাপুটে মায়ের পাঁচ-পাঁচটি কর্তা কর্তা ছেলেদের বজ্রগর্জনের শব্দ, (অকারণেই গর্জন। ওটাই ওঁদের স্বাভাবিক কথা বলা) চেঁচিয়ে কাঁদার উপযুক্ত বয়েসের খোকা-খুকুদের কান্নার শব্দ, মহিলাদের ছেলে সামলানো আর সংসার সামলানোর কলকোলাহলের শব্দ, উঠোনো নামানো পাহাড় প্রমাণ কাঁসার বাসন মাজার ঝনঝন শব্দ, বেলায় এসে হাজির হওয়া বামুনদির খরখরে কাজ আর বকবকানির শব্দ, আর তারই সঙ্গে কালীবাড়ির ঘণ্টাধ্বনির সেই উচ্চ গম্ভীর শব্দ।

এ বাড়িতেও দিন শুরু হয় শব্দের ধাক্কায়। তবে এখানের শব্দরা সম্পূর্ণ আলাদা। একেবারে ভিন্ন জাতের।

এখানে অন্ধকার ভোরে ঘুমের অতলে তলিয়ে থাকা আচ্ছন্ন চৈতন্যকে ধাক্কা মেরে জাগিয়ে দেয় একটা লোহায় গড়া গাড়ির মরচে পড়া চাকার ঝড়াং ঝড়াং শব্দ। না, একটা গাড়ির নয়, পর পর পথে বেরিয়ে পড়া অনেক গাড়ির। যেন রাস্তার ধারে পাশে যত বাড়ি আছে তাদের বাসিন্দাদের ঘুম ভাঙানোই ডিউটি ওদের! ঝনঝনিয়ে ঝড়াং ঝড়াং করে সেই ডিউটি পালন করে যায় নিষ্ঠার সঙ্গে।

এরাও ঠাকুমার মত রাত চারটেয় উঠে সাড়ে চারটেয় বেরিয়ে পড়ে। তবে নিজে গঙ্গাস্নানের জন্যে নয়। কংকালসার ঘোড়ায় টানা ওই গাড়িগুলো শহরের জঞ্জাল বইতে বেরোয়। ময়লা ফেলার হাতে ঠেলা ঠেলাগাড়িরা তাদের জমিয়ে তোলা জঞ্জালগুলো চাপিয়ে চাপিয়ে চলে এদের ঘাড়ে।

তা এক হিসেবে হয়তো কাজটা একই জাতের। একটা যদি মনের জঞ্জাল দূরের চেষ্টা, তো অপরটা পথের জঞ্জাল দূর করার চেষ্টা।

ওদের ওই ঝড়াং ঝড়াং শব্দ কমে যাওয়ার পরই রাস্তা বুরুশের শব্দ, ঝাড়ু দেওয়ার শব্দ এবং অতঃপর হোসপাইপে রাস্তায় জল দেওয়ার শব্দ।

শহরের প্রসাধন-পর্বের আয়োজন তো কম নয়। রাস্তাদেরও বাড়ির ঘর-

দালানের মতই 'পরিষ্কারে'র পরিচর্যা। লম্বা লম্বা হোসপাইপে অভাবিত মোটা ধারায় জল ঢেলে ঢেলে রাস্তাকে চান করাতে জলকে 'জলের মত'ই খরচ করা হতো। এখনকার দমকল বাহিনীদের কাছে হয়তো তেমন 'জলধারা' স্বপ্নতুল্য।

ওরা চলে যায়।

আর ঠিক তারপরই আর এক দুরন্ত ঝনাৎ শব্দ। যেটা এক বিছানায় তাল পাকিয়ে শুয়ে থাকা তিনটে ছোট মেয়েকে ঘুমের ঘর থেকে টেনে এনে বাইরে আছড়ে ফেলে।

এ শব্দ হচ্ছে সদর দরজায় লাগানো মোট মোটা লোহার বালার মত দুটো কড়া নাড়ার শব্দ। অধীর অধৈর্য ঘন ঘন সেই শব্দটা শুনে মনে হতে পারে, কড়া-নাড়িয়েকে কুকুরে তাড়া করেছে নাকি!

এই দৃপ্ত কড়া নাড়া 'আমি'-মণিদের বাসন-মাজুনি খোকার মা'র। দু'হাতে দুটো কড়া নাড়ে সে।

শুনতে অবিশ্বাস্য হলেও কথাটা সত্যি, নতুন বাড়িতে এসে খোকার মাকে খুঁজে-পেতে যোগাড় করতে হয়নি। নিজেই এসেছিল। আর এমন মনোরম সুন্দর বাড়িখানা পাওয়া গিয়েছিল দরজায় লটকানো একটুকরো কাগজে 'টু লেট' লেখা দেখে।

মুটে দিয়ে বাড়ি ধোওয়ানো হচ্ছে দেখে—স্বয়ং-আগতা ওই খোকার মা।

বাবা নাকি বাড়ি ধোওয়াচ্ছিলেন, খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে এসে খোকার মা শুধিয়েছিল, নতুন এলে? তা নোক রাখবে নি?

সোনার মত বাসন মাজা, পালিশ করার মত ঘর মোছা, ঝড়ের মত কাজ, তবে মেজাজটি কড়া নাড়ার ধাঁচেই। দরজা খোলার পরই নিত্যনিয়মে আর এক পালা শব্দ। সেটা হচ্ছে খোকার মা'র সঙ্গে বাড়ির বালকভৃত্য রামের জোর বচসার শব্দ। তা বালক একটা রাখতেই তো হয় গেরস্তবাড়িতে। ছেলেরা তো ইস্কুলে যাবে, বাবুরা আপিসে, সারাদিনের ফাইফরমাশটা খাটবে কে? তাছাড়া খোকা-খুকীদের সামলাতেও তো একটা লোকের দরকার। মানুষজন বেড়াতে এলে একটু খাবার এনে দেবে কে? দুটো-আড়াইটে টাকা মাইনে আর দুটো খেতে দেওয়া, এই বৈ তো নয়!

রামের শয়নব্যবস্থা ছিল সদর দরজার পাশেই দাদাদের ঘরের সামনে ঢাকা দালানের এক কোণে। ভোরবেলায় ওই দরজাটা খুলে দেবার দায়িত্ব তার।

ওই অধৈর্য কড়ানাড়ায় রামের ধৈর্যচ্যুতি ঘটবে এটা স্বাভাবিক। পা উঁচু না করলে তো আর দরজার ওপরের ছিটকিনিতে হাত যায় না তার। বেশ কসরৎ করেই খুলতে হয়।

খটাং করে ছিটকিনি পড়ার শব্দর পরই রামের শাঁখের মত গলায় তীব্র তীক্ষ্ন সুর বেজে ওঠে, ঘোড়ায় জিন্ দেএয়েচো নাকি? একটুকু সবুর সয় না? ওটবো, তবে তো দোর খোলবো!

সঙ্গে সঙ্গে কাঁসিভাঙা-কণ্ঠের আওয়াজ, 'ওটবো তবে'? বলি নবাবের নাতির অ্যাতো ঘুমই বা ক্যানো? নোকের বাড়ি চাকরি কর্তে এয়েচিস, না মামার

বাড়ি বেড়াতে এয়েচিস ?

পরক্ষণেই বাসনের খনখন ঝনঝন শব্দ, লোহার বালতির মধ্যে কলের মোটা তোড়ের জল পড়ার শব্দ, খরখর করে উঠোন ধোওয়ার শব্দ। প্রত্যেকটি শব্দ আপন পরিচয়-বাহক।

ঘুমের আমেজের মধ্যে ওই শব্দগুলো শুনতে শুনতে আর বেচারী রামের জন্যে দুঃখ হতে হতে উৎকর্ণ মেয়েটাও আবার ঘুমিয়ে পড়ে। ইস্কুল-টিস্কুলের তো বালাই নেই। মেয়েদের ইস্কুলে পড়ার ব্যাপারে যে ঠাকুমার কড়া নিষেধ। ইস্কুলে যাওয়া মানেই তো 'ধিঙ্গী' হওয়া।

ঠাকুমার ছেলেরা কি তাঁদের মেয়েদের সেই ভয়াবহ পরিণতির দিকে পা বাড়াতে দেবেন ?

অতএব আর একটু শুয়ে থাকার ইচ্ছেয় কোনো ক্ষতি নেই।

বড়ো রাস্তার পাশ দিয়ে একটা সরু গলি, এ বাড়ির টানা সারির ঘরগুলোর একধারের জানলাগুলো সেই গলির ওপর। সহসা সেই জানলার নীচে বেজে ওঠে একটি মধুর মোহন শব্দ, মুড়ির চাকতি চিঁড়ের চাকতি ছোলার চাকতি-ই-ই-ই।

এ বিষয়ে মণি দীপু ফুলি, তিন বোনের মধ্যে মণির কানই সবচেয়ে সজাগ। অতএব বিছানা থেকে পড়িমরি করে নেমেই ডাক, ও মুড়ির চাকতিওলা! এ বাড়ি!

গলির ভিতরদিকে অনেক বাড়ি আছে, মুড়ির চাকতিওলা হাত নেড়ে 'আসছি' সূচক আভাস দিয়ে ভিতরে ঢুকে যায়। ততক্ষণে মণির অর্থসংগ্রহ কাজটা করা হয়ে যায়।

মণি পয়সা নিয়ে ছুটে দরজায় চলে আসে, পাছে চাকতিওলা ভুলে গলি থেকে বেরিয়ে ডানদিকে চলে যায়।

ছোড়দা দেখে হাসেন, হ্যাংলার মতন ছুটোছুটি করছিস কেন ? ভুলে যাবে কী জন্যে ? পয়সা পাবে না ?

দেখা যায়, ভুলে যাবার প্রশ্ন ওঠে না।

মা বলেন, বিছানার হাতে নিসনি তো ?

মণি রেগে বলে, আহা, আমি যেন তেমনি নোংরা।

বাবা শুনতে পেলেই হেসে হেসে বলেন, আহা, যারা পোকাধরা ঘোড়ার ছোলা আর পচা ঝোলা-গুড় নিয়ে ওই চাকতি বানায়, তারা তো গঙ্গা নেয়ে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে কাচা কাপড় পরে ফেরি করতে বেরোয়!

ফেরিওলাদের জিনিসকে হ্যানস্থা করাই ছিল বাবার আমোদ। ছোলা-জাতীয় যা কিছু—যেমন 'ছোলার চাকতি, ছোলা চেপটি, ছোলার ঘুগনি, ছোলা ভাজা, ঝালছোলা সবই যে ঘোড়ার ছোলা, এ জ্ঞান ওরা জ্ঞানাবধিই পেয়ে এসেছে।

তা বলে কি ওই সব স্বর্গীয় বস্তুদের আকর্ষণ থেকে মুক্ত থেকেছে ? তাহলে

তো জগতের 'সার বস্তু' কুলপী বরফ মালাই বরফও ছাড়তে হয়। কুলপী বরফ যে কী বস্তু দিয়ে তৈরী তা কি আর ওরা না জেনেছে বাবার কাছ থেকে!

কুষ্ঠ রোগীদের হাসপাতালে রোগীদের যে জলের বদলে দুধ দিয়ে চান করাতে হয়, এ কথা আর কেউ না জানুক, মণি-দীপুদের বাবা জানতেন। এবং এও জানতেন, সেই স্নান-করানো দুধ ঘরের 'নালি' দিয়ে চলে এসে একটা বড় চৌবাচ্চায় জমা হয়ে থাকে, কুলপীওলারা সেই চৌবাচ্চা থেকে খুব সস্তায় বালতি বালতি দুধ নিয়ে আসে। এ তো বাবার অফিসের এক বন্ধুর দাদা নিজের চক্ষে দেখেছেন।

কিন্তু মণিরা কি সেই স্বচক্ষে দেখাটা ধর্তব্য করতে যাবে?

শুধু ওরা কেন? ওদের মা?

সন্ধ্যে হলেই চাই 'কু-লপী বরো-ফ'। ধ্বনি শুনলেই যে চাঞ্চল্য অনুভব করতেন তাতে সন্দেহ নাস্তি।

অষ্টম গর্ভের সন্তানসহ এই বিরাট সংসারটির গৃহিণীর মধ্যে যেন একটি ছটফটে বালিকা একটা জানলার বন্ধ ঘরের মধ্যে বাস করে। মনে হয় বন্ধ থাকার জন্যে ওই বালিকার আর বয়েস বাড়তে পায়নি।

কে জানে হয়তো এমনিই হয়। একজন মস্ত অফিসের হর্তাকর্তা বিধাতার হয়তো রাস্তার ধারে পাড়ার ছেলেরা বল খেলছে দেখে হাফপ্যান্ট পরে নেবে যেতে ইচ্ছে করে।

হয়তো মালাজপা বুড়ী বিধবার নতুন বরকনের ফুলশয্যের ঘরে আড়ি পাততে ইচ্ছে করে। বাইরে থেকে ওই ইচ্ছেগুলো বোঝা যায় না। প্রবীণ আর পরম পাকার ভূমিকায় জীবনটা কাটিয়ে যেতে হয় তো তাদের।

সন্ধ্যেবেলা 'চাই মালাই কুলপীই', বেশী রাতে 'চাই, বে—লফুল!'

ঘুমের গভীরে তলিয়ে যাবার আগে পর্যন্তই ওই 'বেলফুল' ধ্বনি।

মণি-দীপুদের বাবা শৌখিন মানুষ, শিল্পী মানুষ, এটা সকলেরই বরাবরের জানা। মণিরাও বড়দের মুখে শুনে শুনে জেনেছিল। আত্মীয়-গুরুজনরা তো সর্বদাই বলে থাকেন, তোদের বাবার কথা ছেড়ে দে। অফিস যাচ্ছে না নতুন জামাই শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে বোঝা দায়। চুনট করা ধুতি, গিলে করা পাঞ্জাবি, পায়ে 'পাম্পশু', চুলের কী কেয়ারি! এর নামই বাবু।

কিন্তু ওদের বাবা যে রাত দশটায় ফেরি করে যাওয়া 'বেলফুলের মালা' কেনার মত বাবু, তা জানতে পারেনি এ বাড়িতে আসার পর। বাবাও অবশ্যই তখন একখানি নাতনীর দাদামশাই।

একান্নবর্তী পরিবার অনেক দেয়, আবার অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত করে। আশ্বাস দেয়, বিকাশের পথ দেয় না। নিরাপত্তা দেয়, স্বাধীনতা দেয় না।

তবু তার মধ্যে থেকেও—একটি জনারণ্যের মধ্যে থেকেও (জনারণ্য তো নিশ্চয়ই। এক-একটি দম্পতির সাত আট দশ বারো চোদ্দ ষোলো পর্যন্ত প্রজা-সংখ্যা তো স্বাভাবিক। নির্বোধ মুখ্যুদের সঙ্গে মহামহোপাধ্যায়, মহাশিক্ষিত, মহাজ্ঞানী মানুষের তফাৎ তো কিছু দেখা যেত না।) যেসব প্রতিভাধর প্রচণ্ড

ব্যক্তিত্বে নিজেকে বিকশিত করতে পেরেছেন তাঁরা অবশ্যই বাহাদুর। তবু একটা 'কিন্তু' থেকেই যায়। কেবলমাত্র নিজেকে উদ্ভাসিত করতে পারা ছাড়া ক'জন তাঁর স্ত্রী-পুত্র-পরিবৃত পরিমণ্ডলটিকে উদ্ভাসিত করে তুলতে পেরেছেন? অন্তঃপুরে তো সেই জগদ্দল পাথর।

শখ সাধ করতে হলেও, নিয়মানুবর্তিতা মেনে। মেয়েরা শখ সাধ হলে গহনা গড়াবে, বাসন কিনবে, মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে ভাল তত্ত্ব পাঠাবে। আর পুরুষরা 'নিজেকে নিয়ে' যত যাই কিছুই শৌখিনতা করুক, ওই জনারণ্যের ওপর কোনো শখের আঁচড়টি বসাতে পারবে না।

'একটু ভালভাবে থাকতে যাওয়া'টা কে পছন্দ করবে? কে সেটাকে 'ফ্যাসান' 'বাবুয়ানা' 'বড়মানুষী' ইত্যাদি ছাড়া আর কিছু বলবে?

ভাল লাগলেও বলবে না। কারণ সেটা হবে চিরাচরিত নিয়মানুবর্তিতার ব্যতিক্রম। জনারণ্যে এটা অচল।

আবার এযুগের নিশ্চয়তাহীন নিরাপত্তাহীন- প্রায় 'জনহীন' সংসার হয়তো কখনো কখনো সেই 'জনারণ্যে'র দিনের দিকে তাকিয়ে হতাশ নিঃশ্বাস ফেলে।

ভোর নয়, ভোরেরও আগে, ঘুম আর না-ঘুমের মধ্যবর্তী আচ্ছন্ন চৈতন্যের ওপর কে যেন বুলিয়ে চলেছে একটি সুরেলা সুরের, মায়াবী স্পর্শ। মৃদু গম্ভীর, করুণ করুণ! মৃদু আর করুণ বলেই বুঝি এমন মায়াবী!

ভোরের আগেই যার উঠে পড়া বাতিক, সেই মেয়েটা আস্তে বালিশ থেকে মাথা তুলে উঠে বসল। একটুক্ষণ যেন অবশ হয়ে বসে থাকল।

কোথা থেকে আসছে সুরটা?

আরে! এই বাড়ি থেকেই তো! এই বাড়ি থেকেই। বাবার 'বাইরের ঘর'টা থেকে। চকিতে মনে পড়ে গেল গত সন্ধ্যার কথাটা।

বাবা এলেন অফিস থেকে। অন্যদিনের থেকে অনেকটা সকাল সকাল। অফিস-ফেরত সোজা বাড়ি চলে আসার পাট তো নেই বাবার। কোথায় নাকি 'মুর্গিহাটা' বলে জায়গা আছে, আছে 'পুরনো বাজার' নামের জায়গা, সেইখানে খানিক ঘোরাঘুরি করে না এলে, (মার ভাষায়) নাকি 'ভাত হজম হয় না' বাবার।

ঘুরে আসতেন, আর প্রতিদিনই কিছু না কিছু শৌখিন জিনিসের সওদা থাকতো। হাতে হয়তো একটি পোর্সিলেনের পরী, হয়তো বা তারই একটা ফুলদানী, হয়তো কারুকার্য করা একটা পেতলের কানাউঁচু বাসন, হয়তো বা একটি পাথরের বুদ্ধমূর্তি! আরো অনেক টুকিটাকির সম্ভার থাকতো বাবার হাতে কাগজ মোড়া। হাতেই। তখন তো আর দেশের কারুর কাঁধে ঝোলাঝুলি ওঠেনি। ঝোলা থাকতো কাবুলীওয়ালাদের, মুশকিল আসানদের, আর ঝুলি থাকতো ভিখিরিদের।

কে জানে কবে থেকে বাঙালীজীবনে 'ঝোলা'র অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। কবে থেকে সেই ঝোলাঝুলি চিরন্তন হয়ে কাঁধে চেপে বসে রইল। বিষয়টা কালে-ভবিষ্যতে গবেষকদের গবেষণার বস্তুও হতে পারে। সে যাক, তখন বাঙালী-

ীবনে ঝোলাঝুলির অস্তিত্ব ছিল না। কারণ 'র‍্যাশান' নামক দুঃস্বপ্নও তো ছিল া। বাঙালী পুরুষের ছিল পকেট, চাদরের খুঁট, কোঁচার আগ। সকালবেলা বাজার বলায়, মালপত্র চাকরের অথবা মুটের ধামায় চাপিয়ে দেবার পর, হঠাৎ কোনো লাভনীয় বস্তু চোখে পড়ে গেলে কোঁচার আগাটাই মেলে ধরা ছাড়া গতি কী? য়সায় তিনটে করে উচ্চমানের ডাঁশা পেয়ারা কি পয়সায় চারটে করে বৃহৎ বৃহৎ লিতি আমড়া, যা নাকি ছেলেমেয়েদের কাছে 'রাজভোগে'র থেকেও পছন্দের, না য়ে পারা যায়? যদিও 'আমি'দের বাবা ছিলেন দুর্দান্ত শৌখিন মানুষ। অফিসের ত্য সাজ ছিল, গিলেকরা আদ্দি'র পাঞ্জাবি, চুনট করে কোঁচানো কাঁচির ধুতি, ায়ে নিজের হাতে বুরুশ করা পাম্পশু, মাথায় কেয়ারী করা টেরি, গরমের দিনে ধে পাট-করা উড়ুনি, শীতের দিনে সাদা আলোয়ান। মামারা ব্যঙ্গহাসি সে বলতেন, 'তোদের বাবা অফিস যাচ্ছে, না নতুন জামাই শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে -বোঝা দায়।'

বাবা অবশ্য এ হাসি গায়ে মাখতেন না। বরং বক্তাদের মিলের ধুতি আর ইল সার্টের দিকে কৃপাদৃষ্টি বুলোতেন। তাঁরা তো রীতিমত কেষ্টবিষ্টু, দের কোর্ট-কাছারির পোশাকটি কী তা জানা ছিল না এদের। তবে আত্মীয়-নেদের কাছে পরিচিত পোশাক ওই মিলের ধুতি (তাও খাটো), টুইল শার্ট, দ্যাসাগরী চটি। মা অবশ্য এতেই গর্ব অনুভব করতেন।

সে যাক, বাবার ওই অফিসের সাজটা ঈষৎ ময়লা হলেই বাজারের পোশাক। াঞ্জাবির গিলে কুঁচিটা একটু সমতল, কাঁচি ধুতির চুনট কোঁচার ভাঁজটা একটু াথিল, তবু ধুতিটা তো দামী জাতের। একদিন লোভে পড়ে সেই ধুতির াগায় ইয়া ইয়া গলদা চিংড়ির গাদা বেঁধে এনে ধুতির দফা গয়া!

কিন্তু কী করবেন? হঠাৎ যদি চোখে পড়ে যায় তাজা টকটকে ইয়া বড় লদা চোদ্দ পয়সা সেরে বিকোচ্ছে, না কিনে থাকা যায়?

মা সেই চিংড়ির দাড়াবিক্ষত কাপড়খানা বাবার চোখের সামনে মেলে ধরে ল উঠেছিলেন, 'লাভ-লোকসানের হিসেবটা কষে দেখবে?'

মা তো সর্বদাই সীরিয়াস।

তা ঝোলাঝুলির 'পাট' না থাকাতেই তো এই বিপত্তি!

বেশ হয়েছে এখন! দেশ জুড়ে, রাজ্য জুড়ে, নাকি পৃথিবী জুড়েই কল মানুষের কাঁধে ঝুলি। আবালবৃদ্ধবনিতা, অভিজাত, অনভিজাত সকলের ধে। যেখানে যখন যা পাচ্ছে ঝুলিতে পুরে নিচ্ছে। খাশা ব্যবস্থা।

কিন্তু গতকাল সন্ধ্যায় বাবা সকাল সকাল বাড়ি ফিরেছেন, যে জিনিসটি ায়ে, সেটি কিন্তু ঝুলিঝোলায় ভরে আনবার নয়। এলো মুটেবাহিত হয়ে। াবধানে নামিয়ে দিল তারা।

পালিশ-চকচকে একটি টেবিল-হারমোনিয়াম, বাবার মুখে আহ্লাদের দীপ্তি, তায়ার্কি'নে'র, বুঝলে? চিরদিনের সাধ ছিল—

মা সন্দেহের গলায় বললেন, সেকেণ্ডহ্যাণ্ড নয় তো?

না না। কী মুশকিল! দোকান থেকে কিনে আনলাম, আনকোরা নতুন।

তবু ভাল। বলে মা কোথা থেকে একটা শুকনো ফুল এনে জিনিসটার ওপর একবার বুলিয়ে দিয়ে কি জানি কাকে নমস্কার করলেন। এটা মার বাতিক। কোনো নতুন আসবাব এলেই একটু ঠাকুরের ফুল ছুঁইয়ে দেওয়া। সেদিন তো মার নিজের জন্যে আসা সেলাই-কলটার গায়ে ফুলটা ছুঁইয়ে, ফুলটাকে সেলাইকলের পকেটেই রেখে দিলেন। সেলাইয়ের এই 'হাতকল' তখন নতুন উঠেছে। শোনা যাচ্ছে সেলাই শিখে মেয়েরা এবার দর্জির খরচ বাঁচাবে।

মণি আর ফুলির দিকে তাকিয়ে দেখল 'আমি', ঘুমের অতলে তলিয়ে আছে। নিজস্ব পদ্ধতিতে আস্তে নেমে পড়ল খাট থেকে। আস্তে পা টিপে টিপে দরজার কাছে চলে এসে পা উঁচু করে বুড়ো আঙুলের ডগায় ভর দিয়ে দরজার ভারী খিলটা খুলল। বেরিয়ে এল খোলা দাওয়ায়। কোণের দিকের ঘরটা থেকে ভেসে আসছে সুর, আর এসে পড়েছে আলো।

না, ঘরে কোনো আলো জ্বালাননি বাবা। খোলা জানলা দিয়ে রাস্তা থেকে এসে পড়া গ্যাসের আলো। চাঁদের আলোর মতই মায়াময়। বাড়িটার ঠিক সামনাসামনি ও-ফুটে গ্যাসবাতি। 'বাতি জ্বালিয়ে'রা সকালসন্ধ্যে মই ঘাড়ে করে বেরিয়ে বাতিগুলো নিভিয়ে আর জেলে বেড়ায়।

হারমোনিয়ামটা রাখা আছে দেয়ালধারে। জানলার আলোটা এসে পড়েছে বাবার পাশমুখের ওদিকটায়। এপাশটা অন্ধকার। এই আলো-আঁধারির পরিবেশে বাবাকে কেমন যেন অন্য জগতের মানুষ লাগছে।

বাবার আস্তে আস্তে পায়ের ওঠানামায় 'বেলো' হচ্ছে, দু'হাতের দশটি আঙুল যেন বাজনার রীডগুলোর ওপর আলতো ভাবে ঢেউ খেলিয়ে খেলা করছে।··· কে বলবে, এই মানুষের গলা দিয়ে জোর ডাকহাঁক বেরোয়!

মৃদু, আরো মৃদু। সুরটা যেন ক্রমশঃ বিলীন হতে চাইছে। মেয়েটার ইচ্ছে হল একটু এগিয়ে যায়, বলে ওঠে, বাবা, তমি লোকেদের মতন জোরে বাজাতে পার না?

সাহস হল না।

ফিরে এল যেমন চুপিচুপি গিয়েছিল তেমনি চুপিচুপি।

এসে দেখল, মণিদি জেগে বসে আছে।

বলল, বাইরে ঘরে গিয়েছিলি বুঝি?

হুঁ।

বাবা বকলেন না?

দেখতেই পাননি।

খুব ভাল লাগছে, নারে?

হুঁ।

কবে শিখলেন বাবা এসব, অ্যাঁ!

বোধ হয় ছোটবেলায়। কাল বললেন না, চিরদিনের সাধ ছিল একটা

হারমোনিয়াম।

মণিদি একটু চুপ করে থেকে বলল, আচ্ছা বাবা তো বেটাছেলে, তবে চিরদিনের সাধ মনে পুষে রেখেছিলেন কেন?

বেটাছেলে তা কী?

বাঃ! মা সব সময় বলেন না, মেয়েমানুষ হচ্ছে দুঃখী জাত। পরের ইচ্ছেয় জীবন। কোনো সাধই মেটে না তার। বাবার কেন তাহলে—

একটু আগে যে মেয়েটা আলো-আঁধারির মধ্যে তার বাবার অদ্ভুত একটা শান্ত সমাহিত ভাব দেখে এসেছে, সে আস্তে বলে, বাবাকে দেখেও কী রকম যেন দুঃখী-দুঃখী লাগল! আসলে হয়তো মেয়েমানুষ বেটাছেলে সকলের মনের ভেতরই কিছু খানিকটা দুঃখু থাকে।

যা বলেছিস রে!

হঠাৎ মণিদি একটা অদ্ভুত কথা বলে উঠল, আমারও এক এক দিন দুপুরবেলা ছাতে গেলে, কী রাস্তার ধারের জানলায় দাঁড়িয়ে থাকলে মনটা কীরকম দুঃখু-দুঃখু হয়ে যায়। শুধু শুধু কান্না পায়।

চমকে ওঠে 'আমি'।

তোমারও হয়?

কেন, তোরও হয় নাকি?

এই প্রথম বোধ হয় মণিদির কাছে সত্য গোপন করে 'আমি'। বলে, না, এমনি বলছি। মার হোতো।

বাজনাটা থেমে গেল, না রে?

তা থামাতে তো হবেই। কত কাজ বাবার। গয়লার কাছে দাঁড়াতে হবে, চা তৈরী করতে হবে, বাজার যেতে হবে। তারপর নাওয়া খাওয়া, আপিস যাওয়া। সাড়ে আটটার মধ্যেই তো সব করে ফেলতে হবে।

অবশ্য কাজগুলো 'করতে হবে' বললে ভুল বলা হয়। এসব বাবার স্বেচ্ছাকৃত দায় ঘাড়ে নেওয়া। যেমন গয়লা গরু নিয়ে এসে দাঁড়ালে, রামও তো দেখতে পারে বালতিতে জল মিশোচ্ছে কিনা। রাম না হলে দাদারা! কিন্তু বাবা কারোর ওপর বিশ্বাস রাখতে রাজী নয়। গয়লা বড় সাংঘাতিক জাত। ঠিক ওদের চোখে ধুলো দিয়ে সঙ্গে আনা ঘটি থেকে জল মিশিয়ে দেবে। একমাত্র বাবার চোখে ধুলো দেওয়াই অসম্ভব।

আর চা তৈরী?

সত্যিকার 'পিওর' পদ্ধতিতে কেউ চা বানাতে পারে নাকি? বাবার বড় সাধের আসল দার্জিলিং চায়ের তো দফা শেষ করে দেবে!

আর বাজার? সেটা বোধ হয় বাবার জীবনের বহুবিধ 'হবি'র মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ 'হবি'।

মানুষ যে কত উল্টোপাল্টা জিনিস দিয়েই তৈরী হয়!

জীবন আর জগৎ যে কী ভয়ংকর পরস্পরবিরোধী ব্যাপারে গড়া! তবে সেই বিরোধিতায় পীড়িত হবার কালটা আসতে বোধ হয় দেরি হয় মানুষের।

কাজেই ওই মৃদু সুরের মূর্ছনার আভাস মিলিয়ে না যেতেই যখন দরজার বাইরে বাছুরের 'হাম্বা' রব শোনা গেল, তখন সেটাকে তো ভয়ানক একটা অনিয়ম বলে মনে হল না। বরং কারুরই নিয়ম বলেই মনে হল। 'নিয়মে'র ঘটনাই তো।

এটাই তো গয়লার দুধ দিতে আসার সময়। গরু বাছুর বালতি আর 'পোয়া' মাপের ঘটি নিয়ে দোরে দোরে বেরিয়ে, যার যতটা 'যোগান' ততটা দুধ দুয়ে দিয়ে চলে যাবে। ওর সঙ্গে বাছুরের ওই 'হাম্বা' রব থেকেই বোঝা যাবে কটা বাজল। ঘড়ির কাঁটা যদিবা ভুল হয় ওরা নির্ভুল। ওদের ঘরে কি ঘড়ি আছে? 'তোপে'র সঙ্গে টাইম মিলোনো?

গোয়ালার ওপর কড়া পাহারার চোখ রেখে, নির্জলা খাঁটি দুধটি সংগ্রহ করিয়ে বাবা হাত মুখ ধোয়া পর্ব সেরে চা তৈরী করতে বসলেন।

টেবিল-ফেবিল অবশ্য নয়। মেঝেয় মাদুর পেতে। সামনে আরো মাদুর। ছেলেমেয়েরা 'তৈরী' হয়ে এসে বসবে। সকলকে চা খাওয়ানো চাই বাবার। এমন কি বছর-ভর্তি না হওয়া ক্ষুদে খোকাটাকে পর্যন্ত। প্লেটে ঢেলে জুড়িয়ে জুড়িয়ে চামচ করে। যেন কতই দরকারী পথ্য দেওয়া হচ্ছে।

কেবলমাত্র মাকে কোনোদিন চায়ের আসরের সদস্য করে তুলতে পেরে ওঠেন-নি বাবা। মার নাকি চা খেলে ঘুম হয় না।

বাবাকে অবশ্য অনেক যুক্তি খরচ করতে দেখেছি চায়ের সপক্ষে। ঘুমটা এমন একটা কী জিনিস যে, না এলে খুব কিছু লোকসান! তাছাড়া দু-একদিন হয়তো আসবে না, তারপর ঠিকই এসে হাজির হবে। আসবে না তো যাবে কোথায়?

কিন্তু মা অনমনীয়!

সারাজীবন এই অনমনীয়তাই তো মার নিজেরই অনেক দুঃখের কারণ। মার মধ্যে আপোস নেই। তবে ছেলেমেয়েদের এই কুপ্রভাব থেকে রক্ষা করা সম্ভব হয়নি মার। এ বিষয়ে যে সব কটাই বিরোধীপক্ষের শিবিরের।

চা বিস্কুট আর মোড়ের কালোর দোকান থেকে নিয়ে আসা সদ্য-ভাজা জিলিপি ও হিঙের কচুরি পর্ব সমাধা হওয়া মাত্রই বাবা উঠে পড়ে, কুঁচি-ল্যাপ্টানো গিলে-পাঞ্জাবি আর ভাঁজ-লটকানো কোঁচানো ধুতিটি পরে ডাক দিতেন, রাম আয়। আমি আলুওলার দোকানে আছি।

রাম চায়ের জায়গা সাফ করে, হাত ধুয়েই দ্রুত ছুটতো মস্ত একটা ধামা নিয়ে। লক্ষ্য—হাতীবাগান বাজারের আলুওলার দোকান। মা কলঘর থেকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতেন, রাম, বাবুকে বলিস যেন গুছিয়ে বাজার না করেন।

বাবার বেরোবার পরই ধ্বনিত হতো সেই প্রাণ-উদাস-করা শব্দটি।

রেলের বাঁশী!

তার সেই তীক্ষ্ন তীব্র 'কু-উ-উ' শব্দটি শুনলেই মনটা যে কেন হায় হায় করে উঠত 'আমি'র কে জানে। মনে হতো কী যেন পাইনি। কী যেন হারিয়ে গেছে। (কিন্তু সেটা কি শুধুই ছেলেবেলায়?)

রোজ শুনছে দৈনিক চারবার করে, তবু প্রত্যেকবারই ওই প্রাণ-উদাস-করা ভাব ! অতএব ছুটে চলে এসে বাইরের ঘরের জানলায় ।

ওখানে—

কোন্ রেলগাড়ি !

তা বলা যাবে না । সে গাড়ি কী রকম যাত্রীদের বহন করে কোন স্টেশনে পৌঁছে গিয়ে তাদের হুড়মুড়িয়ে ঢেলে দিয়ে আসতো তা আর নাই বলা হল। তবে রেলগাড়ি তো বটে ?

রীতিমতই লাইন পাতা । গার্ডের হাতে লাল সবুজ নিশেন । আর ওই 'কু-উ-উ' ধ্বনি । এবং তৎপরে 'ঝিকঝিক' ঘষঘষ !

'অবিশ্বাস্য' বলে ওড়াবার উপায় নেই । বছর সত্তর আগে, গ্রে স্ট্রীটের মোড়ের কাছে, আপার সার্কুলার রোডের ও-ফুটপাতের ওপর দিয়ে রেলগাড়ি চলতো। আরো অনেক পর পর্যন্তই চলেছে ।

শব্দ ! শব্দ শব্দ আর সৌরভ ! এরাই বোধ হয় স্মৃতির ধারক বাহক ।

আচমকা একটি পুরনো পরিচিত সৌরভ কাছে এলে ঝপ করে বহুদিন বিস্মৃত স্মৃতির ঘরের মরচে পড়া দরজাটা খুলে ধরে ।

কত কত যুগ পার হয়ে গেল, আজও হঠাৎ কোথাও শিউলি ফোটার সৌরভ এসে নাকে এসে লাগলেই দীপুর চোখে ভেসে ওঠে দুটো ছোট মেয়ে ন্যাড়াছাত টপকে এ-ছাত থেকে ও-ছাত করে তিনটে বাড়ি পরে একটা বাড়ির ছাতে এসে পৌঁছে, ছাতে ছড়িয়ে পড়া শিউলি তুলে তুলে একটা চুপড়ি ভর্তি করছে ।

বাড়ির ছাতে ছাতে ঠেকানো আরো বাড়ি । এমন কিছু আশ্চর্য ঘটনা ছিল না তখন । পাশাপাশি বাড়ি বানাতে হলে মাঝখানে খানিক জমি ছাড়তে হবে এমন অসঙ্গত আইন ছিল না ওইসব বাড়ি তৈরীর আমলে । পড়শীর একখানা দেওয়াল যখন পাওয়া যাচ্ছে, তখন একখানা বড় দেওয়াল তোলার খরচ তো বেঁচে গেল । এটাই তো সঙ্গত ।

এই রকম 'সঙ্গত' আইনের আমলে তৈরী ওই বাড়িগুলোর মধ্যে 'মোটা ভদ্দরলোকে'র বাড়িটার সামনের উঠোনে ছিল মস্ত একটা শিউলি গাছ, যার সব ফুলগুলোই ঝরে পড়ত তাঁরই একতলার ছাতে ।

কী আরাম ! কী সুবিধে ! প্রতিযোগীও নেই । সারাছাত বিছিয়ে থাকতো সেই শরতের শিশির ধোওয়া ভোরের শিউলির রাশি ।

কী আশ্চর্য সুন্দর ছিল তখন শরৎ কালটা ।

বৃষ্টি ? বর্ষা ? মনে পড়ে কারুর ? মনে তখনকার কালের কারুর ?

সেই সদ্য ঝরা শিউলির গন্ধ যুগযুগান্তর পার হয়ে হঠাৎ ছবির সিরিজ সাজিয়ে দেয় । ঝুড়ি উপচে যাচ্ছে, অতঃপর ফ্রকের কোঁচড়ে । নিয়ে এসে মাকে দেখিয়ে মার আনন্দদৃষ্টির অভিনন্দন লাভ ।

আর শব্দ !

এখনো কি অলক্ষিত কোথাও কোনোখানে ধ্বনিত হয় না সেই সব শব্দ,

বুড়ো হয়ে যাওয়া দীপমালা দেবীর মধ্যে!

না, 'আমি' নামটাকে আর ধরে রাখতে পারেনি দীপু পাড়াপড়শীদের উৎপাতে। তাঁরা এ বাড়ির পরপর তিনটে মেয়েকে ন্যায্য নামেই না ডেকে ছাড়বেন না। অতএব মণি, দীপু, ফুলি। অর্থাৎ মণিমালা, দীপমালা, ফুলমালা।

দৈবাৎ কোনোদিন ফুল নিতে না গেলে 'মোটা ভদ্দরলোক' ডাকাডাকি করতে শুরু করেন। অ মণি, অ দীপু, তোমরা আজ ফুল নিতে এলে না?

বড় সহৃদয় আর আন্তরিক সেই কণ্ঠ।

ওঁদের বাড়িতে কোনো ছোট ছেলেমেয়ে নেই। মাত্র দুটি বড় হয়ে যাওয়া ছেলে। তারা শিউলি ফুলের দিকে তাকিয়েও দেখে না। আরো কতজনা আছে বাড়িতে, সবাই বড়।

একতলার ওই ছাতটা, যেখানে ভোর না হতেই ফুলের চাদর বিছোনো হয়ে যায়, তার সংলগ্ন ছাতে একটিই ছোট্ট ঘর, যে ঘরে মোটা ভদ্দরলোক একা রাত্রে শোন। নীচের তলায় গুমোট, ভিড়।

তেমনি সহৃদয় আর আন্তরিক কণ্ঠ ক্রমশঃই দুর্লভ হয়ে যাচ্ছে সংসার থেকে।

আচমকা শিউলি ফোটার সৌরভ পেলেই সেই কণ্ঠস্বরটিও যেন স্মৃতির ঘরের বন্ধ দরজাটি খুলে বেরিয়ে আসে।

'আমি'কে ধরে রাখা যায়নি।

ক্রমশই 'আমি'র ওপর পড়ে চলেছিল দীপুর প্রলেপ। পড়তে পড়তে পুরু আবরণ।

ক্রমেই। ক্রমশঃ।

তবু সেই পুরু আবরণ ভেদ করেও শব্দরা হঠাৎ হঠাৎ উচ্চকিত হয়ে ওঠে, নিয়ে গিয়ে ফেলে দূর অতীতের পৃষ্ঠপটে। একটা জানলার ধারে দাঁড়িয়ে পড়ে 'আমি' নামের বোকা মেয়েটা।

শব্দ!

নাকি শব্দের মিছিল! মিছিলই।

'মুড়ির চাকতি ছোলার চাকতি-ঈ'র পরই—

'পাঁওরোটি-ঈ! ঈ!! ঝালবিস্কুট, মিষ্টিবিস্কুট, নোনতাবিসকু-উট!'

এই পাঁউরুটি নাকি খাঁটি 'হিন্দু পাঁউরুটি'। চ্যাঁচাড়ির ডালার মধ্যে সাজানো ময়লা ময়লা একটা পাট করা ন্যাকড়া চাপা দেওয়া এই 'হিন্দু পাঁউরুটি' আর ঝাল বিস্কুটের খদ্দের অগাধ! চলি যাচ্ছে তারা বাড়ি বাড়ি!

বেচারী দীপু-মণিদের বাড়িতে অবশ্য ওর প্রবেশ নিষেধ। ওদের বাবা তো রোজ অফিস থেকে ফেরার পথে বড়সড় একখানি 'গ্রেট ঈস্টার্নে'র পাঁউরুটি এনে মজুত রাখেন। আর বিস্কুট তো টিনেই থাকে। ফেরিওলার জিনিস খাবার জো নেই বেচারীদের। বড় বঞ্চিত। প্রাণের মধ্যে যন্ত্রণা দিয়ে যায়, 'অবা-ক জলপান', 'নারকেলের ঘুগনি'। আরো কত কণ্ঠ, কত ধ্বনি। অবশ্য যেসব হাঁক ওঠে, তার সবই ঠিক খাদ্যবস্তু নয়।

হাঁক উঠল, 'ছুরি শা-ন্‌ কাঁইচি শা-ন, বঁটটী শা-ন !'

'শিশি বোতো-ল কাথে-জ বিক্কীরী' !

'ভাঙা লোহা বিক্কিরী-ঈ।'

'শিল কাটাবে—'

'রিশ্‌মি চুড়ি-ই-ই !' ভালো ভালো রিশ্‌মি চুড়ি !'

'ছাৎতা সারাবে—'

'পাংখা-বরো-ফ। পাংখা বরো-ফ !'

'ট্যাঁপারি, টোপাকুল, নারকুলে কু-উল !'

'পেয়ারা চাই ! পেয়ারা ! পাক্‌কা পেয়ারা !'

'বাসন নেবে মা—বা-সন !'

এ বাসন পুরনো কাপড়ের বিনিময়ে—শুধুই বাসন থাকে না, থাকে কাঠের হাত-আয়না, মোটা চিরুনি, সরু চিরুনি (যাতে সুভাষিত রাণী অংকিত 'পতি পরম গুরু !'), কাঁচের পুতুল।

পরক্ষণেই 'চীনের সিঁদু উর ! চীনের সিঁদুর !'

'বাত ভাল করি, দাঁতের পোকা বার করি, কোমরের ব্যথা আরাম করি—'

'লক্ষ্মীর পাঁচালী-ই ! প্রথোম ভাগ ! দ্বিতীয়ো ভাগ ! মেয়েলী ব্রতকথা ! গোপালভাঁড়ের গল্প !'…

চলেইছে এই শব্দের মালা, শব্দের মিছিল, যার বিশেষ একটি ধ্বনিই পুরো কথাটা ধরিয়ে দেয়।

কিন্তু ভরদুপুরের বাসনওলারা ?

ওরা ওদের কণ্ঠস্বর খরচ করে না। শুধু ঠং ঠং ঠং !

শুনলেই বুক গুরগুরিয়ে ওঠে।

রোজ রোজ কার বাসনের দরকার ? কেই বা ডাকছে, কেই বা দাঁড় করাচ্ছে। তবু প্রতিদিন 'ঠা-ঠা' রোদ্দুরে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়াবে, মাথায় ঝাঁকা, হাতে কাঁসর আর একটা কাঠের ডাণ্ডা। চলে, চলবে দুপুরের শুদ্ধতাকে খান খান করতে করতে।

কে জানে সেই পুরনো পাড়ায় এখনো সেই সব ফেরিওয়ালাদের ধ্বনি শোনা যায় কিনা !

একটুখানি ন্যাকড়ার মধ্যে একটুকরো বরফ ঢুকিয়ে দিয়ে 'ঠাঁই' করে একটা হাতুড়ির ঘা বসিয়ে পরিষ্কার গোল চেহারায় দাঁড় করিয়ে তাতে একফোঁটা লাল লাল সিরাপের জল ছিটোনো সেই 'পাংখা বরো-ফ' কি আজও খায় ছেলে-মেয়েরা ?

কিন্তু কেনই বা খাবে ? এখন তাদের জন্য দোহাত্তা কত সমারোহময় আয়োজন। কে তাকাতে যাবে সেই দীনহীনের দিকে ?

এখন তো দীপুর 'কলকাতা, নামের মুহূর্তে মুহূর্তে পরিবর্তনশীল কল্লোলিনী নগরীর সেই উত্তর সীমান্ত থেকে সরতে সরতে দক্ষিণের শেষ সীমান্তে বসবাস। ঠিক জানে না উত্তর তার পুরনো চেহারা চরিত্র আর ঐতিহ্যের

কতখানি হারিয়েছে, আর কতটুকু ধরে রাখতে পেরেছে!

কলকাতায় তো অহরহই ভাঙাগড়ার লীলা। এ শহর সর্ববিধ পরিকল্পনাকারদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মহাক্ষেত্র। কলকাতার ভূমিকাটা প্রায় গিনিপিগের। কে জানে দেশের আর কোনো রাজ্যের আর কোনো শহর এমন ভূমিকায় আছে কিনা। কলকাতায় অহরহই পরীক্ষা-নিরীক্ষা—কী বাইরে, কী ভেতরে।

যুদ্ধ! যুদ্ধ!

কলকাতার আকাশে বাতাসে, প্রত্যেক্ষে অন্তরীক্ষে এখন এই একটিই শব্দ। এ শব্দ ধ্বনিত হচ্ছে লোকের মুখে মুখে, ঝংকৃত হচ্ছে হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে। সকলের সব কথার মধ্যে যেভাবেই হোক এসে পড়ছে ওই 'যুদ্ধ'!

যুদ্ধ বেধেছে সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর ওপারে, কিন্তু তার তাপ উত্তাপ এসে পৌঁচেছে এ দেশে জোরকদমে। কারণ এই 'ভারতবর্ষ' নামক হতভাগ্য দেশটা ওই যুদ্ধরত দুজনের মধ্যে একজনের অধিকৃত! কাজেই এ দেশের প্রতিটি মানুষের কাছে এ যুদ্ধ যেন নিজেদেরই ঘরের ব্যাপার।

দেশের নিতান্ত রাজভক্ত প্রজারা অবশ্যই মনেপ্রাণে চাইছে 'আমাদের রাজার জয় হোক!'

তবে সবাই কিন্তু আর মনেপ্রাণে রাজভক্ত নয়। তাদের বক্তব্য তো 'সাধে কি বাবা বলি? গুঁতোর চোটে বাবা বলায়'!

তারা অন্তরের অন্তস্থলে এই ইচ্ছেটি লালন করছে, 'এদের পতন হোক, ওদের জয় হোক'।

এদের পতন হলে হয়তো আমাদের এই পরাধীনতার শৃঙ্খলটি মোচন হতে পারে। আর তাও যদি বা না হয়, যাদের শাসনের চাপে পড়ে আছি তারা হেরে ভূত হোলো, এটাও তো দেখতে আমোদ।

স্পষ্ট করে মুখে বলে ফেলবার সাহস না হোক্ মুখের ভাবে তো সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

মণি-দীপুরা এই নতুন বাড়িতে আসার পরই শুনছে 'ইংরেজ জার্মানে যুদ্ধ বেধেছে'।

বাবা খুব মন দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছেন, দাদারা কাগজ নিয়ে কাড়াকাড়ি করছেন। বাড়িতে যে যখন আসছে (আসে এ বাড়িতে অনেকে, ও বাড়ি থেকে কাকারা, বড়দা গোবিন্দদা, মার যত বোনপো আর ভাইপোর দল, সর্বদাই লোকসমাগম) তখনই উঠে পড়ছে যুদ্ধবার্তা।

যুদ্ধের গতিবিধি কোন্ পথে? ভাগ্যদেবীর কৃপাদৃষ্টি কার ওপর ইত্যাদি ইত্যাদির পর এসে পড়ছে আসল প্রসঙ্গ—বাজারদর!

যদিও সেই প্রথম মহাযুদ্ধে কলকাতায় বোমা পড়েনি, 'বোমা-পালানীয়া' নাটক দেখা যায়নি, তবে উত্তেজনা উদ্বেগ ঘাড়ে বোমা পড়ার থেকে কিছু কম ছিল না।

বোমা যে পড়েনি, তা তো নয়। পড়েছে বৈকি। বোমা পড়েছে গেরস্থর

জীবনযাত্রার রসদের ওপর।

শুনলে তো? আমাদের ও বাজারে কাটাপোনা এক লাফে চার আনা থেকে সাড়ে চার আনা সেরে উঠে গেল! দোবরা চিনির সের চোদ্দ পয়সা। দোবরা আর খাওয়া চলবে না, বাটাচিনিই খেতে হবে।

তোমাদের বাজারে কাটাপোনা সাড়ে চার আনায় উঠেছে, তাই ক্ষেপে যাচ্ছ? এখানে হাতীবাগান বাজারে তো একদিন পাঁচ আনা পর্যন্তও উঠেছিল। হাঁসের ডিমের জোড়া চড়চড়িয়ে তিন পয়সায় গিয়ে ঠেকল।

শুধু মাছ? কী নয়? আলুর পর্যন্ত দাম চড়ছে। পরশুও তিন পয়সায় দু সের নিয়ে এসেছি, আজ চার পয়সার কমে ছাড়ল না।

এ আলোচনা সভায় এমন কথাও শোনা যেত, এখানের এইসব জিনিস সেই দূর-দূরান্তরে যুদ্ধের কোন্ কাজে লাগবে? এ শুধু দোকানীদের যুদ্ধের নামে সুযোগ নেওয়া।

আবার অন্য একটা আসরে, খোকার মার খোকা হি হি করে বলতো, ওমা শোনেন নাই? গোল আলু দিয়ে যে গোলা বানাচ্ছে। অ্যাতো বারুদের যোগান আসবে কোথা থেকে? তাই গোল আলু কামানের মধ্যে পুরে ছটাছট ছুঁড়ছে।

এই দ্বিতীয় আসরের জায়গাটি হচ্ছে বাড়ির মধ্যে, রান্না ভাঁড়ার ঘরের এলাকায়। রিপোর্টাররা হচ্ছেন খোকার মা, বামুনদি, বামুনদির মা-মরা নাতিটা, যে নাকি নিত্যিই 'দিদিমা কখন ঘরে যাবে?' বলে এসে রান্নাঘরে উঁকি দিয়ে তাড়া লাগাতো, আর তারপরই দেখা যেত হাস্যবদনে পাশের দাওয়ায় খেতে বসে গেছে। তবে এতে বামুনদিকে দোষ দেওয়া যায় না। মা নিজে থেকেই বলতেন, আহা ছেলেটার খিদে পেয়েছে, তুমি কখন বাড়ি যাবে, কখন রাঁধবে ঠিক নেই। ওকে দুটি ভাতে বসিয়ে দাও।

'মা মরা' শুনে ছেলেটার প্রতি মার বড় মমতা ছিল। তাছাড়া 'ভাত' আবার এমন কি দামী বস্তু? গেরস্থবাড়িতে দুপুরের ভাতের হাঁড়িতে চাল তো চারটি বেশীই নিয়ে রাখতে হয়। না রাখলে হঠাৎ যদি কেউ এসে পড়ে? গেরস্থ-বাড়ি, দুপুরের হাঁড়িতে ভাত নেই—এর চাইতে লজ্জার কথা আর কী আছে?

রোজ রোজ অবিশ্যি কেউ আসে না। তাতে কী? ভাত কি ফেলা যাবার জিনিস? খোকার মারই তো ঘরে পাঁচটা কুচোকাচা।

সে যাক। বামুনদির নাতি গদাই ছিল শহরের যত গুজবের সংবাদ-সরবরাহক। তো 'গুজব' তো মুহুর্মুহু সৃষ্টি হচ্ছে। এমনিতেই তো কলকাতা হচ্ছে হুজুগের দেশ, গুজবের দেশ, তায় আবার এতোবড় একখানা ঘটনা ঘটে চলেছে!

এই অন্দরের আসরে আর একজন আসতেন, তিনি হচ্ছেন ভুনিপিসি। কী ধরনের পিসি তিনি দীপু-মণিদের, তা ওরা জানে না, তবে এটা জানে 'পিসি' বলে যখন ডাকতে হচ্ছে, তখন পিসির মান্যটা দিতেই হবে। আসামাত্রই প্রণাম করতে হবে, গরমকাল হলে তালপাতার পাখাখানা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে, আর

তাড়াতাড়ি পান সেজে দিতে হবে। বিধবা মানুষ, সহজে কোথাও জল তো খাবেন না। তবে পানে দোষ নেই। চুন নাকি সর্বশুদ্ধ! খোকার মাকে বাসন পরিষ্কারের ব্যাপারে কিছু বললেই বলতো, 'এই চুনের ঘরে বসে বলচি মা, তিনবার করে ধুয়েচি'।

ভুনিপিসিও অনেক রকম গুজবের সংবাদদাত্রী।

মেজবৌ শুনেছ? যুদ্ধ নাকি বোম্বাই পর্যন্ত এসে যাচ্ছে! তবে আর কলকাতায় আসতে কতক্ষণ? অ্যাঁ!

কিন্তু ভুনিপিসির মেজবৌ?

তিনি অম্লান বদনে বলে ওঠেন, আহা, এলে তো বাঁচি। তা আমাদের কপালে কি আসবে?

অ্যাঁ! অবাক করলে যে মেজবৌ, যুদ্ধ কলকাতায় এলে তুমি বাঁচো? বলি তাতে তোমার কী সুরাহা হবে শুনি?

বাঃ, হবে না! যুদ্ধ কখনো চোখে দেখেছি? শুধু তো ইতিহাসের গল্পে পড়া, নয়তো থিয়েটারে দেখা, বেশ চোখের সামনে দেখা যাবে।

নমস্কার বাবা তোমার শখের পায়ে! পাঁচজনায় বলছে, যুদ্ধ এসে গেলে নাকি চালের মন দশ টাকায় উঠবে। তাহলে?

তাহলে আর কী! লোকে কম করে খাবে!

তোমার এইসব অনাছিষ্টি কথা শুনলে হাসবো না কাঁদবো গো! যাকগে, কাপড়ের পাড় রেখেছ আমার জন্যে?

হ্যাঁ, ওই একটা জিনিস রাখতে হয় তাঁর জন্যে। আজীবন তিনি হরদম কাঁথা সেলাই করেন, আর পরিচিতা নারীসমাজ থেকে শাড়ির পাড় সংগ্রহ করে বেড়ান।

তা ভুনিপিসির এই বেড়ানোটায় কিছু বাধা ছিল না। থানপরা বুড়ীদের রাস্তা চষে বেড়াতে কোনো নিষেধ ছিল না। কলকাতার রাস্তায় তখন 'রং' বলে কিছু দেখা যেত না। পুরুষসমাজ আর থানপরা নারীসমাজ, এই শহরের রাস্তার দৃশ্য।

বামুনদি, ঠিকে-ঝিরাও তো ওই একই সাজে সজ্জিত। খোকার মা অবশ্য বুড়ী নয়, তা বলে কি বাসন মাজতে আসবে রঙিন কাপড় পরে? পাবেই বা কোথায়? ভাল গেরস্থবাড়িতেও তো মেয়ে-বৌরা সাদা জমির শাড়িই পরতো। রঙিন ডুরে—এসব হচ্ছে পোশাকী সাজ।

তা না পোশাকী হলেও রাস্তায় তো বেরোত না কেউ?

সেই ভুনিপিসি? হঠাৎ একদিন তুচ্ছ কারণে রেগে গিয়ে আসা বন্ধ করলেন। অথচ কারণটা কিছুই নয়।

ভুনিপিসি বললেন, শুনলে অবাক হবে মেজবৌ, জার্মানীর রাজা আর আমাদের রাজা নাকি আপন মামাতো-পিসতুতো ভাই।

মার দোষ এইটুকু, মা অবাক হলেন না, বললেন, তাতে আর এতো আশ্চয্যি হবার কী আছে?

ওমা! বল কী গো! এই রাম-রাবণে যুদ্ধ চলেছে, কিনা আপন মামাতো-

পিসতুতো ভাইয়ে !

মা হেসে উঠে বললেন, তা অতবড় যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়েছিল, সেও তো ভাইয়ে ভাইয়ে। বরং আরো নিকট-সম্পর্ক। এক ঠাকুর্দার নাতিরা। জগতে অবাক হবার কিছু আছে নাকি ?

এতে যে কী হল কে জানে !

ভুনিপিসির মুখটা অন্ধকার হয়ে গেল। বলে উঠলেন, তোমার সঙ্গে কথা কইতে গেলেই মুখের ওপর থাবড়া ! তোমার মতন তো এতো পণ্ডিত নই যে বুঝে-সমঝে কথা বলব !

চলে গেলেন খরখরিয়ে।

পান ফেলে, শাড়ির পাড় না নিয়েই। আর আসেননি।

পরে দীপু আর মণি অবাক হয়ে বলাবলি করল, মিমিমিছি মাকে দোষ দিলেন ভুনিপিসি। মা কখন ও'র মুখে থাবড়া মারতে গেলেন, অ্যাঁ ! মা অমন বিচ্ছিরী !

যুদ্ধের ধুয়ো নিয়ে মাঝে মাঝে পাশের বাড়ির বসাক-গিন্নীও আসতেন। যাঁদের ছাদ মাড়িয়ে দীপুরা তার পরের বাড়িটায় শিউলি তুলতে যায়।

বসাক গিন্নী কি লোক মন্দ ? তা তো নয়, তবু মা তাঁকে দেখতে পারতেন না। কারণ তিনি পাখি পুষতেন। বাড়ির দাওয়ায় আটকানো লোহার রডে সারি সারি পাখির খাঁচা ঝুলছে।

যারা পাখি পোষে মা তাদের কিছুতেই উঁচু চক্ষে দেখতে রাজী নয়। তা ছাড়া ওই সর্বদা একগাদা গহনা পরে বেড়ানো ! সেটাও নাকি দৃষ্টিকটু।

এদিকে বাসন মাজার লোক রাখেন্ না, গোরুর কাজ নিজে করেন, অথচ গলায় ইয়া মোটা হার, হাতে ইয়া মোটা বালা আর বাউটি না কি ! হাতের ওপরদিকে মোটকা মোটকা অনন্ত, কোমরে সেরখানেক ওজনের বিছে। এই নিয়েই গোরুর খড় কুচোচ্ছেন, ঘুঁটে দিচ্ছেন।

মা বলতেন, দেখলে দুঃখ হয়। ভগবান টাকা দিয়েছেন যেন গায়ে একগাদা সোনা পরবার জন্যে !

তা সেই বসাক-গিন্নীই একদিন একটি গুজোব পরিবেশন করলেন, কর্তা বড়বাজার থেকে শুনে এয়েছেন, এ যুদ্ধু এখনো বছর দু'বছর চলবে ! লোহার দাম নাকি আকাশে উঠবে ! তা উঠলেই মঙ্গল, কী বলেন দিদি ? কর্তার লাভ। বড়বাজারে তো যুদ্ধু আরো জীইয়ে রাখার জন্যে শিন্নী মানছে।

মা গম্ভীর ভাবে বললেন, তা কাদের জিৎ হলে ভাল ?

ওমা, শোনো কথা ! আমদের রাজার হলে ভাল, না তো কি মুখপোড়া জার্মানীদের হলে ভাল ? ওরাই ঝাড়েবংশে নির্মূল হোক।

বসাক-গিন্নীর বাক্যবিন্যাস অবশ্য বেশ তীব্র ভঙ্গীর। তবে মা'র আর কী বলার আছে ?

এই বাড়িতেই তো আর এক ব্যক্তি রয়েছেন, যিনি ওই বাসনাই করছেন। সেই ব্যক্তিটি হচ্ছেন পরম রাজভক্ত প্রজা আমাদের বাবা !

দেখা গেল বসাক-গিন্নীর কর্তার প্রার্থনাই ভগবানের কানে পেঁছে গেছে

এবং কাজও শুরু হয়ে গেছে। যুদ্ধ চলছে লাগাতার। (ভগবানই জানেন বড়বাজারি ঘুষের পরিমাণটি কত এবং কেমন) অতএব অহরহই উদ্বেগ, উত্তেজনা, রোমাঞ্চ।

এমন তো নয় যে, ব্যাপারটা একঘেয়ে হয়ে গেছে বলে লোক ক্রমশঃ 'ও আর কী শুনবো—' বলে হুজুগে কান দিচ্ছে না। হুজুগ যে নিত্য-নতুন। 'যুদ্ধ' তো অষ্টপ্রহর দামামা বাজিয়ে বাজিয়ে নিজের অস্তিত্ব জাহির করে চলেছে। দু'-পক্ষেরই যাকে বলে মরণপণ লড়াই।

এই লড়াইয়ের ফলশ্রুতি অলক্ষিত জগতে, ভাগ্য গড়ে ফেলার লড়াই। আর পথে-ঘাটে, ঘরে-সংসারে লড়াই ভবিষ্যৎ-বাণীর। কে হারবে, কে জিতবে, এই নিয়ে বাজি ফেলাফেলি। পাড়ায় পাড়ায় এক-একটা রকওলা বাড়ির রকে সকাল থেকেই জটলা। একখানা দৈনিক কাগজের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে ডজন দেড় ডজন লোক, এটাই প্রায় দৈনিক দৃশ্য সকালবেলায়।

তা হবে না? ঘরে ঘরে সব্বাই তো আর খবরের কাগজ রাখতে পারে না? তা ছাড়া দরকারটাই বা কী? খবর বৈ তো খাবার নয়, যে অন্যে ভাগ বসাতে এলে কমে যাবে বলে মালিক বিরক্ত হবে? এ তো বরং যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে। মুখে মুখে বাড়তে বাড়তে খবর খাবারের মতই মুখরোচক হয়ে উঠবে। কাজেই পাড়ায় দু চারজন ভদ্রব্যক্তি এবং কোনো কোনো দোকানী কাগজ রাখলেই পাড়াসুদ্দুর কাজ মিটে যায় খবরের। চাষ-আবাদ চলতে থাকে।

'রেডিও' নামক বিশ্বব্যাপী বস্তুটি তো ছিল না? ওই কাগজে প্রকাশিত খবর, মুখে মুখে পল্লবিত হতে হতে, ক্রমশঃ পরিবর্ধিত, পরিরঞ্জিত এবং শেষ পর্যন্ত পরিবর্তিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে শহরের শিরায় উপশিরায়, অতঃপর গ্রামেগঞ্জে।

অতএব 'আকাশবাণী কলকাতা' না থাকলেও কলকাতার আকাশে বাতাসে 'বাণী'র ঘাটতি ছিল না।

ক্রমশঃই এসে যাচ্ছে যুদ্ধের অন্তর্দশা। 'বাণী' ছড়িয়ে পড়ল, যুদ্ধের জয়লক্ষ্মী মানকচুর পাতার উপর দিয়ে রথ চালিয়ে বৃটেনের রাজদেউড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। আর তার ফলে পৃথিবীর তাবৎ মানকচুর পাতার গায়ে সেই রথচক্রের বিদারণ রেখা দেদীপ্যমান হয়ে উঠেছে।

সেই অলৌকিক দর্শনের প্রথম দর্শকটি কে তা অবশ্য কারো জানা ছিল না, তবে ঘটনাটি যে সত্যি এতে তো আর সন্দেহ নেই? বিশ্বাস না হয়, মানকচুর পাতা যোগাড় করে এনে পরীক্ষা করে দেখো!

দীপু-মণিদের বাড়িতেও একদিন এই পরীক্ষাসূত্রে মহাসমারোহে একখানি বিশাল মানকচুর পাতা এসে হাজির হল। অবশ্যই ওই অলৌকিক দৃশ্যের খবরটি যে এনেছিল, পাতার সরবরাহকারীও সে। 'ওবাড়ি'র গোবিন্দদা।

বিজয় পতাকা উত্তোলনের ভঙ্গীতে পাতাটাকে উঁচু করে ধরে নিয়ে এসে বলে উঠলেন, বললে তো তুমি বিশ্বাস করবে না মেজমামী, এখন প্রত্যক্ষ দ্যাখো! বাজারে কাড়াকাড়ি, হুড়োহুড়ি। জন্মে কখনো শুনেছ, পয়সা খরচ করে কেউ মানকচুর পাতা কিনছে? তাই কিনছে লোকে! পয়সায় এক-একখানা। তাও পড়তে পাচ্ছে না।

দালানের মেজেয় পাতাখানা সাবধানে বিছিয়ে ফেলেন গোবিন্দদা এবং আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন, সরু সুতোর মত একটি সাদা রেখা সর্পিল পন্থায় সেই বৃহৎ পাতাটার একদিক থেকে অন্য দিকে চলে গেছে।

গোবিন্দদার মেজমামা, অর্থাৎ দীপুদের বাবা একনজর দেখে বললেন, এরকম দাগ আগে থাকত না নাকি?

গোবিন্দদা ধিক্কারের গলায় বলে উঠলেন, ছি ছি মেজমামা, মেজমামীর আওতায় পড়ে তুমিও যে নাস্তিক হয়ে গেলে দেখছি! বলি থাকতোই যদি তো হঠাৎ এই নিয়ে সাড়া পড়ে গেছে কেন? অ্যাঁ?

দীপু চুপিচুপি বলল, নাস্তিক মানে কী মণিদি?

মণিদি দু'হাত উল্টোলো।

অতএব ছোড়দার শরণ নিতে হয়।

এই তো রোগ দীপুর। হাতের চেটো উল্টে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকতে পারে না সে। 'মানে'টা জানা চাই। যতক্ষণ না জানতে পারবে স্বস্তি নেই।

ছোড়দার কাছে মানে শুনে দীপু আরো অকূল পাথারে। যারা ভগবানকে বিশ্বাস করে না, বলে 'ভগবান' বলে কিছু নেই, তাদের বলে 'নাস্তিক'। তার মানে মা নাস্তিক, আর মা'র সঙ্গে মিশে বাবাও তাই হয়ে গেছেন! রাগে দুঃখে অপমানে দীপুর চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছে হল। চোখ লাল করে গোবিন্দদাকে বলতে ইচ্ছে হল, মা নাস্তিক? জানো ঠাকুর-নমস্কার না করে মা একটা কাজও করেন না! কতদিন কত কী সবের জন্যে মা উপোস করেন! আর বাবা? বাবার তো সব সময় 'মা কালী'! রাস্তায় বেরোবার আগে মা কালীর ছবিকে প্রণাম না করে জুতোই পরবেন না! অথচ তুমি—

দীপুর যা বলে উঠতে ইচ্ছে হচ্ছিল, সেটা মা-ই বলে ফেললেন। হেসে হেসে বললেন, কী গোবিন্দ, কচুপাতায় বিশ্বাসী না হলেই নাস্তিক? তা বেশ, না হয় তাই। কিন্তু জয়লক্ষ্মী কি রথ চালাবার পথ শেষ পর্যন্ত পাবেন? বিলেতে রাজবাড়ির দরজা অবধি মানকচুর পাতা বিছোনো আছে?

গোবিন্দদা ব্যঙ্গহাসি হেসে বললেন, হুঁঃ! তক্কয় কে তোমার সঙ্গে জিতবে বাবা? সাধে কি আর বড়মামী তোমায় মেমসাহেব বলে!

রাগ-রাগ মুখে দুটো বড় বড় পান্তুয়া বাড়তি খেয়ে গোবিন্দদা চলে গেলেন। বোধ হয় বড়মামীর কাছে মেজমামীর মেয়েলিপনার গল্পটা তাড়াতাড়ি বলবেন।

তা গোবিন্দদা আর যাই হোন, এই একটি গুণে দীপুদের মা তাকে সুচক্ষে দেখেন। খুব বেশী বেশী খেতে পারেন এবং লজ্জাটজ্জা করেন না। বেশ দরাজ

গলায় বলতে পারেন, আর গোটাকতক কড়াপাক ছাড়ো তো মেজমামী! ও মেজ-মামী, তোমার ভাঁড়ারে রাজভোগ আর আছে নাকি? থাকে তো আনো। এই তাজু দেখ্ তো, না থাকলে, ছুটে চলে যা।·দোকান তো তোদের দোরগোড়ায়। আর যাস যদি তো আর চারটি হিঙের কচুরীও নিয়ে আসবি।

মা আর বাবা দুজনে অন্য বহুবিধ ব্যাপারেই পরস্পরের বিরোধী পক্ষ, কিন্তু দু-একটি ব্যাপারে সম্পূর্ণ এক শিবিরে। সেই দু'একটির মধ্যে লোককে খাওয়াতে ভালবাসা। এবং 'খাইয়ে মানুষ'দের প্রতি দু'জনেরই পরম ভালবাসা।

তবে মা কিন্তু এ বিষয়ে বেশী খাটতে নারাজ। দোকানবাজার থেকে এনে-টেনে খাওয়াতেই তৎপর বেশী। যার জন্যে ঠাকুমার একান্ত বিশ্বাস এই, মেজ বৌমাটি তাঁর ছেলেটাকে ফাঁসাবে। এবং এরপর ঝুলি কাঁধে নিয়ে 'হরেকেষ্ট' বলে দোরে দোরে ঘুরতে হবে ছেলেটাকে।

কিন্তু কে কাকে ফাঁসায়? বাবার আনা (অবশ্য সবই তো বাবার আনা) ল্যাংড়া আমের সুখ্যাতি হচ্ছে শুনতে পেলে বাবা মাকে নিঃশব্দ ইশারায় জানিয়ে যাবেন, ওকে বসাও, আর চারটি এনে দিচ্ছি। যাব আর আসব।

তা তখন তো আর লোকে এমন অল্পাহারী ছিল না? দশ-বিশটা বড় বড় ল্যাংড়া বোম্বাই আম খেয়ে ফেলা এমন কিছু ব্যাপার ছিল না। দীপুদের একজন পিসেমশাই (পিসেমশাই তো অনেক, তাঁদের মধ্যে একজন) বাজি রেখে একাসনে বসে পঞ্চাশটা বড় বোম্বাই সাবাড় করে ফেলতেন।

তা তাঁর এই পারাটাকে তাঁর শ্বশুরবাড়ির সবাই কি আর সমান উৎসাহের চোখে দেখত? তা ঠিক নয়। এ বাড়িতেই ছিল উৎসাহের হাওয়া। আলাদা আলাদা সংসার পাতার মুক্তির আনন্দও তো এইখানেই।

যুদ্ধের বোমারু হাওয়া বাজারে আগুন ধরিয়েছে বলেই কি আর এসবে খামতি হচ্ছে? হতে পারে কলকাতা শহরে ষোলো লক্ষ লোকের বাস, তেমনি বাজারও যে প্রাণ-ভরা-ভরা। কম তো আর পড়বে না।

কলকাতায় যে ষোলো লক্ষ লোকের বাস, এ তথ্য খোকার মা'র।

ঘর মুছতে মুছতে, মাছ কুটতে কুটতে সে চোখ গোল করে বলত, কলকেতা কি সোজা শহর মা? ষোলা লক্ষ নোকের বাস এখেনে। কী ভয়ংকরী ভাবো!

ভবিষ্যতের কলকাতায় ওই 'ভয়ংকরী' সংখ্যাটি যে স্রেফ হাস্যকর হয়ে যাবে, এমন ধারণা তো ছিল না খোকার মা'র। তাই ওই সংখ্যাটা নিয়ে গৌরব করে, মাকে অবহিত করাবার চেষ্টা করত। কলকাতার মহিমা যেন খোকার মা'রও মহিমা। কারণ খোকার মা 'কলকাতার মেয়ে'। সুতোনুটি নয়, গোবিন্দপুর নয়, একেবারে খাস কলকাতার। মাঝে মাঝে অবজ্ঞা করে বলতো, খোকার বাপের কথা ছাড়ান দাও গো মা, ও তো গেরামের ছেলে। এখেনের হালচাল বোজে?

যদিও খোকার বাপের সেই গাঁ থেকে আসাটা মায়ের কোলে চেপে। অভাবের জ্বালায় বিধবা মা গ্রাম থেকে চলে এসেছিল কলকাতায়, রুজি-রোজগারের চেষ্টায়। তবু খোকার মা তার বরকে গাঁ-গেরামের ছেলে বলে অবজ্ঞা করতে ছাড়ত না।

দীপুদের মা হেসে বলতেন, কলকাতায় যে ষোলো লক্ষ লোকের বাস, একথা তোমায় কে বলেছে খোকার মা ?

অ মা ! বলবে আবার কে ?

খোকার মা গালে হাত দিয়েছে ।

এসব কতা কি আর কারুর অজানা মা ? কলকেতার বাতাসই সবাইকে সব কিছু জানিয়ে দিয়ে যায় । বিলেতের ঠিক পরের শহোরই যে কলকেতা এ খবর কে না জানে গো ? কলকেতা শহোরে যে সকোল তত্ত্বোকতাই হাওয়ায় ভাসছে । আপনিই বোধবুদ্ধিতে সেঁদিয়ে যাচ্চে ।

তা অ খোকার মা, কলকাতাটা কিসে বিলেতের ঠিক পরেই গো ?

শোনো কতা ! কিসে নয় ? তোমাদের পাঁজিপুঁতিতেই তো নিকচে, 'যা আচে ভুভারতে, তা আচে কলকেতাতে' । তা' নইলে আর বলেচে কেন, 'কল' আর 'কেতা', এই নিয়ে কলকেতা !

তা' শুধু মুখ্যুসুখ্যু খোকার মা কেন, কলকাতা সম্পর্কে তো এমন মোহ অনেকেরই । কলকাতা এক অলৌকিক 'কল্পবৃক্ষ', ওর তলায় গিয়ে হাতটা একবার পাতলেই হলো ! পেয়ে যাবে প্রার্থিত ফল । অথবা কলকাতা সেই স্বর্গীয় কামধেনু, যাকে দোহন করলেই দুধ ! অফুরন্ত অনন্ত । যে যেথায় আছো জীবন-মরণে, যখনই যে সমস্যায় ঠেক খাবে, চলে যাও কলকাতায় । সমাধান অবশ্যম্ভাবী ।

তা সেই তামাদিকাল থেকে একাল পর্যন্ত 'কলকাতা' সম্বন্ধে সেই মোহ কি ঘুচেছে লোকের ? এক ধার থেকে 'দুঃস্বপ্ন নগরী' কলকাতার নিন্দেমন্দয় পঞ্চমুখ, নিত্যনতুন বিশেষণ—'দুর্দশানগরী', 'দুর্গন্ধনগরী', 'দুর্ভোগানগরী,' দুঃসহনগরী' ইত্যাদি ইত্যাদি, আবার এক ধার থেকে আসমুদ্রহিমাচল এই ভারত খণ্ডটি থেকে যাবৎ জন যে যেমনে পাচ্ছে কলকাতায় ছুটে আসছে । এসে শেকড় গাড়ছে । নড়বার নামটি করছে না । কারণ এইহতশ্রী হতভাগ্য ক্ষতবিক্ষত কলকাতা আজও কামধেনুর ভূমিকায় ।

আর জন্মসূত্রে আর জন্মস্বত্বে যারা কলকাতায় ? তারা ?

তারাও হরবখৎ কলকাতাকে গাল পাড়ছে, 'পালাই পালাই' করছে । ভারতের অন্য অন্য প্রান্তের সুন্দর সুন্দর শহরগুলির গুনকীর্তনে দশানন হচ্ছে । কিন্তু খোঁজ নিলেই দেখা যাবে বাবুরা ভয়ে কাঁটা হয়ে আছেন ওই বুঝি কলকাতা থেকে বদলী করে দেয় । বদলীর ভয়ে হরির লুঠ মানা, শিন্নি চড়ানো, মা কালীর দোরে ধর্ণা । 'প্রমোশন' শব্দটা যেন গোলাপে কণ্ঠকতুল্য !

ভাগ্যচক্রে যাদের যেতেই হচ্ছে কলকাতা ছেড়ে ? হয়তো তারা ঠাঁই পেয়েছে কোনো স্বর্গীয় সুষমাময় জায়গায় । তারও মনপড়ে আছে এই হাড়গোড়-বারকরা কলকাতা । ছুটি হলে আর কোথায় যাব কলকাতা ছাড়া ? আর কর্মঅন্তে অবসরকালে আর কোথায় থাকতে যাব কলকাতা ব্যতীত ? সময় থাকতেই এখনও তাই সল্ট লেকে জমি কিনে রাখা, এখানে সেখানে খোঁজাখুঁজি, ভবিষ্যৎ

ফ্ল্যাটের জন্যে দাদন দিয়ে রাখা। ইঁট গাড়বার আগেই নাম গেড়ে রাখা।

কলকাতার জলের এমনি গুণ,
বোবার ফোটে বোল।
ক অক্ষর গোমাংস, সেও খোলে টোল।

আবার—

কলকাত্তাই বাবু, পেটে খান সাবু,
ট্যাঁক অষ্টরম্ভা, ধুতির কোঁচা লম্বা!
চড়েন বাবু ছ্যাকড়াগাড়ি,
তবু পায় পম্পসু, মাথায় টেড়ি।

এই সবই যে কলকাতার অন্তঃসারশূন্যতার সমাচার, তাতেও তো সন্দেহ নাস্তি! অথচ? হ্যাঁ, অথচ ওইখানেই মজা!

এসব সাদা চলতি ছড়াটড়া সরবরাহের বেশীর ভাগ একটা প্রতিষ্ঠান ছিল। যার নাম নাকি বটতলা। সেখান থেকে পাঁজির কাগজের মত পলকা কাগজে বই বেরোতো পয়সা পয়সা। এবং সে বইয়ের ফেরিওয়ালা প্রায়শঃই সন্ধ্যের মুখে, যখন গ্যাসবাতি জ্বালানেওয়ালারা লম্বা মই ঘাড়ে করে পথে বেরিয়েছে, তখন কোনো এক রাস্তার মোড় থেকে আচমকা হাঁক পেড়ে উঠত, 'ঘরজামাইয়ের এমনি গুণ, শাওড়ী-শালী জোড়াখুন।'

অথবা—

ষাট-বছুরে বুড়ো বর, ছাঁদনাতলায় খেলেন চড়।
বৌ পালান হাঁসখালি
বরের মুখে চুনকালি।

শহরে দৈনিক যেসব ঘটনা ঘটছে, তা থেকে বাছাই করে 'মারকাটারি' দু-চারটি খবর ছেঁকে তুলে নিয়ে এই সান্ধ্য-সংস্করণ! সন্ধ্যের মধ্যেই বিক্রীবাটা শেষ!

পুজোর মুখে হাঁক শুনতে পাওয়া যাবে পুজো-ঘেঁষা ঘটনা নিয়ে—

এবার পুজোয় বিপদ ভারী
বৌ চেয়েছে ঢাকাইশাড়ি!
তত্ত্ব যাবে বেয়াইবাড়ি,
মোতিচুর চাই বাইশ হাঁড়ি।

অবশ্যই অতি-অতিরঞ্জিত। তবু ওই হাঁকটি পাড়ালেই হল। নড়ল লোকের টনক।

তাৎক্ষণিক কবিতার এই কবিদের নামটাম জানার উপায় ছিল না, কারণ নামটাম থাকত না। তবে কিছু কিছু প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিকে যে ওই বটতলা কোম্পানী কব্জা করে রেখেছিল তা নিশ্চয়। তা নইলে দুপুরে ঘটা ঘটনার 'সংবাদ-নির্যাস' সন্ধ্যের মধ্যে ছেপে বেরিয়ে বিলি হয়ে যায়?

লড়াইয়ের যখন রমরমা, তখন ঝপাঝপ বেরিয়ে পড়ত লড়ুয়ে ছড়া—

সে সব ছড়ায় ধরি মাছ না ছুঁই পানি ভাব ? কিন্তু যেদিন থেকে মানকচুর পাতায় লড়ুয়ে লক্ষ্মীর জয়রথ-চক্রের রেখা দেখা গিয়েছে, সেদিন থেকে পানি ছুঁয়েই মাছ ধরা হতে শুরু হয়েছে। এখন পথের মোড়ে হঠাৎ আওয়াজ পরিবেশকে সচকিত করে তুলছে—

ইংরেজ জারমান জোর কামান,
জারমান ভায়া লবেজান !
এবার বুঝি খাবি খান।

ভারতেশ্বরের বাজিমাৎ
জারমান দাদা কুপোকাৎ !

কিন্তু ভারতেশ্বর যে আর একদিকে কুপোকাৎ হতে বসেছেন। বছর চারেক ধরে লড়াইয়ের খরচ যোগাতে যোগাতে রাজকোষ ফতুর। অতএব দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার 'সমর ঋণ ! 'সমর ঋণ !'

এ নিয়ে দীপু মণি ফুলি এবং ক্ষুদে ভাইটাও ক্যালেণ্ডারের নিয়মে যে এখন আর নেহাৎ ক্ষুদে নয়, দারুণ উত্তেজিত। কারণ বাবা ওই 'সমর ঋণ' বাবদ মস্ত একখানা ছবি আঁকছেন—রঙিন ছবি। ছাপা হয়ে নাকি রাস্তার দেয়ালে দেয়ালে সাঁটা হবে। এ একটা উত্তেজক ঘটনা অবশ্যই এক গণ্ডা ভাইবোনের কাছে। প্রায় একটি দশকের মধ্যেই যাদের জন্ম।

তাদের নিজস্ব সংলাপ, জানিস, বাবা এ ছবির জন্যে কিছু দাম নেবেন না।

জানি। কেন নেবেন ? ওইটা তো রাজার কাজ। আর বাবা তো খুব রাজভক্ত।

মা কেন রাজভক্ত নয় রে ?

ভগবান জানেন।

ছবিটা কী চমৎকার হয়েছে দেখছো ?

তা হবে না ? বাবার হাত !

তা অবশ্য সত্যি। বাবার তো ছবি আঁকারই হাত। ছবি আঁকাই তো পেশা মণি-দীপুদের বাবার। তবে পেশা ছাড়া নেশাও। ইচ্ছেমত কত ছবিই তো আঁকেন সকালে সন্ধ্যেয়। এই যে 'ভারতবর্ষ'' মাসিকপত্রটা ফী মাসে অমনি অমনি আসে দীপুদের বাড়িতে, তার প্রথম মলাটটা বাবা এঁকে দিয়েছিলেন বলেই না ?

এক এক সময় বাবার মহিমা ভেবে অবাক হয়ে যায় ওরা। বাবা এতরকম কাজ করার সময় যে কী করে পান ! অফিসে তো ছোটেন সাড়ে আটটায়। অথচ তার মধ্যেই বাবার এই সব শখের কাজগুলির চর্চা চলে। হারমোনিয়ম বাজানো, ছবি আঁকা, ছোট্ট সেই সাধের কার্পেণ্টার বক্সটি থেকে ক্ষুদে ক্ষুদে যন্ত্রপাতি বার করে সুন্দর সুন্দর কাঠের জিনিস তৈরী করা। লাল-লাল গোল-গোল

গালার পাত কিনে এনে গ‍ঁড়িয়ে স্পিরিটের বোতলের মধ্যে দ'তিন দিন ফেলে রেখে, পালিশ তৈরী করে বাড়ির সব প‍ুরনো আসবাবপত্তর পালিশ করা। তবে পালিশের আগে শিরিষ কাগজ ঘষার দায়িত্বটা ছিল দাদাদের। কারণ বাবাকে তো আবার বাজারেও যেতে হয়।

ঘড়ির কাঁটা ধরে এই সব শখের কাজের চর্চা বাবার।

বাবা আর মা, দ‍ুজন যেন দ‍ুটি পরস্পরবিরোধীর প্রতীক। বাবা সব সময় ধীর স্থীর, 'ব্যস্ততা'র কোনো প্রকাশ নেই। অথচ কত রকম যে কাজ করে চলেন। হয়তো দেয়ালে টাঙানো ছবিগ‍ুলোই নামিয়ে আবার নতুন করে বাঁধাতে বসলেন, ফাইন ফাইন ফ্রেমের মত সর‍ু কাঠ কিনে এনে, তারপর তার্পিন তেলে সোনালী গ‍ুঁড়ো মিশিয়ে, সর‍ু মোটা তুলি দিয়ে ফ্রেমদের সোনালী করে ফেলা। না, বাবার কাজের ফিরিস্তি দেওয়া শক্ত। ঠুকঠাক খ‍ুটখাট চলছেই। অথচ সবই অফিসের দিনের সকাল-সন্ধ্যেয়। ছ‍ুটির দিনে তো আছে মাছ ধরা, তাস খেলা, পাশা খেলা। অথচ অফিসে যাওয়া ঘড়ির কাঁটায়। সাজসজ্জা নিখ‍ুঁত।

আর মা? মা সদাই ব্যস্ত। সর্বদাই হাঁপাচ্ছেন। সাজসজ্জার বালাই নেই। শৌখিন কাজের ধার ধারেন না মা। কুটনো কোটা, ভাঁড়ার বার করা—এসব কাজও আস্তে আস্তে বাম‍ুনদির বিভাগে চলে-গেছে।

তা যাবে না, কী হবে? সময়ের সিংহভাগ তো অন্য কাজে ব্যয় হয়। মা'র কাছে ওই কাজগ‍ুলো তো গৌণ। ম‍ুখ্য হতো—বই পড়া, খবরের কাগজ পড়া। এই ম‍ুখ্য ব্যাপারেই যে মা'র 'সর্বসময়' নিয়োজিত। অতএব বাকি সময়টা হাঁফানো ছাড়া গতি কী? গোটাছয়েক ছেলেমেয়ে এবং কর্তা গিন্নী ও ভৃত্য সম্বলিত সংসারটা তো কম নয়? যতই 'গৌণ' ভাবা হোক, কিছ‍ুটা পাওনা তো সে আদায় করে নেবেই? তা ছাড়া আলাদা বাসা করার দোষে অথবা গ‍ুণে, বাড়িতে আত্মীয় সমাগম তো লেগেই আছে। সকলের কৌতূহল, 'কেমন চলছে, কেমন চালাচ্ছে।'

এছাড়া মা'র কলকাতায় থাকা মেস-প্রবাসী জামাইটিকে তো ডাকতেই হয় নিত্য। ভালবাসা এবং চক্ষ‍ুলজ্জা দ‍ুইয়েরই দায়। এইসব দিনগ‍ুলিতে বাবা মনের আনন্দে যত ইচ্ছে বাজার করে এনে জড়ো করছেন, আর মা সে-সব দেখে যত পারছেন হাঁফাচ্ছেন। কিন্তু আশ্চর্য! মা'র হাতের রান্নাটি ছিল উৎকৃষ্ট। তবে সে রান্নার স্বাদ পাওয়ার ভাগ্য শ‍ুধ‍ু ওই 'জামাইবাব‍ু' আসা বা লোক-নেমন্তন্নর দিনটিতে। বাকি দিনে তো বাম‍ুনদিই আছেন। আর দৈবাৎ কোনদিন এক-আধ বেলা তাঁর অন‍ুপস্থিতি ঘটলে?

কেন, খাবারের দোকানগ‍ুলো আছে কী করতে? তাদের কাছে কচুরী আল‍ুর-দম নেই? প‍ুরী তরকারি নেই? রামলালের দোকানের ছ'আনা সেরের রাবড়ি নেই? পয়সায় দ‍ুটো রসগোল্লা? এ কি একাল যে লড়াইয়ের ছ‍ুতোয় বাজারের জিনিস উধাও হয়ে যাবে?

রাম বলে, ব‍ুজলে ফুলি দিদিমণি, বাম‍ুনদি কামাই করলে! আমি মনে মনে হরিরল‍ুট দিই! কত সব ভালমন্দ খাওয়া হয়!

এমন মুক্তজীবন কি একান্নবর্তী সংসারে সম্ভব ?

দীপুদের মাসীরাই তো এসে গালে হাত দেন এবং তাঁদের সব-ছোট বোনটিকে অকর্মা, 'উড়নচণ্ডী' বলে গাল পাড়েন। কিন্তু সেসব কিছু গায়ে মাখেন না মা। যেমন বাবা গায়ে মাখেন না বাবাকে কেউ 'ফুলবাবু' বলে ঠাট্টা করলে।

অন্যরা তো বটেই, মাও তো করছেন সর্বদা।

একসঙ্গেই তো সবাই মানুষ হচ্ছে, পর পর তিনটি বোনের ভাবনার জগৎও তো প্রায় একই, তবু দীপু নামের উদোমাদা মেয়েটার চোখের সামনে কেমন করে যেন প্রায় এক-একটা অদেখা সত্য উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। দীপু দেখতে পায় বাবার ফুলবাবুত্ব নিয়ে আর বহুবিধ 'হবি' নিয়ে মা'র অহরহ অনুযোগ অভিযোগ ধিক্কার। অথচ মায়ের এই উড়নচণ্ডীপানা আর কাজে ভীতি দেখে বাবার মুখে লেশমাত্রও অনুযোগ নেই। মা'র একমাত্র 'হবি' বই পড়ার রসদদারটি আর কে ? বাবা ভিন্ন ? হাতে করে এনে না দিন, আনার পিছনে 'গোনা' নামক ব্যাপারটি তো বাবার পকেট থেকেই ? বাবা তো কোনোদিন বলে ওঠেন না, দুটো লাইব্রেরীতে ভর্তি আছো, আবারও একটা লাইব্রেরীর খোঁজ কেন ? বাজারে যত 'কাগজ' বেরোবে, সবই কিনতে হবে কেন ? নাঃ—এসব কখনো বলতে শোনেনি দীপু বাবাকে।

তাই এ প্রশ্ন দীপুর মনের মধ্যেই জমা থাকে। প্রাণের প্রাণ মণিদির কাছেও ব্যক্ত করে না। কারণ ? কারণটা অদ্ভুত। এই অলক্ষিত সত্যটা চোখে ধরা পড়লেও, আর বাবাকে খুব বেশী ভালবাসলেও দীপুর মনে হতো, মা যেন বাবার থেকে অন্য এক উঁচু জগতের মানুষ।

তবে ? একথা কি মুখ দিয়ে বার করবার ?

দীপুর মনের মধ্যে যেন একটা প্রশ্নের গাছ পোঁতা আছে। সে গাছে সর্বদাই 'কেন ? কেন ?' আর 'মানে কী ?' এইরকম পাতা গজাচ্ছে, শাখাপ্রশাখা, বার হচ্ছে।

আর দীপু অবাব হয়ে গিয়ে দেখে মাঝে-মাঝেই দীপু নিজে-নিজেই সেই প্রশ্নের উত্তরগুলো পেয়ে যাচ্ছে। এ এক আশ্চর্য বিস্ময়! কখনো কখনো ভাবে দীপু, এরকম গাছ কি সকলের মনের মধ্যেই পোঁতা থাকে ? সকলেই দীপুর মত ওই 'কেন'র জ্বালায় অস্থির হয় ? কে জানে ? আর অনবরতই উত্তরগুলো খোঁজে। আর খুঁজতে খুঁজতে কিছু একটা পেয়েও যায়।

'সমর ঋণে'র ছবিটা কে ছাপলো, কখন ছাপলো, সেটা জানা নেই দীপুদের। তবে দেয়াল-জোড়া ক্যালেণ্ডারের সাইজের সেই মস্ত মস্ত পোস্টার-গুলোকে দীপুদের পাড়ার সব বাড়ির, এমন কি 'চালকল' আর 'তেলকলের' দেয়ালেও সাঁটা হয়ে যেতে দেখা গেল রাতারাতি।

তবে আসল ছবিটার মত 'সুন্দর রং'এর নয়। লাল কালো হলদে ছাপ ছাপ গোছের।

ছবিটির চেহারা এই, ভারতবর্ষের মানচিত্রের রেখার মধ্যে রূপায়িত 'ভারত-

মাতা'র মূর্তি। উড়ন্ত আঁচলের রেখায় রেখায় মানচিত্রটি ঠিক বজায় আছে।

দেবীর বাম হাতে লক্ষ্মীর ঝাঁপির মত একটি ঝাঁপি, ডান হাতটি প্রার্থীর ভঙ্গীতে প্রসারিত। উঁচু মঞ্চে দাঁড়ানো এই দেবীর পায়ের নীচে এক সর্বভারতীয় মিছিল। সবাই ঊর্ধ্বমুখী, আর উঁচু করে তোলা ডান হাতে এক-একটি টাকার তোড়া। যেন 'আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান' গোছের ভঙ্গী! পোশাকের পরিচয়ে বোঝা যাচ্ছে, এ মিছিলের সামিল ভারতমাতার প্রতিটি প্রদেশের পুত্ররা। এবং সর্বধর্ম সমন্বয়ের এক উদার পরিবেশ।

শহরের দেয়ালে দেয়ালে দীপুদের বাবার আঁকা ছবি! ভেবে বেশ গর্ব-গর্ব লাগছে এদের। আরো রোমাঞ্চ যখন দাদারা এসে বললেন, 'আমাদের ইস্কুলের দেয়ালেও মেরেছে!' এবং আরো রোমাঞ্চ, যখন জানা গেল—'গুহদের কালীবাড়ির গায়েও সেঁটেছে গো!'

অবশেষে একদিন লড়াই শেষ হল।

শহর জুড়ে নাকি উচ্ছ্বাস আর উল্লাসের বন্যা বইলো। কালীমায়ের মন্দিরে নাকি ভীড়ে ভীড়াক্কার! যেখানে যত দেবমন্দির আছে, গাদা গাদা পুজো পড়ছে। শোনা যাচ্ছে শহর জুড়ে দেওয়ালীর মত আলোকসজ্জা হবে।

তা শোনা যাওয়া কেন, দেখাই গেল।

দীপুদের মহোৎসাহী এবং করিৎকর্মা বাবা এক অভিনব সজ্জা আবিষ্কার করে ফেলেছেন। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পীজবোর্ড এনে মস্ত একটা 'ক্রাউন' বানিয়ে ফেলে নিখুঁত করে লাল সালু কেটে কেটে তাতে আঠা দিয়ে মেরে একতলা বাড়ির ন্যাড়াছাতের সামনের আলসের ঠিক মাঝখানে, ইটের মঞ্চ গেঁথে, সেই ক্রাউনকে স্থাপন করে, তার পিছনে এক সরু বাঁশের আগায় টাঙিয়ে দিলেন বৃটিশ ফ্ল্যাগ। আর কাগজের শিকলি বানিয়ে বাড়ি ঘিরে ফেললেন।

তা বাবার কাছে এসব কাজ তো কিছুই নয়। মাথার মধ্যে পরিকল্পনা, টুকটাক জিনিস এনে বোঝাই করা। এবং কাঁচি-ছুড়ি, ময়দার আঠা, গঁদের আঠা নিয়ে বসে পড়া। ব্যাস!

সন্ধ্যা হতেই সেই মুকুটের কারুকার্যের ফোকরের পিছনে পিছনে জেলে দেওয়া হল মোমবাতি। আর ছাদের আলসে জুড়ে দেওয়ালীর দিনের মতই দীপমালা। সকাল থেকেই তো সলতে পাকানো আর প্রদীপে তেল ভরা চলছে। এ কাজে বাবার ছেলেমেয়ে সবাইকেই নেওয়া হয়েছে।

রাস্তায় বেরিয়ে পিছিয়ে পিছিয়ে বাড়িটাকে দেখল দীপু মণি ফুলি এবং ছোট ভাই। ইস, কী সুন্দর! পাড়ায় আর কাদের বাড়িতে এমন? লাল শালু মোড়া মুকুটের ওপর রাত্রে আবার লাগানো হল লাল রাংতা। সামনে পিছনে আলো। সে এক আশ্চর্য দীপ্তি!

কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই হঠাৎ ঘটে গেল এক দুর্ঘটনা। বড় দুঃখের। বড় মর্মান্তিক। বাতাস লেগে মোমবাতির শিখা কেঁপে দাউদাউ করে জ্বলে উঠল রাংতা, শালু পীজবোর্ড। তার সঙ্গে খানিক খানিক কাগজের শিকলি। টের পাওয়ার পর জল ঢেলেও বাঁচানো গেল না অত পরিশ্রমে তৈরী মস্ত মুকুটটাকে।

ফুলি আর ছোট ভাই তো কেঁদেই ফেলল। অন্য ভাইবোনেদের বাবার কষ্ট ভেবে প্রাণ ফেটে যাচ্ছে। আর এই মহামুহূর্তে কিনা দীপুদের মা বলে উঠলেন, ঠিক হয়েছে, বেশ হয়েছে, ভাল হয়েছে!

ভাল হয়েছে? মা, কী বলছ তুমি?

দাদার এই উত্তেজিত উক্তিতেও মা নির্বিকার ভাবে বললেন, ঠিকই বলছি! লজ্জার চিহ্ন, কলঙ্কের চিহ্ন ঘুচে পুড়ে গেল, এটা ভগবানেরই খেলা!

মা'র বড় ছেলে ভুরু কুঁচকে বলে উঠলো, লজ্জার কলঙ্কর মানে?

মা গম্ভীরভাবে বললেন, মানেটা যদি নিজে নিজে বুঝতে না পারিস, বললেই কি বুঝতে পারবি? যাদের পদানত হয়ে পড়ে থাকতে হয়েছে, তাদের জয়গৌরবে দু' হাত তুলে নাচতে তোদের লজ্জা হচ্ছিল না?

বড় ছেলে রাগের চোটে বোকার মত বলে উঠল, আর যখন 'বড়দিনে' এ বাড়ি সাজাতে নিজেই কাগজের ফুল-শিকলি তৈরি করো! তাতে কিছু হয় না?

কথাটা যে বোকার মত হল তা এই ছোটগুলোরও মনে হল। মা'র মুখে একটু ব্যঙ্গহাসি ফুটে উঠল, বললেন, তোমার বোধ-বুদ্ধিটা আর গণ্ডি ছেড়ে বেরোল না!

সব সময় বই পড়ে পড়ে মা'র কথাগুলো যেন একটু বই-বই। বড় মাসীমা এলেও বলেন, তোর কেতাবী ভাষা রাখ্ তো সরস্বতী!

ছোড়দাও এখন বলল, সেটা আর এটা এক হল দাদা? যীশুখৃষ্ট তো পৃথিবীর সকলের। সত্যিই তো, আমরা তো পরাধীন!

তবু ছাদের ওপরকার সেই ভস্মীভূত সৌন্দর্য, আর বাবার প্রাণপাত পরিশ্রমের কথা ভেবে দীপুর মাকে বড্ড নিষ্ঠুর মনে হলো। এতোই যদি, আগে বারণ করলেই পারতেন!

ফুলিরও বোধ হয় মাকে নিষ্ঠুর মনে হল, তাই সে কাঁদো-কাঁদো গলায় চেঁচিয়ে উঠল, আর বাবার কষ্টটা বুঝি কিছু না?

মা তেমনি অম্লান গলায় বললেন, তা আমি তো আর পুড়িয়ে দিতে যাইনি! দিয়েছেন ভগবান। তাঁকেই বকগে যা।

আওয়াজটা উঠল ভরদুপুরে।

দুম দুম! ঠক ঠক! ঠন ঠন, দুম দুম!

বাড়ি ছাড়িয়ে পাড়া সচকিত করে তুলছে এই শব্দ। খানিকক্ষণ আগেও রান্নাঘর খাবারঘরের থালা বাসন হাতা খুন্তি নাড়ার পরিচিত টুকটাক শব্দরা জানিয়ে দিচ্ছিল, এবেলার মত হাড়ি-কড়ার ছুটি মিলল। তারপর কিছুক্ষণ নিত্য-নিয়মিত দ্বিপ্রাহরিক স্তব্ধতা নেমে এসেছিল সংসারলীলার ওপর, ছেদ পড়েছিল সংসারচক্রের আবর্তনধ্বনির। যেটা বিকেল চারটে নাগাদ আবার শুরু হয়। কিন্তু আজ সহসা দুপুরে নিঃশব্দতার ওপর ওই দুমদুম, ঠকঠক, ঠনাঠন! হামানদিস্তের চালু কারবারের শব্দ।

পাশের বাড়ির কেউ কেউ বলল, কী রে বাবা, কেউ কোথাও কবরেজখানা খুলল নাকি?

বসাক-বাড়িতেই শুধু খাওয়াদাওয়া মিটতে দুপুর গড়িয়ে বিকেলে পৌঁছে যায়। তাই কিছুক্ষণ একটানা শব্দ শোনার পর, একগাল পানঠাসা মুখে জড়িত গলায় অলক্ষিত কোথাও থেকে ডাক দিলেন, অ মণি দীপু, এ শব্দ কোথা থেকে আসছে রে?

দু'দেয়ালের মাঝখানে জানলাটানলা নেই, ফাঁকফোপর ঘুলঘুলিও কিছু নেই, তবু ছাতে ছাতে ঠেকানো বলেই বোধ হয় হঠাৎ কথা কয়ে উঠলে অপর দিকে শোনা যায়।

মণি দীপু কথা বলল না।

কিন্তু 'বলল না' বললেই তো হলো না। প্রশ্নকর্ত্রী কি এক কথায় ছাড়বেন?

বার-দুয়েকের পর অগত্যাই মণির অনিচ্ছুক কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হল, আমাদের বাড়িতেই!

অ মা! কেন? কী হচ্ছে? ওষুধ কোটা?

না। মা লোহাচুর গুঁড়োচ্ছেন?

অ্যাঁ! কী গুঁড়োচ্ছে মা?

এবার আরো অনিচ্ছুক কণ্ঠস্বর, বললাম তো? লোহাচুর!

লোহাচুর! সেটা আবার কী! কোন্ কম্মে লাগে?

এটা ঠিক প্রশ্ন নয়, স্বগতোক্তি, কাজেই উত্তর দেবার দায় বর্তাল না। নীচু গলায় পার্শ্ববর্তিনীকে বলল, দেখছিস কী বোকা? লোহাচুর জানে না!

দীপু তাচ্ছিল্যের গলায় বলল, কী-ই বা জানে ওরা গাদা গাদা খাওয়া ছাড়া!

কিন্তু এটা দীপু-মণির নিকটতম প্রতিবেশীর প্রতি অবিচারই বলা যায়। এ পাড়ায় ক'জনই বা জানে লোহাচুর কোন্ কর্মে লাগে! কোন্ কর্মে লাগে শিলে ফেলে খসখসিয়ে গুঁড়োনো সোরা, একটা বাতিল শিলে মিহি করে গুঁড়োনো গন্ধক, আর রীতিমত কায়দা করে মাটির হাঁড়ি চাপা দিয়ে পোড়ানো কাঠের ফাইন কাঠ কয়লাদের মিহি করে গুঁড়িয়ে, পাতলা ন্যাকড়ায় ছেঁকে রাখা 'কাঠকয়লা-গুঁড়ো'।

মনে হয় দীপু দীপুদের বাবা ভিন্ন পাড়ায় আর কেউই জানে না। জানলে অন্য অন্য বাড়ি থেকেও তো শব্দের আভাস পাওয়া যেতো।

অন্য অন্য বাড়ির কর্তারা জানেন, কালীপুজো বা দেওয়ালীর দিন বাজার থেকে বাজিটাজি কিনে এনে ছেলেমেয়েদের দিতে হয়। চীনেপটকা, ধানি-পটকা, ফুলঝুরি, রংমশাল, লাল-নীল দেশলাই, এই সব।

তা সেসব দীপু-মণিদের বাবাও যথেষ্টই জানেন। আনেনও অনেক। কিন্তু আসল জিনিসটি কি? বাজির রাজা তুবড়ি! সে কি আর বাজার থেকে কিনে আনা যায়? এ পাড়ায় তো কই দোকানে মেলে না! আর মিললেই কি মন উঠত? তাঁর বানানো তুবড়ি তো প্রতিযোগিতায় নামতে যাবে। কাজেই মাল-মশলা নিখুঁত হওয়া দরকার। উচ্চমানের 'মশলা' ফরমুলা অনুযায়ী নিক্তি করে মেপে, লোহাচুরকে 'ছোট দানা' 'বড় দানায়' বিভক্ত করে তুবড়ির মাপ অনুযায়ী

মিশিয়ে তুবড়িদের ভরতে বসা। ভয়ংকর নিষ্ঠা। যেন সত্যিই ওষুধ বানানো হচ্ছে।

তা এই নিষ্ঠার মদতদার আর কে হবে মা ভিন্ন? কাজের লোকদের (তখন অবশ্য ওরা এই ভাষাটা জানত না। 'ঝি-চাকর' এমন একটা অভব্য ভাবেই অভিহিত করা হোত।) দিয়ে করালে ঠিকমতো হবে নাকি?

বাবা অপর কারো প্রতি ভরসা রাখতেন না মা বাদে। বারুদ প্রস্তুতকারী চূর্ণগুলির মিহিত্বের তারতম্য ঘটলেই তো তুবড়ির গৌরবের বারোটা বেজে যাবে!

ফুলকির জৌলুস, ঝাড়ের বিশালতা, উচ্চতার মাপ, সবকিছুই তো অংক-কষা। তুবড়ির পোয়া খোল,-ছটাকী খোল, উড়ন-তুবড়ি, সবাইয়ের আলাদা আলাদা সংক্রান্ত। এ অংক দীপুদের মায়েরই নিখুঁত জানা।

যদিও মর্মক্ষেত্রে দু'জনে দুই শিবিরের বাসিন্দা, কিন্তু কর্মক্ষেত্রে দু'জনের একাসনে স্থিতি।

এমনিতে বাড়িতে সর্বদাই পরস্পরবিরোধী দুটো হাওয়া বইছে, 'বাম দক্ষিণ' শব্দটা তখন চালু ছিল না, বলা যায় 'পূব পশ্চিম'। বিপরীত এই দুই হাওয়ার লড়াইয়ের মধ্যে দীপুদের বেশ মজাতেই কাটতো। 'মজা'ই। কারণ হাওয়ার লড়াই তো শূন্যে, উলুখড়দের ওপর কোন চাপ পড়ার কথা নয়।

বিপরীত এই দুই হাওয়ার ধারক বাহক যুগলের একজন যদি ঘোরতর বিদেশ ঘেঁষা, তো অপরজন কট্টর স্বদেশী।

একজনের মতে, মেয়েদের জন্যে লৌহযবনিকার অন্তরালটাই হচ্ছে উপযুক্ত জায়গা। অপরজনের মতে, ওঃ! তার মানে পাখির পক্ষে খাঁচাটাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ স্থান, কেমন? স্ত্রী-স্বাধীনতা ব্যতীত দেশের বাঁচার পথ নেই।

বাজারে তখন 'নারীমুক্তি' শব্দটা চালু হয়নি, তাই স্ত্রী-স্বাধীনতা।

একজন যদি বলে ওঠেন, তোমাদের ওই রবিঠাকুর—

অন্যজন চটপট বলে ওঠেন, শুধু আমাদের নয়, আমাদের তোমাদের সকলের।

বেশ, তা না হয় হলো। কিন্তু এই যে উনি একখানা ইস্কুল খুলে বসে গেরস্থঘরের মেয়েদের নাচাচ্ছেন, এটা ভালো?

'নাচাচ্ছেন' মানে বাঁচাচ্ছেন। চিরকাল ধরে মরে পড়ে থাকা মেয়েগুলোর মধ্যে দুটো-চারটে যদি বাঁচে, সেটাই অতি উত্তম।

হাওয়ার লড়াই।

এক হাওয়ার যদি প্রশ্ন, মেয়েদের আবার দুটো-চারটে পাস করে কী হবে? তারা কি অফিসে চাকরি করতে যাবে? না জজ-ম্যাজিস্ট্রেট হতে যাবে?

অপর হাওয়ার 'প্রতিপ্রশ্ন', হতে বাধা কী? জগতের সব ভাল জায়গাগুলোই বেটাছেলেদের একচেটে নাকি? পাস করিয়ে করিয়ে দেখুক না সমাজ, মেয়েরা ওসব হতে পারে কিনা?

একজনের দৃষ্টিভঙ্গী, পড়ুয়া, ছেলেদের পক্ষে 'পড়া'ই সার সত্য। খেলার

মাঠ, শরীর চর্চার আসর, বন্ধু আড্ডা ক্লাব, এসব সর্বনাশের মূল। এসব নেশা ধরলে আর মানুষ হতে হবে না।

অপর জনের মনোভঙ্গী, মানুষ যদি সত্যই হয় কেউ, ওই সব নেশা-টেশা থেকেই হয়ে উঠবে।

একজন ভূত, ভগবান দুইয়েই বিশ্বাসী।

অপরজন কেবলমাত্র ভগবানে।

ভরসন্ধ্যেবেলাও তিনি ভূত নিয়ে তামাসা করতে পারেন।

যিনি ভূতবাদী তিনি হাওয়া বাতাস, হাঁচি টিকটিকি শনি মঙ্গল যাত্রা অযাত্রা পিছুডাকা এক শালিখ দেখা ইত্যাদি বহুবিধ বাদেই বিশ্বাসী।

আর যিনি ভগবানবাদী, তিনি ওগুলোকে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেন।

দু'জনের বিশ্বাস-অবিশ্বাসের জগৎ আলাদা, চিন্তা-চেতনায় আসমানজমিন ফারাক, অথচ (এ যুগের ভাষায়) জেনারেশন গ্যাপ-এর ব্যাপার নয়। একই দশকের সীমানার মধ্যেই দুজনের ইহপৃথিবীতে আবির্ভাব। তত্রাচ বিশাল এক পারাবারের দু'পারে দু'জনের বসবাস।

কিন্তু মজাটা এই, এ সমস্তই মর্মজগতের ব্যাপার। কর্মজগতে দু'জনের দিব্যি কো-অপারেশন। সংসারে যে কোনো কর্মকাণ্ডেই দু'জনের সমান উৎসাহ উদ্দীপনা। কোনো আনুষ্ঠানিক উৎসব পেলে তো কথাই নেই। তখন যে যার তীরভূমি থেকে নেমে এসে এক নৌকোয় চড়ে বসে হাল বৈঠা ধরবেন।

পূব আর পশ্চিমের এ এক আশ্চর্য অলৌকিক সহাবস্থান। শুধু দু-চারদিন নয়, দিনের পর দিন। বছরের পর বছর। জীবনভোরই।

কাজেই বছরের পর বছর একজন সেই বারুদ তৈরীর মালমশলা এনে হাজির করেন, অপরজন শিলনোড়া হামানদিস্তে নিয়ে লেগে পড়েন সাধের দিবানিদ্রাটিকে বিসর্জন দিয়ে।

একজন মুটের মাথায় চাপিয়ে ঝোড়াভর্তি মাটির প্রদীপ এনে হাজির করবেন এই ভাব-ভাবনায় বসে পক্ষকাল ধরে সলতে পাকিয়ে পাকিয়ে মজুত রাখেন।

একজন যখন ওই দেওয়ালী বাবদই আকাশে ফানুস ওড়াবার তালে বৃহৎ বৃহৎ পাতলা কাগজ এনে হাজির করেন, অপরজন তাঁর মনের মত বাটি বাটি ময়দার আঠা বানিয়ে এগিয়ে দেন। তাছাড়া এসবের আনুষঙ্গিক সবকিছুতেই সাহায্য করতে এক পায়ে খাড়া দীপুদের মা, তাঁর প্রতিপক্ষের এইসব ছেলেমানুষীতে।

লোহাচুরকে উচিত মতো চূর্ণ করে মা কাঠকয়লা নিয়ে বসলেন। দুষ্টু ফুলি বলে ওঠে, মা, তোমার নাকের নীচে কত ঘাম! এত কাজ করছ তো!

ও মা! ঘাম আবার কই?

মা হাত বুলিয়ে দেখেন, আর ফুলি হি হি করে ওঠে, মার গোঁফ হয়েছে মার গোঁফ হয়েছে। কাঠকয়লার গুঁড়োমাখা হাত তো!

হাসির ধুম পড়ে যায়।

কাজেই বলা যায় উলুখড়রা মজাতেই আছে। ওরা এইসব র‍্যালার কা

থেকে নড়তে চায় না।

তবে সৃষ্টিছাড়া দীপুটার কথা আলাদা। সে যে কেন হঠাৎ হঠাৎ এই দৃশ্যমান জগৎ থেকে একটা আলো-আঁধারি গোলকধাঁধার মধ্যে ঢুকে পড়ে দিশেহারা হয়ে ঘুরে মরে!

বাবার একখানা বালাপোষ আছে, তার দু'দিকে দু'রকম রং। একদিকে সবুজ, একদিকে লালচে খয়েরি। যখন গায়ে জড়ানো থাকে, বোঝা যায় না ভিতর দিকের রংটা কী! দীপুর মাঝে মাঝে মনে হয়, মানুষগুলোও কি এই বালাপোষটার মত? দু'দিকে দু'রকম রং?

ঘরের মেজের প্রকাণ্ড ব্রাউন পেপার পেতে তার ওপর তৈরী বারুদের গাদা ঢেলে মিশিয়ে ফেলে ভর্তি করা হলো তুবড়ির খোল। বড় মেজ ছোট তিন মাপের। ছোটদেরও দারুণ ইচ্ছে এই কাজে হাত লাগায়। কিন্তু এই বারুদ ঠাসা কাজটিতেও তো বাবার বেশী আস্থা মার ওপর। নিজের পরেই। বেশী টাইম্ হলে তুবড়ি ফেঁসে যাবে, কম টাইট হলে হুশ করে জ্বলেই নিভে যাবে। তবে দাদারাও এতে অধিকার পান। তা নইলে ঠিক সময়ে হয়ে উঠবে কেন? এখানে ছেলেমেয়েদের ও কাজের লোকেদের দেবার জন্যে গাদাগুচ্ছির ফুলঝুরি লাল-নীল দেশলাই আর বেশ কিছু তুবড়ি রেখে দিয়ে, বাবা তো তুবড়ির সিংহ ভাগটি নিয়ে পরের দিন দুপুরের মধ্যেই রওনা দেবেন 'দেশের বাড়ি'র উদ্দেশে। প্রতিযোগিতার ঠাঁই তো সেটাই।

কলকাতা থেকে মাইল কতক যেন দূরে সেই দেশের বাড়ি। নেহাতই গ্রাম, তবে কোনো কিছুর অবদানের জন্যে গ্রামটি বিখ্যাত। এক ডাকেই চিনতে পারে লোকে।

সে যাক, দীপুদের বাবার এই দেশের বাড়িতে না কি সাত কি দশ পুরুষের আমল থেকে কালীপুজো হয়ে আসছে, সেই পুজোয় বংশের পুরুষরা যে যেখানেই থাকেন অন্ততঃ এই রাতটুকুর জন্য সেখানে গিয়ে হাজির হবেন। না কি রাতভোর বাজি পোড়ানো হয়, যে যেমন পারে, যার যেমন ক্ষমতা নিয়ে আসে, এবং ঠাকুরদালানের সামনে শুরু হয় জ্বালানো।

রাত ভোর হলে শান্তি। প্রসাদের খিচুড়ি খেয়ে যে যার জায়গায় ফিরে আসা। না এসে উপায়? কালীপুজোর জন্যে তো আর সাহেবের অফিস দু'দিন ছুটি দেবে না।

ঠাকুর বিসর্জনের কাজ-টাজ?

তার জন্যে গ্রামে বাস করা বংশধররা তো আছেন। বাবার সেই জ্ঞাতি কাকারা দাদারা। তাছাড়া দীপুদের নিজের সেজ কাকা? যাঁর তৈরী তুবড়ি কখনো কখনো বাবার থেকে ফাস্ট হয়ে যেতো!

যখন একই বাড়িতে থাকা হতো, তখনও কিন্তু দুই ভাইয়ের আলাদা বিজনেস! ফরমুলা সম্পর্কে মন্ত্রগুপ্তি। এ একটা মজার ছেলেমানুষি!

তা সেজ কাকার বেশী ভাল হওয়া তো সহজেই হওয়া উচিত। কত বেশী

সময় ও'র ! সেই পুজোর সময় থেকে ছুটি চলছে একটানা। আরো চলা
দু'চারদিন ।

মণি মাঝে মাঝে বলে, বাবাও যদি ইস্কুলের মাস্টার মশাই হতেন, বেশ হতে
না রে দীপু ?

দীপু ঈষৎ আন্দোলিত হয়, আবার তখনি স্থির হয়ে গিয়ে বলে, ধ্যেৎ ! তা
হলে বাবা ছবি আঁকতেন ? বাজনা বাজাতেন ? এত রকম সুন্দর সুন্দর কা
করতে পারতেন ? আর এত ভাল করে সেজেগুজে অফিস যেতে পেতেন
মাস্টারদের যা সাজের ছিরি !

মণি আবার তখন ছোট বোনের কথারই সমর্থন করে, তা যা বলেছিস ! তবে
অনেক ছুটি থাকতো, তাই ভাবছিলাম !

সময়টাকে কাজে লাগাতে না পারলে আর সময় নিয়ে কী লাভ হবে ?

কথাটা আংশিক সত্যি। বাবার মত এত রকম কাজের নেশা আর কার ?
তবে কাজে লাগানোর দরকার সকলেরই পড়ে মাঝে মাঝে।

এই যে এখন ? পুজোর পরদিন অন্য সব কাজ সেরে ঠাকুর বিসর্জন দিইয়ে,
ঠাকুমাকে নিয়ে আবার কলকাতায় ফেরা কে করতো, ছুটি বা সেজকাকা না
থাকলে ?

মণি বলল, অনেক ছেলে থাকা ভাল, তাই না রে ? বেশ এক-একজন এক-
এক রকম কাজ করতে পারে। মাদের কোনো অসুবিধে থাকে না।

বলছিল দীপুকে, দাদা শুনে ফেলে বলে উঠলেন হ্যাঁ, ছেলেগুলো যদি ভূত
বাঁদর না হয় !

এমা, হি হি ! মানুষের ছেলে ভূত বাঁদর হবে কী ?

হয় হয় ! বড় হলে বুঝবি ! কাতু পিসির ছেলেরা কী ? সাত-আটটা
তো ছেলে কাতু পিসির। কী সুবিধে ও'র ?

বাঃ, ওরা তো মুখ্যু !

মানুষ যখন জন্মায় মুখ্যুই থাকে, বুঝলি ? লেখাপড়া শিখেই মানুষ হয়।
না শিখলে ? ফী বছর ফেল করলে ?

দীপ হঠাৎ বলে ওঠে, আচ্ছা দাদা, ইস্কুলে না পাঠালে তো মুখ্যুই থেকে
যায় ?

কেন, ওদের কী পাঠানো হয়নি ? মাথায় স্রেফ গোবর ছাড়া কিছু না
থাকলে ? ঘিলু বলে কিছু নেই।

দীপুর খুব ইচ্ছে করে যে, দাদাকে জিজ্ঞেস করে ওঠে, সে তো বুঝলাম।
কাতু পিসির ছেলেদের মাথায় গোবর। কিন্তু যদি কাউকে কোনোদিনই ইস্কুলে
যেতে দেওয়া না হয়, কী করে বোঝা যাবে, কার মাথায় গোবর আছে। আর
কার মাথায় ঘিলু।

কিন্তু জিজ্ঞেস করবার সাহস থাকলে তো ? বড়দের মুখের সামনে তর্ক
তুলবে ?

বড়দের কাছ থেকে অনেকখানি দূরত্ব রাখতে হয় বলেই না নিজেদের মধ্যে

এতো গভীর একাত্মা ! কাছাকাছি বয়েসের ভাইবোনদের মধ্যে ।

মণিমালা দীপমালা ফুলমালা, এরা তিনজনে যেন একটাই মালার তিনটে অংশ। আবার ছোট্ট ভাইটি, যে নাকি এই সেদিনও রামকে বলতো 'লাম', আর ছোড়দাকে বলতো 'থোন্দা' সেও দিব্যি এদের দলে এসে জুড়ে গেছে। অনর্গল পদ্য মুখস্থ করাই তার একমাত্র খেলা। আর সেই খেলাটার জন্যেই দিদিদের সাহায্য লাগে। মুখস্থ পদ্যর ভাঁড়ার তো ওদের কাছে বেশ বড়সড়। ওটাই তো মার 'পড়া দেওয়া'। রবীন্দ্রনাথ তো আছেনই, মাইকেলই বা নয় কেন ? 'আমি' কী ডরাই সখী, ভিখারী রাঘবে ?' কী উত্তেজনা তার মধ্যে ? আর হেমচন্দ্রও তো রয়েইছেন, রয়েছেন আরও কতজন। দাদাদের পাঠ্য পুস্তকেও তাঁদের দেখা মেলে। কিছু না হোক হাতের কাছে কৃত্তিবাসী রামায়ণখানা তো আছে। ক্ষুদে ছেলেটা পড়তে শেখেনি, তবু ছবি দেখে দেখে 'তাড়কাবধ', 'শূর্পণখার নাক কান কাটা', 'কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ' এগুলো বার করে ফেলে বলে, এইটা পড়ো। এইটা পড়ো। কেবল কেবল পড়ো।

'কেবল কেবল পড়া' মানেই হচ্ছে মুখস্থ করে নেওয়ার বাসনা। সেও তার দিদিদের মতে বিশ্বাসী। বইগুলো তো সব সময়ে হাতের কাছে নাও থাকতে পারে বইটাকে মনের মধ্যে পুরে ফেলতে পারলে মিটে গেল সমস্যা !

বড় দুই দাদা রয়েছেন, আরো বড় এক দিদি রয়েছেন সেই পাহাড়-চূড়োর শ্বশুরবাড়িতে, তাঁরা দূরের মানুষ, তাঁরা অন্য জগতের।

একই দশকের মধ্যে পৃথিবীতে আবির্ভূত এই চারটি ভাইবোন, মণি, দীপু, ফুলি, নীলু। এরা যেন নিজস্ব একটি জগৎ গড়ে নিয়ে তার মধ্যে একটি অকারণ পুলকের সাগরে ভাসতে ভাসতে এগিয়ে চলেছে।

কিসের সেই পুলক আহ্লাদ ?

কিছু না। শুধু প্রতি দিন-রাতের পর একটি 'দিন' এসে পড়ছে হাতে, সেটাই আহ্লাদ ! দীপু মণিদের সেই ছেলেবেলার আমলে ছোটদের মনোরঞ্জনের জন্যে আলাদা করে কিছু আয়োজনের ব্যবস্থা ছিল না বড় একটা। সংসারে যা ঘটছে, তা থেকেই যা কিছু পেয়ে নিতে পারে।

বড়লোকেদের বাড়ির ছেলেমেয়েদের জন্যে কী হতো কে জানে। অনেক বেশী খেলনা পুতুল জামা জুতো খাবারদাবার, আর কী বা ?

মাঝারিদের বাড়িতে তো সেই বেশীর প্রশ্নটাও উঠছে না। তবু কী ছিল সেই কালে ? যে কালে ছোটদের শুধু শুধুই ভাল লাগতো ?

অন্ততঃ দীপুদের লাগতো।

তুচ্ছ কারণেও ভাল লাগার স্বাদ। অকারণেও ভাল লাগার স্বাদ। চারটি কাছাকাছি বয়েসের ভাইবোনের এক সুতোয় গাঁথা মন দিয়ে গড়া এই যে একটা জগৎ, যেখানে কিছু না থেকেও অনেক কিছু আছে, এমন একটি জগতের স্বাদ কি এ যুগের 'সুখী পরিবারে'র ছেলেমেয়েরা পাবে কোনোদিন ?

'সুখী পরিবার' যখন ক্রমশঃ আরো সুক্ষ্মতর সুখী হতে থাকবে তখন তো আজকের এই পারিবারিক জীবনের 'সম্বন্ধে'র নামগুলোও হারিয়ে যাবে।

হারিয়ে যাবে—কাকা জ্যাঠা মামা মাসি পিসি পিসে দাদা দিদি ইত্যাদি শব্দগুলো। তার মানে সেই শূন্যতার বন্যা ভাসিয়ে নিয়ে যাবে অনেক কিছুই।

'মামা' না থাকলে ভাগ্নেও নেই। দাদা না থাকলে 'বৌদি' এবং দিদি না থাকলে 'জামাইবাবু'। বহু সম্পর্কের রসে গড়া এই সমাজজীবনে ভালবাসার কত বিচিত্র রস।

আর ছোট ভাইবোন? এরা না থাকলে যে কী নিঃসঙ্গতার শিকার হয়ে পড়তে হয়, সে তো এ যুগেই ধরা পড়ছে সুখী পরিবারের সবেধন নীলমণিদের দেখলেই বোঝা যাচ্ছে।

দীর্ঘদিনের অনুশীলনে আর সাধনায় মানুষ তার জীবন রচনায় যে মাধুর্যকে সৃষ্টি করে উন্মেষিত হয়ে চলছিল, সেটা থেমে যাবে? ক্রমশঃ পিছু হাঁটতে হাঁটতে মানুষ কি তাহলে আবার কেবলমাত্র জীব জগতে ফিরে যাবে? থাকবে শুধু 'নরনারী' আর অমোঘ অবিনশ্বর জৈব আকর্ষণ। যেখানে সন্তানও শৈশব পার হলেই মা-বাপের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন!

পৃথিবীতে আর গাছেদের ডালপালা মেলবার জায়গা থাকবে না। এই আশঙ্কায় কি গাছগুলোকে সব মুড়িয়ে ফেলা হবে? থাকবে শুধু তৃণগুচ্ছরা? যাক, এ সব ভবিষ্যৎভীতির কথা।

দীপুরা কোনো দিন অনুভব করেনি বেশী ভাইবোন থাকা অসুবিধে।

দীপুরা জানতো ভাইবোনদের নিয়েই 'পৃথিবী' আর 'জীবন'। কোনো কিছুই একা উপভোগ করা যায় না।

তুবড়ি ফুলঝুরি রঙিন দেশলাই বাজি-টাজি সব ছাদে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাদের মুখাগ্নি করতে প্রদীপ আর পাটকাঠিও মজুত, কিন্তু কাঠিতে অগ্নিসংযোগ করা যাচ্ছে না। ছোড়দা এখনো বাড়ি ফেরেননি।

ন্যাড়া ছাদ, উঁকি মারতে যাওয়া বারণ তবু মণি দীপু বারে বারে উঁকি মেরে দেখছে, ছোড়দা আসছেন কিনা। মনের মধ্যে যে অধৈর্যের ঝড়।

অবশেষে সেই প্রার্থিত মূর্তিটি দেখা গেল। চেঁচিয়ে উঠল মণি, আসছেন!

ব্যাস! আর কী!

জ্বলে ওঠে আলোর গাছে আলোর ফুল। আলোর ফিনকি। দোর্দণ্ড শব্দ।

উঃ! গাছেরা কী উঁচু! কী ঝাড়!

আহ্লাদের বান ডাকছে তবু মন-কেমনের কাঁটা, বড়দি বেচারী কখনো এসব দেখতে পান না।

'মন-কেমন-করা' মানেই কি ভালবাসা? সেটাই কি ভালবাসার স্বাদ?

এই যে এখন বাবার জন্যেও মন-কেমন করছে, বাবা দেখছেন না। নিজে হাতে করলেন।

দেখছেন না আবার কী!

মা বকে উঠলেন, বড় বড় ভাল ভালগুলোইতো নিয়ে যাওয়া হয়েছে দেশে।

মা কালীর সামনে দেখছেন!

'মা কালী সামনে!'

আর কিছু বলা চলে না। তবু মনের মধ্যে খুঁতখুঁত করতে থাকে। সব্বাই একসঙ্গে না হলে আবার সুখ কী? আনন্দ কী? উপভোগ কী? রামকেও তো ডেকে আনা হয়েছে ছাদে। বামুনদি, খোকার মা, তাদের ছেলে আর নাতিকেও। হৈচৈ আর উল্লাস তো তাদেরই বেশী।

বোধ হয় বাবার অনুপস্থিতির সুযোগে একটু অধিক বেশী।

পরদিন বসাক-গিন্নীর প্রশ্ন শোনা গেল, কাল তোদের বাড়িতে ডাকাত পড়েছিল না কি রে মণি?

আহা, ডাকাত পড়তে যাবে কেন? বাজি পোড়ানো হচ্ছিল তো!

হুঁ। তা বুঝেছি। তা এক সন্ধ্যেয় কত টাকা পুড়ল তোর বাবার?

মণি ঘরে এসে বলে, উঃ, এতো বিচ্ছিরী করে কথা বলেন উনি!

সত্যি! সব সময় বিচ্ছিরী করে কথা!

দীপুর মন্তব্যের পরই ফুলির মন্তব্য, ওরা যদি অন্য কোথাও উঠে যায় বেশ হয় না দীপুদি? অন্য পাড়ায় অন্য বাড়িতে? বাঁচা যায়!

আহা ও'রা আবার উঠে যাবেন কী? নিজেদের বাড়ি!

এ মা! নিজেদের বাড়ি? তাহলে দেয়ালে ঘুঁটে দেন কেন?

নিজেদের বলেই তো। যা ইচ্ছে করা যায়।

ও'র জ্বালায় আমাদেরই উঠে যেতে ইচ্ছে করে।

ওরে বাবা! এই বাড়ি ছেড়ে?

তা সত্যি! বাড়িটা যে বড্ড ভাল! এই যে কদিন পরে রাস পূর্ণিমার দিন পরেশনাথ মন্দির থেকে মিছিল বেরোবে, সে তো এই বাড়িটা থেকে তিন মিনিটের রাস্তা। কী ঘটা! কী জাঁকজমক! কাগজে গড়া বিশাল বিশাল হাতী, বিশাল মন্দির, চতুর্দোলা, কী বাহার কী বাহার! বলে শেষ করা যায় না।

এ বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও চলে গেলে দেখা যাবে সে সব?

আর, রোজ বিকেলে, রামকে রক্ষী করে চার ভাইবোনে পরেশনাথ মন্দিরে বেড়াতে যাওয়া হবে? ময়দার গুলি আর মুড়ি নিয়ে গিয়ে লাল মাছেদের খাওয়ানো যাবে?

ধুলো ধোঁওয়া ময়লা গাড়ির রেল, এই সবের মাঝখানে হঠাৎ একটি স্বর্গের বাগান তৈরী করা আছে, তিন মিনিটেই পেঁৗছে যাওয়া যায়। এ সবের কী হবে তবে যদি এ বাড়ি থেকে চলে যাওয়া হয়?

তাছাড়া কে জানে, অন্য পাড়ায়, মহরমের দিন বাড়ির জানলায় বসে 'তাজিয়া ভাসান' দেখতে পাওয়া যাবে কিনা। ভীড়ে ভীড়াক্কার রাস্তায় "হা হাসান, হা হোসেন" দেখা যাবে কি না।

সতুদাদের মত যদি দর্জিপাড়ায় হয় সে বাড়িটা? গলির মধ্যে গলি, তার মধ্যে গলি?

তাহলে?

ইস! তাহলে ছাদে উঠলেই টালার ট্যাঙ্কের মাথা দেখা যাবে? যে ট্যাংক থেকে সারা কলকাতার জল যায় নল বেয়ে বেয়ে?

আর মোহনলাল মিত্তিরের বাড়ি থেকে ভেসে আসা পেটা ঘড়ির ভারী ভারী ভরাট গম্ভীর আওয়াজটি শুনতে পাওয়া যাবে ঘণ্টায় ঘণ্টায়? যে আওয়াজটি শুনলে, বাড়ির দেওয়ালে টাঙানো ঘরিটার শব্দটাকে মনে হয় কী তুচ্ছ! পেটা ঘড়ির আওয়াজ যেন মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি!

অন্য কোথাও চলে গেলে যেন অনেক কিছু হারাতে হবে। ভাবলেই মনটা হায় হায় করে ওঠে। তার থেকে ওই বসাক-গিন্নীও ভাল। তবে সব সময় যে কেন অমন বাঁকা করে কথা বলেন উনি! বাজি পুড়লে বলবেন, তোদের বাড়িতে বুঝি ডাকাত পড়েছিল? বড়দিনে কাগজের শিকলি দিয়ে বাড়ি সাজানো বাবার সখ, দেখে বলবেন, মণি, তোরা কী খৃস্টান না কি? বড়দিনে বাড়ি সাজানো!

একটু বেশী বেশী বাজার আসা দেখলেই (ছুটির দিনে তো আসবেই) ডাক দিয়ে দিয়ে বলবেন, হ্যাঁ রে মণি, তোদের বাড়ি বুঝি আজ লোকজন খাবে?

দেখেনও যে কখন কোনখান থেকে!

ওই সব শুনলেই রাগ ধরে, যাঃ! এ বাড়ি থেকে চলে যাবার চিন্তা মনে এসে যায়। আর তারপরই মন হু-হু করে ওঠে।

বালখিল্য কটা তো জানে না, পাড়া ছাড়লেই যে এই রাগ ধরার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে তার নিশ্চয়তা নেই। 'বসাক-গিন্নী'রা সর্বত্রই বিরাজিতা। বহু রূপে, বহু বর্ণে।

হঠাৎ এক নতুন ঘটনা ঘটল।

এই বাড়ির সূত্রেই দীপুর জীবনে এক নতুন ভাগ্যোদয়। হ্যাঁ, এটা বলতে পারা যায় এটা একান্তই দীপুর।

পটভূমিকা এই—এই বাড়িটার পিছনের অর্ধাংশ যেটা নাকি এ যাবৎ 'টু লেট' কপালে ঝুলিয়ে বসেছিল, তার কপাল খুলল। অর্থাৎ টু লেট খুলল। সেদিকে নতুন ভাড়াটে এল।

দুটো বাড়ি মূলতঃ একটাই, ছাদে ওঠার সিঁড়ি একটাই, একট বন্ধ দরজা খুলে ফেললেই দুটো বাড়ি টানা লম্বা একটাই। এক সঙ্গে এতবড় বাড়িটার ভাড়াটে জুটবে কি না জুটবে বলেই বোধহয় দুটো ভাগ করা। ওদের সদর দরজাটা পাশের গলিতে। যেখান দিয়ে ফেরিওয়ালারা ঢুকে যায়। যে দিকে আরো অনেকগুলো বাড়ি আছে।

কিন্তু পড়ে থাকা বাড়িতে ভাড়াটে এল, এতে না হয় বাড়িওলারই কপাল খুলল, এ বাড়ির অনেকগুলো মানুষের মধ্যে হঠাৎ দীপু নামের মেয়েটার কপাল খুলল কেন?

'কেন?' তার পিছনেই তো রহস্য।

আবার মজা এই, দীপু যে ব্যাপারটাকে 'ভাগ্য' বলে মনে করছে, বাড়ির

আর সবাই সেটা নিয়েই বেচারী দীপুকে ঠাট্টা ব্যঙ্গ করছে।

তুই যেমন হাবা! তাই সেধে এইটি ঘাড়ে চাপিয়ে বসে আছিস! কই, মণিকে পেরেছে এমন জব্দ করতে? ও তো তোর মত হাবা গঙ্গারাম নয়। হাবাগঙ্গা, দীপুকে তো চিরকালই এক বিশেষণে ভূষিত হতে হয়, দীপুর তাতে কোনো দুঃখ নেই। বরং দীপু মনে মনে হাসে, হাবাগঙ্গা তো তোমরাই। কোথায় দীপুর সৌভাগ্যকে তারিফ করবে, তা নয়, ঠাট্টা।

অবশ্য এই ঠাট্টাটি মার কাছ থেকে আসে না কোনো সময়। মা শুধু হেসে বলেছেন, 'যে যা চায়, সে তা পায়।'

বাড়িওলার বাড়ির দুটো মহলের মাঝখানের বন্ধ দরজাটা খুলে গেল, দীপুর সামনে এক আনন্দলোকের সিংহদুয়ার খুলে গেল।

কিন্তু ঘটনাটা কী?

দীপুর তো আর প্রেমে পড়বার বয়েস হয়নি যে, ভাবা যাবে নতুন ভাড়াটেদের বাড়িতে প্রেমে পড়ার মত কোনো পাত্র মজুত, দীপু সেদিকে ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল 'আলোকমুখী পতঙ্গবৎ'।

তা তেমন কোনো পাত্র না থাকলেও দীপুর অবস্থা ঘটলো ওই পতঙ্গবৎই। সকাল থেকে ওই দরজাটা তাকে টানতে থাকে। যদিও তখন দরজাটা দু দিক থেকেই খিল ছিটকিনি লাগানো থাকে, কেবলমাত্র একক প্রচেষ্টায় খোলা সম্ভব হয় না।

খোলা হবে দু'বাড়ির কর্তারা অফিস বেরিয়ে গেলে, এবং ছেলেরা স্কুলে রওনা হলে! ছেলে অবশ্য এ বাড়িতেই। ও বাড়িতে সে পাট নেই। ও বাড়িতে শুধু দু'জন।

তাজা ডাঁসা পেয়ারার মত মাজামাজা টানটান গাল, টিকটিকে টিকলো নাকে নীলচে আভা কী একটা ছোট্ট পাথর বসানো নাকছাবি, একটু নড়তে চড়তেই যেটা ঝিকঝিকিয়ে ওঠে।...উঁচলো গড়নের ভুরুজোরার মাঝখানে কাঁচপোকার টিপ, ফর্সা ধপধপে কপালের ওপর চিরুনির ডগা দিয়ে সরু করে সিঁদুর পরা, সিঁথির দু পাশে একখানি একখানি করে সাজানো পাতা কাটা চুলের বাহার, কানে ঝকঝকে দুটি সোনার বেলকুঁড়ি, পরনে সর্বদা ফর্সা ধবধবে জ্যাকেট কাটা সেমিজ, যার হাতা দুটো বেশ একটু ফুলো ফাঁপা, যার নাম নাকি—'ভিক্টোরিয়া হাতা' এবং সর্বদা লাল কালো ডুরে, কিম্বা রঙিন শাড়ি। সে সব রঙের নাম নাকি 'নীলাম্বরী', 'কালাপানি', 'পিঁয়াজি', 'জাম রং'।

এই হচ্ছে দীপুর দুর্নিবার আকর্ষণ কেন্দ্র। রূপবতী যৌবনবতী রহস্যময়ী এক নারী। এবং মুখরা প্রখরা।

দীপুর জানা জগতে কখনো কোনো মেয়েকে বৌকে বাড়িতে সর্বদা এমন সুন্দর করে সেজেগুজে থাকতে দেখেনি। অথচ সে মেয়ে সারাক্ষণ গেরস্থালীর কাজও করে চলেছে। হলেও শুধু দুজনের সংসার, তবু দশজনেরও যা দুজনেরও তা, কোন্ কাজটা না করলে চলে? না-হয় রান্নাটান্না একটু মাপে কম করলে চলে। তেমনি দুজনের মধ্যে বাকি আর জনটি যে আবার ভারী শৌখিন আর

ভোজনবিলাসী। মাপে যদি কম তো, 'পদে' অনেক বেশী!

সারাক্ষণ কাজ করছেন উনি, তবু পারিপাট্যের এতটুকু নড়চড় নেই। পাতা-কাটা চুলের একটি চুলও এদিক ওদিক হয় না।

দীপুর দামী দামীমামীরাও এরকম জ্যাকেট সেমিজ পরেন, দেখেছে দীপু। কিন্তু গরমের দুপুর হলো তো, সে সেমিজ অঙ্গচ্যুত হয়ে মাটিতে লুটোতে লাগল। মাটিতে লুটোতে লাগলেন তার মালিকও।

আহা, ফ্যান-এর হাওয়া বলে তো আর ছিল না তখন কিছু। দুপুরে ঘর অন্ধকার করে মাটিতে গড়াও, আর তালপাতার পাখা নাড়ো। দীপুর মা'র তো সর্বদাই সেই ভঙ্গী।

কিন্তু এই তুষারকণা? (নামও কি এতো চমৎকার! যেন রূপকথার গল্পের মেয়ে।) কোনো সময় এদিকে ওদিক নেই। দীপুর গতিবিধি তো দুপুর থেকে সন্ধ্যের কাছাকাছি।

এই দীর্ঘ সময়টা দীপু ওই অপরূপার প্রতিটি ভাব-ভঙ্গী আচার-আচরণ চলন-বলনের মুগ্ধ দর্শক।

দীপু যদি ছেলে হতো, নির্ঘাত এই অভিভূত অবস্থাটিকে 'প্রেমে পড়া' বলা চলতো। বয়সে কী এসে যায়? বাড়িতে কোনো রূপসী নববধূ এলে, তা দাদারই হোক, কি মামা কাকারই হোক, বাড়ির কমবয়সী ছেলে টেলেরা প্রেমে পড়ে যায় না? তার কাছে আটকে পড়ে থাকতে চায় না?

দীপু অবিশ্যি ছেলে নয়, কিন্তু মেয়েই কি কোনো অলৌকিক অসাধারণীর প্রেমে পড়তে পারে না?

আসলে মুগ্ধতাই তো প্রেম।

অতএব ও-বাড়িতে কোনো ছেলে না থাকলেও দীপুর অবস্থা প্রেমে পড়ার মতই। এই অসাধারণীর আকর্ষণ ছাড়াও, দীপুর আরও একটা চিরকালীন তীব্র আকর্ষণের বস্তুও যে এখানে মজুত। বই! নিত্য নতুন বই!

সেই বইগুলি দীপুর জন্যেই অপেক্ষা করে। সেই রূপকথার তুষারকণা দীপু গেলেই বলে ওঠেন, এই নে, আজ কী বই এসেছে দ্যাখ!

আবার বলে ওঠেন, বাব্বা, এতক্ষণে সময় হলো মেয়ের! কী এতো রাজকীয় কাজ রে তোর!

দীপুর অবশ্য এতো বুদ্ধি যোগায় না যে বলে উঠবে, 'বাঃ, এতক্ষণ তো তোমার দরজায় খিল দেওয়া ছিল!'

বলবে কী করে?

দীপুর মত একটা 'তুচ্ছ' প্রাণীকে কে কবে এতো পদমর্যাদা দিয়েছে? কে কবে তাকে দেখে চোখে আলোর ঝিলিক ফুটিয়ে বলে উঠেছে, 'ও, এতক্ষণে সময় হলো মেয়ের!'

ঝিলিকই বটে। টিকলো নাকের দু'পাশে, উড়ন্ত-ডানা পাখীর মত ভুরু-জোড়ার নীচে, সেই চোখজোড়ায় হঠাৎ হঠাৎ কী রকম যে একটা আলো জ্বলে ওঠে! কত সময় দেখেছে দীপু, উনি যখন একা বসে, কোনো কথা হচ্ছে না,

তখনো চোখে অদ্ভুত একটা হাসির আলো। যেন কারো সঙ্গে কথা বলছেন।

দীপু তো নিজেদের বাড়ি ক্লীয়ার হয়ে গেলেই দু'বাড়ির মাঝখানের সেই দরজাটার সামনে বামুনদির রান্নাঘরের 'খুরশী' পিঁড়িটাকে বসিয়ে তাতে উঠে এদিকের খিল খুলে ফেলে, কিন্তু ওদিকটা না খোলা হলে?

ওদিকটায় একটু দেরি!

তুষারকণার বর বঙ্কিম মিত্তিরের অফিস একটু বেলায়।

কিন্তু দীপুর আর এক অসুবিধে, দীপুকে ও-বাড়ির দরজাটি ঠেলে খুলতে দেখলেই মণিদি চোখ পাকিয়ে বলেন, ছুটছিস তো এখনি ও-বাড়িতে? কেন? বাড়িতে বই পড়তে পাস না?

আবার বামুনদি (যার এলাকার পাশেই ওই দরজাটা) হেসে হেসে বলেন, ও-বাড়িতে না সেঁধুলে তোমার বুনের ভাত হজম হয় না গো!

হ্যাঁ, ভাতের পর্ব তো দাদাদের সঙ্গেই মিটে যায়। দাদারা ইস্কুলে যান, দীপুরা যায় না, কিন্তু বামুনদি নিজের কাজ মিটিয়ে ফেলার জন্যে একসঙ্গেই খাবারঘরে ছোট বড় পাঁচখানা থালা পেতে ফেলে, সাঁটে পরিবেশন করে ফেলেন। সেই সঙ্গে মাও বসেন ছোট ছেলেকে নিয়ে খাওয়াতে।

মায়ের ভাত 'রাণীশ্বরী' না কী নামের যেন একখানা কাঁসির মধ্যে গুছিয়ে বেড়ে রেখে যান বামুনদি। মা একটু পরে বসেন। তবে কখন বসেন, ইদানীং আর দেখতে পায় না দীপু। দীপু তো ততক্ষণে 'ও-বাড়ি'।

মা কিছু বলেন না, বরং কখনো কখনো হাসেন। বলেন, 'দীপুর শ্যামের বাঁশি বাজল, তুষারের খিল খোলার শব্দ হলো।'

কিন্তু মণি রেগে আগুন হয়। মণির খেলাঘরের সংসার—এর মধ্যে বোন দুটোরও তো একটা ভুমিকা আছে। একজন চলে গেলে ভাল লাগার কথা নয়।

মণি তাই মা'র আড়ালে চাপা-চাপা স্বরে বলে, তুই যেন ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো, তাই রোজ গিয়ে জুটিস! ওই বঙ্কিমবাবুটিরও যেমন আবদার, বাবাকে বলে রাখা হয়েছে, 'এ বাড়িতে আমার ওয়াইফ্ একা থাকবে, আপনার মেয়েরা যদি দুপুরটা একটু থাকে কাছে।'

কেন রে বাবা, তোমার 'ওয়াইফ' একা থাকবে, তা আমাদের কী? আমরা কি বলেছিলাম, তুমি তোমার কাকা-জ্যাঠাদের বিরাট বাড়ি থেকে তোমার ওই ওয়াইফটিকে নিয়ে চলে এসে ছোট্ট একটা বাড়িতে তাকে একা রেখে দাও? আবার 'ওয়াইফ'! 'বৌ' বলা যায় না বুঝি? বাবাও যেমন, অমনি বলা হল, হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয় নিশ্চয়! একই তো বাড়ি!

এসব মণির স্বগতোক্তি। কখনো কখনো দীপুর কানের কাছে।···বলবে, 'হ্যাংলাটাও অমনি ছুটলো।'

দীপুকে 'হ্যাংলা' বললে ভীষণ রাগ-অপমান হয় দীপুর। দীপু কি ও-বাড়িতে খেতে যায়? তুষারদি কিছু দিতে এলেও তো খিদে নেই, এক্ষুনি ভাত খেয়েছি, বলে এড়িয়ে যায়। তবু মণিদির মতে কিনা দীপু হ্যাংলা!

দীপু একথায় রেগে গিয়ে বলে, তা বলেছিলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, মেয়েরা কেউ থাকবে

গিয়ে—তো তুমি বুঝি বাবার মেয়ে নও? তুমি কেন একদিনও যাও না?

মণি অবলীলায় বলে, 'আমার দায় পড়েছে। আমার তো তুষারদিকে দু'চক্ষের বিষ লাগে।'

হ্যাঁ, ছেলেবেলা থেকেই এমনি পাকা-পাকা-পাকা কথা মণির। তার কথার বনেদ তৈরী হয়েছিল সেই একান্নবর্তী সংসারের আবহাওয়ায়, যেখানে সর্বদা পাকা কথার চাষ!

তোমার তুষারদিকে দু'চক্ষের বিষ লাগে?

দীপু স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল।

লাগেই তো! সব সময় অতো সেজেগুজে থাকা—আবার সব সময় মুখ টিপে টিপে হাসি!

সেজেগুজে থাকা খারাপ?

খারাপই তো। বামুনদি বলেন, 'বড়মানুষী দেখানো'।

বাঃ, উনি তো সব সময় কাজও করেন। রান্না করা, কুটনো কোটা, ময়দা মাখা, কাপড় কাচা, ঘর মোছা, বিছানা পরিষ্কার করা—কতো কী! খোকার মা তো শুধু বাসন মাজা, না-হয় উনুন জেবলে দেওয়াটা করে দেয়।

মণি ঠোঁট উল্টে বলে, দু'জনের রান্না অমন সবাই পারে।

আর সব সময় হাসাটাও খারাপ?

আমার খারাপ লাগে। মনে হয় যেন আমাদের ঠাট্টা করছেন। ঠিক রাঙা মামীর মত।

আশ্চর্য! দীপুর তো এমন মনে হয় না।

দীপু ওই হাসির মধ্যে রূপকথার আভাস দেখে।

দীপুর মনে হয়, যত নষ্টের গোড়া ওই বামুনদি। বামুনদি ওই 'মিত্তির'দের বাড়ির কাছাকাছি থাকে, বামুনদি জানে ডাকসাইটে ওই মিত্তিরবাড়ির একটা বেহেড ছেলে বৌ নিয়ে আলাদা হয়ে এসেছে—আর সেই দুঃখে অপমানে ওর মা কাশী চলে গেছে। বামুনদি তাই ওই বৌটিকে সুনজরে দেখতে পারে না। বাড়ির ছেলেটা দোষটোষ করলে তার বৌটাই যে দোষী হবে, এ তো নিশ্চিত নিয়ম।

বাঁজা বৌয়ের আবার এতো আদর!

মুখ বাঁকাতেন বামুনদি। সেই বাঁকা ছাপটা মণির মধ্যে মোক্ষম হয়ে পড়ে গেছে।

দীপু পরে হিসেব করে দেখেছে, তখন ওই তুষারকণার বয়েস খুব জোর চব্বিশ-পঁচিশ, কিন্তু তখনি তাঁকে বাঁজা বলে দেগে দেওয়া হয়েছে।

'বাঁজা' কথাটার মানে জানত দীপুরা?

ও বাবা, তা আবার নয়!

জ্ঞান থেকেই তো শুনছে।

যাদের ছেলে-মেয়ে হয় না, তাদেরই তো বাঁজা বলে। দীপুদের এক পিসতুতো দিদি সুবালাদি তো তাই। সেই জন্যে সুবালাদি কোনো বিয়েটিয়েতে

নেমন্তন্ন এলে—মজার কাজগুলো, যেমন মাথায় কুলো নিয়ে কলাতলায় দাঁড়ানো, বরকনেকে ঘিরে ঘিরে ঘোরা, বাসরঘরে কড়ি খেলানো, ফুলশয্যের দিন আরো সব কত কী, যা নিয়ে ভীষণ হাসির হুল্লোড় ওঠে—সুবালাদি বেচারী সেখানে একধারে চুপচাপ বসে থাকে।

তুষারদিরও নাকি ওই অবস্থা!

কিন্তু সুবালাদিকে তো দুঃখু-দুঃখু-মুখে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়, সুবালাদির হাতে গাদা গাদা মাদুলী—তুষারদির ?

এ মা! ভাবাই যায় না তুষারদির হাতে মাদুলী। তুষারদির নিটোল মাজা মাজা হাতের নীচেটা ভর্তি চুড়ি বালা শাঁখা—ওপর দিকটা ফাঁকা। শুধু সেমিজের ফুলো ফুলো হাতাটা, যার আগাটা চেপে বসে থেকে দাগ ধরিয়ে দেয়।

মণি বলে, তুই বা রোজ রোজ ওই 'ওয়াইফ'কে আগলাতে যাবি কেন রে ? তোর আর কাজ নেই ?

দীপু অবাক হয়ে যায়, তার আবার কাজ কী ? বই পড়ার থেকে মহৎ কর্ম ছাড়া ? সেই মহৎ কর্মটিরই তো ভার পেয়েছে সে তুষারদির কাছে।

তুষারকণা ঘুরে ঘুরে সংসারের কাজ করে, উঁচু খাটের বিছানাকে ঝেড়ে ঝেড়ে হাত বুলিয়ে মসৃণ করে, বরের ছেড়েরেখে যাওয়া জামা-গেঞ্জি সাবানজলে ভিজিয়ে রাখে, সকালের শুকনো কাপড়জামা তার থেকে নামিয়ে কুঁচিয়ে আনলায় রাখে, বিকেলের রান্নার জন্যে কুটনো কুটে রাখে, আর দীপু তার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে ঘুরে বই পড়ে পড়ে শুনিয়ে চলে। অতঃপর কিছুক্ষণের জন্যে কর্মবিরতি। তখন মাটিতে মাদুর বালিশ নিয়ে শুয়ে পড়ে আরাম করে পড়া এবং শোনা। দীপুর জন্যেও তো একটা বালিশ পড়ে মাদুরে। ঝালর দেওয়া ফর্সা।

তুষারকণা বলে, শুয়ে বসে দাঁড়িয়ে বেড়িয়ে তুই আমায় বই পড়ে পড়ে শোনাবি, এই তোর চাকরি! তবে মাইনে টাইনে নেই বাপু, বিনি-মাইনের চাকরি!

সাজানো মুক্তোপাটির মত দাঁতে খিলখিল হাসি।

এমন দাঁত আর এমন হাসি আর কোথায় দেখেছে দীপু ? সত্যিই মুক্তোর মত দাঁত। এই রূপবতীকে দীপুর রূপকথার মেয়ের মত মনে হবে না ? দীপুর মনের জগৎটা যে একটা কল্পনার ভূমিতে। দীপু সংসারের সব দেখে, সব শোনে, হয়তো বা কিছু বোঝেও, তবু দীপুর মাটির সঙ্গে যোগ কম। দীপুর এই তুষারকণাকে নিয়ে কত কিই ভাবতে ইচ্ছে করে।

তুষারকণা নামটা তোমার কে রেখেছে তুষারদি ?

কে জানে ? নামকরণের সময় কি কারুর জ্ঞানগম্যি থাকে রে ? তোর ছিল ? হি হি হি। দিদি দুটোর নাম হচ্ছে—নীহারকণা, শিশিরকণা—তাই বোধ হয় আমার ভাগে তুষারটা পড়েছে।

তুমি কী সুন্দর!

দেখছিস তো, তুই-ই বুঝিস! আর কেউ বোঝে না।

কেউ বোঝে না ?

কই ? সেই মুখ-টেপা হাসি।

দীপুর বুদ্ধি নেই, কিন্তু বোধ আছে। দীপুর সেই 'বোধে'র জগতে ধরা পড়ে কার বোঝা উচিত এই সৌন্দর্যের মহিমা. অথচ কথাটা যে বলে ফেলতে নেই, তাই ফস করে বলে ফেলে, কেন, বঙ্কিমবাবু বোঝেন না ?

তুষারকণা চোখ কপালে তোলে, ও বাবা, এ মেয়ে যে তলে তলে বেশ পরিপক্ক হয়েছে গো ! তা হবে নাই বা কেন ? এত নাটক-নভেল পড়া ! মাসিমা তো বলেন, তুই মায়ের পেট থেকে পড়েই নাটক নভেল পড়ছিস ! তো তাই তোকে দিয়ে পড়াতে দোষ মনে করি না, বুঝলি ?

তারপর একটু দুষ্টু হাসি হেসে বলে, হ্যাঁ, সে লোকটা একটু বোঝে বটে ! তার জন্যেই না আমায় নিয়ে রাবণের পুরী থেকে পালিয়ে এসেছে !

দীপু বোঝে না, সৌন্দর্য অনুধাবনের সঙ্গে পালিয়ে আসার যোগসূত্রটা কী ? দীপু অবাক হয়ে বলে, পালিয়ে এসেছেন !

তা আসবে না ? সবাই মিলে তো ধরে-করে ওর আর একটা বিয়ে দিতে বসেছিল !

অ্যাঁ ! তুমি বেঁচে থাকতে ?

বলেই জিভ কামড়ায় দীপু। ইস, কী বোকার মত কথা বলে ফেলল সে !

তুষারদি অবশ্য দোষ ধরলেন না, স্বভাবমত হি হি করে হেসে বললেন, সেই তো ব্যাপার। না মরতেই মরিয়ে দেওয়া, কনে-টনে ঠিক করে জ্যাঠা কাকা পিসি আর মা—কী জোরাজুরি ! তোদের ফঙ্কিমবাবু বেচারী ভয়ে ভয়ে আমায় নিয়ে চোঁ-চাঁ পালিয়ে এল !

বরের নাম করতে নেই, তাই বঙ্কিমবাবুর বদলে ফঙ্কিমবাবু। যেমন দীপুর ন'মামী ও-বাড়ির পুরনো চাকরকে কাশীচরণ না বলে বলেন ফাঁসিচরণ ! ন'মামার নাম তো কাশীচরণ !

দীপু ভয়ে ভয়ে বলল, তোমার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা এতো খারাপ কেন গো ?

মুখরা প্রখরা এই রহস্যময়ীর কথাবার্তা সবই রহস্য-ঘেঁষা। বলে ওঠে কিনা, আহা-হা, ওরা খারাপ হতে যাবে কেন ? আমিই খারাপ !

তুমি খারাপ ?

নয় ? শুধু খাচ্ছিদাচ্ছি ঘুমোচ্ছি, অথচ আসল কাজে নেই।

আসল কাজ মানে ?

মানে বুঝলি না ? নাঃ, তুই একটা বোকার ঢিপি ! ভাব দিকি, আসল কাজটা কী ?

দীপু ভেবে নিয়ে ভয়ে ভয়ে বলে, তোমার ছেলেমেয়ে নেই, তাই বলছ ?

হুঁ। কে বলে বুদ্ধি নেই ! তো আমার শাশুড়ী রাগ করে কাশীই চলে গেল। তো ফঙ্কিমবাবু তবুও টলেনি।

দীপু ঈষৎ আহত হয়, তুষারদি, তুমি গুরুজনদের 'করেছে' 'গিয়েছে' এইসব বল কেন ?

তুষারকণার হাসি উথলে ওঠে।

আমার অত ভক্তিটক্তি নেই বাবা। তোদের যেমন। দু'বছরের দিদিদাদাকে করেছেন খেয়েছেন! কী ভক্তি! আমি তো আমার দিদিদের তুই করে বলি।

তা দীপুও যে এমন দেখেনি তা নয়। কিন্তু দীপুদের বাড়িতে এমন চলবে না। দীপুর ঠাকুমা কড়া লোক। নিয়মের ব্যতিক্রম পছন্দ করেন না।

দীপু আর কী বলবে, চুপ করে থাকে।

তুষারকণা বলে, নে বাবা, আমার রূপ দেখতে হবে না তোকে—পড় পড়। বইটা এগিয়ে ফেল। আমায় তো আবার রাত্তিরে পড়া দিতে হবে ফটিকমবাবুর কাছে!

দীপু বলে, আচ্ছা তুষারদি, রোজই তুমি পড়া দিতে হবে বল কেন গো? এ সব কি পড়ার বই? এই মেবার পতন, চন্দ্রগুপ্ত, খাশদখল, বিষবৃক্ষ, ইন্দিরা, বিল্বমঙ্গল—এসব তো গল্প উপন্যাস নাটক।

মুক্তোসারি ঝলসে ওঠে, ওই আমার পড়া। আমার বরমাস্টার ওই সবই আমায় এনে দেয়, পড়ে পড়ে বুদ্ধি বাড়বে বলে!···হুঁ, ভাবে ও পাসকরা বলে আমার থেকে বুদ্ধি বেশী! জানে না তো—হি হি, ওকে আমি এক হাটে বেচে আর এক হাটে কিনে আনতে পারি!

দীপুর ধারণা ছিল তুষারদির কাজ করতে করতে গল্পটা শুনে নেওয়ার জন্যেই দীপুর ভাগ্যে এমন জলুসের চাকরি! কিন্তু একদিন দীপু আকাশ থেকে পড়ল প্রকৃত তথ্য জেনে।

এতো প্রখর বুদ্ধি তুষারকণার, বরকে হাটে হাটে কেনা-বেচা করতে পারে, কিন্তু বইটই পড়তে পারে না।

দীপুর প্রশ্ন ছিল, নিজে নিজে না পড়লে তোমার মাথায় ঢোকে?

কেন, আমার মাথায় কি দরজা নেই? দেয়াল তোলা?

আহা, তাই বলছি নাকি? তবে আজ একটু শুনলে, কাল একটু শুনলে—এতে ভাল লাগে? শেষ না করে থাকতে পারো?

এর উত্তরের পরই দীপুর আকাশ থেকে পড়া।

পড়তে পারো না তুমি? ধ্যাঃও! ঠাট্টা করা হচ্ছে?

ঠাট্টা নয় হে মশাই, একদম খাট্টা। পেটে বোমা মারলেও 'ক' বেরোবে না!

দীপু স্তম্ভিত, বিচলিত।

তবে তোমার বর এতো এতো বই এনে দেন কেন?

ও কি জানে নাকি, আমি একটি মুখ্যু-ঢেঁকি! বিয়ের সময় আমাদের বাড়ি থেকে বলে দিয়েছিল, 'কথামালা' 'বোধোদয়' অবধি পড়েছে। হি হি, তাতেই বিয়ে হয়ে গেল। তা ওর ইচ্ছে আমি খুব বইটই পড়ি। এদিকে যে অণ্টরম্ভা। বইগুলো এনে দেয়, পরে থিয়েটার দেখতে গিয়ে বুঝতে পারব বলে। তো তোর কাছে শুনে শুনেই তো বেশ বুঝে যাই।

কিন্তু তুষারদি, যদি কোনোদিন উনি জানতে পারেন? যদি বলেন, ওঁর সামনে বসে পড়তে?

যদির কথা নদীতে যাক।

হেসে গড়িয়ে পড়ে তুষারকণা।

দীপু আহত হয়।

দীপু খুব দুঃখের গলায় বলে, আর এটা বুঝি জোচ্চুরি হল না?

তুষারকণা মোটেই দমে না, বলে, জগৎটাই তো জোচ্চুরির ওপর দাঁড়িয়ে আছে রে। আমি যদি এইসব বই-লিখিয়েদের মতন লিখতে পারতুম, আমাদের ওই মিত্তিরবাড়িটা নিয়ে গাদা গাদা বই লিখে ফেলতে পারতুম!

মাঝে-মাঝেই এরকম সব উল্টোপাল্টা কথা বলে তুষারকণা। মানে বুঝতে পারে না দীপু। কিন্তু 'বুঝলাম না' বলে ছেড়ে দিয়েই কি থাকা যায়? দীপুর মনের মধ্যে ভাবনার ঢেউ। দীপুর মনে হতে থাকে, এই সারাক্ষণ হেসে আর সেজেগুজে থাকা তুষারকণা নামের রহস্যময়ী মেয়েটির মধ্যে যেন একটা চাপা দুঃখের সমুদ্র লুকানো আছে।

কী সেই দুঃখ?

তা বোঝে না দীপু, কিন্তু দুঃখটা আছে তা বোঝে।

দীপুর মনের সামনে একটা আলো-আঁধারির জগৎ।

শুধু কি এই তুষারদি?

দীপুর মনে হয়, কত কতজনের মধ্যে, হয়তো বা সকলের মনের মধ্যেই, আর একটা মানুষ চুপ করে বসে থাকে, তার মধ্যে অনেক দুঃখ থাকে!

এই যে বঙ্কিমবাবু, ওনার মধ্যেও কি দুঃখ নেই? উনি যে আর একটা বিয়ে করবার ভয়ে, সকলের কাছে নিন্দে খেয়ে, মায়ের রাগ-দুঃখু সয়ে বৌকে নিয়ে পালিয়ে এসে এতো সুখে রেখেছেন, এতো এতো খরচ করেন, সব সময় সেজেগুজে থাকবার জন্যে এতো ভাল ভাল জামাকাপড় কিনে দেন, কিন্তু তুষারদি তাতে কৃতজ্ঞ কই? নাঃ, ও জিনিসের বালাই নেই তুষারকণার মধ্যে। বরং স্বামীর প্রতি যেন সর্বদা ব্যঙ্গ আর তাচ্ছিল্য-তাচ্ছিল্য ভাব।

সেটা কি ধরতে পারেন না বঙ্কিমবাবু?

কি জানি পারেন কিনা! ওঁর সামনে কি তুষারদি এমন উল্টোপাল্টা কথা কন? যা শুনলেই বুকটায় হঠাৎ ধাক্কা লাগে?

কথাগুলো যেন তুষারকণা নিজেকেই বলে, শুধু দীপু সামনে থাকে বলেই মনে হয় দীপুকে বলছে।

হয়তো ধবধবে ময়দার ফুলকো ফুলকো লুচি ভেজে তুলতে তুলতে হঠাৎ বলে ওঠে, আর একটা বিয়ে করার ভয়ে না হাতী! হুঃ, আমি যেন বুঝি না! হাটে হাঁড়ি ভেঙে যাবার ভয়, বুঝলি?

কিন্তু বেচারী দীপু!

বোঝে কই? এর মধ্যে হাঁড়িফাঁড়ি আসে কোথা থেকে রে বাবা!

হয়তো বিকেলে মুখের সামনে হাত-আয়না ধরে একখানা ভিজে গামছা মাথায় বেড় দিয়ে ঘুরিয়ে চিবুকের নীচে পাক দিয়ে আটকে রেখে চিরুনির কোণ দিয়ে একখানি একখানি করে পাতা কাটতে কাটতে হঠাৎ চোখের তারায় ফস করে আলো জ্বলে ওঠে। যেন কৌতুকেরই হাসি। যেন আরশিতে পড়া নিজের

ছায়াটার সঙ্গেই কথা বলে তুষারকণা মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় আমিও ওকে ধাপ্পা দিই! বোকা বনে ভ্যাকা হয়ে যাক। অথচ ট্যাঁ-ফোঁ করবার জোটি নেই। হি হি হি, কেমন জব্দ!...কিন্তু পারা যায় কই? যত দন্জালি ওই মুখেই।

দীপু ভয়ে ভয়ে বলে, কার সঙ্গে কথা বলছ তুষারদি?

হি হি হি! আয়নার ভেতরকার এই মুখপুড়িটার সঙ্গে। যে মেয়েটা সব জেনে বুঝে বোকা সেজে আহ্লাদে গলে পড়ে থাকে।

তোমার সব কথার মানে বোঝা যায় না তুষারদি!

এক্ষুনি তুই সব বুঝতে চাস? গাদা গাদা নাটক-নভেল গিলিস বলেই বুঝি এতো আস্বা? ওঃ!

দুর্বোধ্য একটু হাসি ফুটে ওঠে মুখে।

দীপুর মধ্যে তাই ওর প্রতি এতো আকর্ষণ!

চুল বাঁধা অন্তে তুষারকণা গা ধুতে যায়। সুন্দর সাবানদানীতে পিয়ার্স সোপখানা নিয়ে। বাসনমাজুনি ঝি পাছে মেখে নেয় খানিকটা, তাই সাবানকে ঘরে এনে রাখা। খরচ হয় তাতে দুঃখু নেই বাবা, গায়ে মেখেছে ভাবলেই গেছি।

কোনো কোনো দিন মাঝখানের খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দীপুর মা'র সঙ্গে কথা হয় তুষারকণার। সংসারেই এটা-ওটা কথা।

গয়লাকে একটু বলে রাখবেন মাসিমা, কাল যদি দুধ একটু বেশী দিতে পারে।...ধোপানী এবার কত দেরি করছে মাসিমা দেখেছেন।

ধোপা গয়লা ঝি সবই দু'বাড়ির এক। অর্থাৎ ওরা আসার পর মা'ই সব ঠিক করে দিয়েছেন, আহা, ছেলেমানুষ একা এসে পড়েছে বলে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কত সময় চলে যায়।

কিন্তু মা যদি বলেন, এ ঘরে এসে বোসো না তুষার। অমনি বলবে, না মাসিমা, কাজ রয়েছে। উনুনটা বোধ হয় ধরে গেল।

মণি রেগে রেগে বলে, হ্যাঁ সব সময় কাজ! আমাদের বাড়িতে আসবেন না তাই। নেহাৎ মহরম দেখতে, কি মাড়োয়ারীদের বিয়ের বরের প্রসেশান দেখতে ছাড়া আসেন কোনোদিন? বড়লোক যে!

দীপু তখন ওপক্ষের উকিল হয়।

আহা, বড়লোক আবার কি? নিজে হাতে সব কাজ করেন।

ওঃ ভারী তো কাজ! জানিস না ওনার ওই শ্বশুরবাড়িটা কী মস্ত, রাজ-বাড়ির মতন। তাই অহংকার!

কিন্তু দীপু যে প্রেম-মুগ্ধ। দীপু কী করে বুঝবে ওই সুক্ষ্ম তত্ত্ব।

দীপু হাঁ করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে, গা ধুয়ে এসে, গা-ভর্তি পাউডার মেখে, তবে সেমিজ কাপড় পরার পারিপাট্য। সাবান দিয়ে মুখ ধুয়েও, কপালের চুলের পাতাদের অনড় থাকার মহিমা।

তবে তুষারকণা হেসে হেসে বলে, এতেই হাঁ হচ্ছিস? আমার মেজ জা চান করে আসে, তবু পাতা নড়ে না।

তোমরা সবাই পাতা কাটো?

তা আবার নয় ? যার চুলের ভাঁড়ারে মা ভবানী, তাকেও পরিপাটি হতে হবে।

হ্যাঁ, ওই বনেদী মিত্তিরবাড়িতে এই ধারা।

বৌদের সব সময় সেজে গুজে থাকতে হবে। পাছে কেউ এসে দেখে, বৌরা তেমন পরিপাটি নেই, তাহলে হয়তো ভেবে বসবে, বৌদের খুব খাটতে হয়।

সারাক্ষণ অষ্টাঙ্গ সোনায় মুড়ে ঘুরে বেড়াও। সোনার গাদা কি সিন্দুকে পড়ে পড়ে পচবার জন্যে ? আছে তা লোকে দেখবে না ?

তুষারকণার অবশ্য গায়ে বেশী সোনা নেই। তুষারকণার শাশুড়ী যে কাশী যাবার সময় লোহার সিন্দুকের চাবিটি সঙ্গে নিয়ে গেছেন।

গা ধুয়ে সাজাগোজার পর তুষারকণা শোবার ঘরে জানলার সামনে একটা চেয়ারে বসে বোনার সরঞ্জাম হাতে নিয়ে। গলির দিকেরই জানলা, তবে এই গলি দিয়েই তো অফিস-ফেরতা লোকের আসার পথ !

জানলা দিয়ে দেখতে পেলেই বলে ওঠে তুষারকণা, ওই যে আমার প্রভু আসছেন !

ব্যাস ! দীপু তৎক্ষণাৎ হাওয়া।

বঙ্কিম মিত্তিরকে দীপুর বড় ভয়।

হয়তো বা আবার ঈর্ষার বিরক্তিও। প্রতিদ্বন্দ্বী-প্রতিদ্বন্দ্বী ভাব। অথচ লোকটাই বৈধ অধিকারী।

তুষারকণা ওঠে সদর দরজাটা খুলে দিতে।

আর দীপু চলে আসার পর মাঝখানের দরজাটা খিল লাগিয়ে দেয়।

মণি বলে, এইবার তাড়িয়ে দিল তো ?

আহা ! তাড়িয়ে আবার কী ?

আমি একেই তাড়িয়ে দেওয়া বলি !

তুষারকণার আসার পর থেকে মণি আর দীপুর মধ্যে এই ধরনের সংঘর্ষ ঘটে।

তবু সকাল হতে মাত্রই দীপুকে ওই দরজাটা টানতে থাকে। কোনমতে দুপুর পর্যন্ত আটকে থাকা।

আর এই টানও তো কম জোরালো নয়।

কাল আবার কী বই নিয়ে এসেছেন বঙ্কিমবাবু লাইব্রেরী থেকে কে জানে ! তবে নাটকেই বেশী ঝোঁক বঙ্কিমের।

অনেক বইই অবশ্য দীপুর পড়া। মা'র সংগ্রহশালার গ্রন্থাবলীদের মধ্যে অনেকেই আছে। তবু একটা বই দশবারও তো পড়া যায়। তাছাড়া চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়ার এবং অন্যকে বোঝানোর মধ্যে যেন নতুন করে মানে মাথায় এসে পড়ে।

নাটকের ঝোঁকই বেশী বঙ্কিমের।

এসেই বলে, এই নাও এটা পড়ে রাখো, শনিবার দেখতে যাব। গল্পটা আমায় একটু বলে দিও।

তা এমনই চালাক মেয়ে তুষারকণা, একবার শুনেই অন্তরস্থ করে ফেলে। এবং গল্পটা বরকে বলে রাখতে হারে না।

গানগুলো তো দু'তিনবার শুনে নিয়ে মুখস্থ করে ফেলে।

তবে তখন অবশ্য থিয়েটারের হ্যাণ্ডবিলেও নাটকের বিষয়বস্তুর সারাংশ এবং গানগুলি ছাপা থাকত। দীপুদেরও তো থিয়েটার-দেখা-বাতিকের বাড়ি।

তবু—

তুষারকণা এক রহস্য!

হঠাৎ হঠাৎ বলে ওঠে, ওখানে থাকতে, বাড়িসুদ্ধ সব মেয়েমানুষগুলোকে তো নিয়ে যেতে হতো—এ তো হয়ে উঠত না। এখন একলা নিজের পরিবারটিকে নিয়ে হপ্তায় দুদিন থিয়েটার দেখা! ভাবে—আদর তোয়াজ করে ভুলিয়ে রাখবে। হুঁ, অতো সোজা নয়!

নিজের মনে কথা বলে বলে ওঠে তুষারকণা।

আর দীপু নামের মেয়েটা সেই কথার জগৎ থেকে হঠাৎ হঠাৎ অন্য একটা জগতে চলে যায়।

বুঝতে পারার জগৎ। উপলব্ধির জগৎ।

আচ্ছা আমি একদিন জোরজার করে বলব, কথার এসব মানে আমায় বলতেই হবে তুষারদি।

কিন্তু সেই বলার সুযোগ কি আর পেল দীপু?

বেশ একখানা ঘটাপটার বিয়ে নেমন্তন্নয় যাওয়ার কথা নিয়ে বাড়িতে ক'দিন থেকে চাঞ্চল্যের ঢেউ উঠেছে। এক-আধদিনের ব্যাপার তো নয়, অন্ততঃ দিন দশ পনেরোর মত যাওয়া! আর তোড়জোড় নেই? দীপুদের ছেলেবেলায় তো রিকশাগাড়ি বলে কোনো পদার্থ ছিল না যে বিয়েবাড়িতে রোজ রোজ যাতায়াত করা যাবে? হলেও এ-পাড়া ও-পাড়া। ঘোড়ারগাড়িও তো শস্তা নয় যে দু'বেলা যাতায়াতের বাবুয়ানা চালানো হবে!

তা পাল্কি বলে জিনিসটা তখনও কলকাতার রাস্তায় চালু ছিল বটে, কিন্তু একটা পাল্কিতে তো আর দু'জনের বেশী বসা চলে না? তবে? ছ'জনের জন্যে ক'টা পাল্কি লাগবে তা হলে? হরেদরে তো হাঁটুজল হবে।

ঘোড়ারগাড়ি একখানা ভাড়া করে, একেবারে সদলবলে দিন-পনেরোর মত জামাকাপড় গুছিয়ে নিয়ে পাড়ি দাও বাবা, যথাসময় সেইভাবেই ফিরে এসো। হয়ে গেল!

কিন্তু কথা হচ্ছে, পনেরো দিন ধরে বিয়ে চলবে কেন?

আহা বিয়েটা কি আর এতো দিন ধরে চলবে? মেয়ের বিয়ে, সে তো এক দিনের মামলা। তবে সেই 'একদিনের' আগে পিছে অন্ততঃ একটা করে সপ্তাহ মার্জিন রাখতে হবে না? তবে আর ঘটা কী? আমোদ-আহ্লাদ কী? তা ছাড়া দীপুদের মা'র ভাইঝির বিয়ে! এক্ষেত্রে মায়ের—তথা দীপু-মণিদের ভূমিকা তো বিরাট। মামা আগে থেকে তাঁর যেখানে যত নিকটআত্মীয় আছে, (তিন তিনটি কুল মিলিয়ে নিকটাত্মীয় পরমাত্মীয়ের সংখ্যাও তো নেহাৎ কম

নয়) তাদের আগে থেকে জানান দিয়ে রেখেছেন, বিয়েতে আসতে হবে, অন্তত দশ পনেরো দিন থাকতে হবে, কোনো আপত্তি গ্রাহ্য হবে না। না এলে আড়ি হয়ে যাবে মনে রেখো। লোক না হলে বিয়েবাড়ি জমে ?

আজমীরে থাকা এই ন'মামাকে দীপুরা কবে দেখেছে, কিংবা আদৌ দেখেছে কিনা মনে করতে পারে না, তবে চিঠিপত্তর লেখেন খুব। মা তো 'ন'দা বলতে অজ্ঞান।

অতো দূরে থাকেন, ছুটিও কম, তাই বিয়ে বাবদ যত দায়দায়িত্বর কাজ, চিঠি লিখে এই কলকাতায় থাকা আত্মীয়দের ওপর চাপিয়ে রেখেছেন। রাখবেন না ? যে বেচারীদের চাকরির খাতিরে দেশভুঁই ছেড়ে বরাবর বিদেশে পড়ে থাকতে হয়, তাদের কোনো দাবি নেই আরামসে কলকাতায় থাকা আত্মীয়দের ওপরে ?

যাঁদের ওপর ভার অর্পণ করা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে প্রধান হচ্ছেন দীপুদের দুই মহা করিৎকর্মা মাসতুতো দাদা। বুড়োদা আর গবুদা। এঁরা নাকি দীপুর মায়ের সঙ্গে প্রায় একবয়সী। বড়মাসির ছেলে তো! দীপুদের মা তো দিদিমার শেষ তলানি মেয়ে।

তা সেই দিগ্‌গজ দিগ্‌গজ দুই ভাগ্নের ওপরই সর্বতোভার। যাতে দূর থেকে একেবারে বিয়ের সময় সময় এসে কোনো অসুবিধেয় না পড়ে যান।

মামার ধারণায় অবশ্য কাজ আর এমন কী ? ব্যাপার তো এই, যাতে শত-খানেক লোক বেশ খেলিয়ে ছড়িয়ে দিন-পনেরো থাকতে পারে, সেইমত একখানি দশাসই বাড়িভাড়া করে ফেলে ('বিবাহের জন্য ভাড়া দেওয়া হয়' এমন ভাষাটা তখন চালু না থাকলেও, গরমের ছুটির সময় ইস্কুল বাড়ি-টাড়ি ছাড়াও, পেল্লায় পেল্লায় সব বাড়িও তো পড়ে থাকতো কপালে 'টু লেট' লটকে।) মজুর মেথর লাগিয়ে তাকে সাফ-সুৎরো করে নিয়ে রান্নাঘরে বৃহৎ বৃহৎ গোটা দুই তিন উনুন পাতিয়ে রাখা, আর এ-বাড়ি ও-বাড়ি থেকে সংগ্রহ করে এনে যতগুলো সম্ভব চৌকি তক্তপোশ ঘরে ঘরে পাতিয়ে রাখা। তাছাড়া দশ বারো জোড়া মাদুর, কুড়ি-তিনেক হাতপাখা, গোটা পনেরো-ষোলো বালতি, জোড়াকয়েক গামছা দু'দশটা মগ ইত্যাদি কিনে রাখা। তাছাড়াও কয়েকটা অ্যাসিটিলিন গ্যাসবাতি ভাড়া করে রাখা। হলেও রাজবাড়ি, প্রাসাদপুরী, সেখানে বিজলী বাতির প্রশ্ন তো নেই।

এ ছাড়াও বেশ কয়েকটা ঠিকে ঝি চাকর আর রান্নার ঠাকুর আগের দিন থেকে নিয়োগ করে রাখা। এই তো! এ আর এমন কি শক্ত ? টাকা তো বেশ যথেষ্ট পরিমাণেই পাঠিয়ে দিয়েছেন আগে থেকে।

অবশ্য এসব ছাড়াও খুঁটিনাটি কাজ আছে কিছু কিছু। অনেক কিছুই।

যেমন বেশী করে ঘুঁটে কয়লা কাঠ কেরোসিন মজুত রাখা। অন্ততঃ দিন দুইয়ের রান্নার মত চাল ডাল তেল নুন ইত্যাদি করে মাল-মশলা কিনে রাখা। আর আজমীর থেকে ওঁরা, এবং এদিক ওদিক থেকে আরো যাঁরা যাঁরা রেল-গাড়ির যাত্রী আসছেন তাঁদের জন্যে চৌবাচ্চায় জল ভরিয়ে রাখা। অতঃপর

আন্দাজ মতো রান্নাবান্না করিয়ে রাখা। আন্দাজটা অবশ্য বামুনঠাকুরই করে দেবে আর হাঁড়ি কড়া বাসনপত্রও সাপ্লাই করবে।

এ ছাড়া যেটা ন'মামা বলে না পাঠালেও বুড়োদার বিবেচনার ফলস্বরূপ, রেলগাড়ির সময় অনুয়ায়ী, মাটির গামলায় বড় এক গামলা ঘোলের শরবৎ বানিয়ে তার মধ্যে মস্ত একখানা বরফের চাঙড় ভাসিয়ে রেখে দেওয়া। সঙ্গে দু'চার গোছা মাটির গেলাস। চায়ের পাট তো নেই মামাদের, তেষ্টা ভাঙাতে ঘোলের শরবৎ ছাড়া আর কী হবে? ডাব এককাঁদি কিনে রাখা যেতো, কিন্তু তার মধ্যে তো আর বরফ ভাসিয়ে রাখা যাবে না? তা এটুকু আর এমন কী?

এটুকুও যদি না করবে, তবে আর আত্মীয়জন বলেছে কেন?

তা বুড়োদা আর গবুদা যেন আপ্রাণ সাধনা চালিয়ে চলেছেন, আত্মীয় কাকে বলে দেখাতে! দীপুদের বাবা অবশ্য দেখেশুনে বলছেন, 'বাহাদুরি দেখাতে।'

মা বললেন, বেশ, বাহাদুরি দেখানোর জন্যেও তুমি পারবে এই কদিনের মধ্যে এই বিরাট কাণ্ড করে তুলতে?

বাবা ধুতির কোঁচার আগায় 'ফুল' বানাতে বানাতে বললেন, আমাকে তো আর ভুতে পায়নি।

তবে দীপুদের দাদা ছোড়দা অবশ্য কিছু কিছু সাকরেদী করেছে বুড়োদাদের। যেমন বাড়ি সাফ করাবার সময় দাঁড়িয়ে থেকে তদারকী করা। তেনারা আসার দিনকে গবুদার যখন তরকারি কিনতে বাজারে যাবেন, তখন বিয়েবাড়িটা পাহারা দেওয়া, বাড়ির দেওয়ালে দেওয়ালে চারটি পেরেক পুঁতিয়ে রাখা মশারি টাঙাবার জন্যে।

ওরাই এসে বলল, উঃ, যা একখানা বাড়ি যোগাড় করেছেন বুড়োদারা! একসঙ্গে এরকম দু-চারটে বিয়ে দেওয়া যায়! কত যে ঘর গুনে শেষ করা যায় না। আর কী উঁচু উঁচু জানলা দরজা! বলে ফুরোবার নয়। বাড়িতে সিঁড়িই তিনটে। দুটো তো দুদিকে আছেই, আবার রান্নাঘরের ছাতে ওঠার জন্যে নীচের রান্নাঘরের সামনের চাতাল থেকে একটা কম-দামী সিঁড়ি। সে ছাতে নাকি মনে হয় জাল ঢাকা ছিল, ভাঙা ভাঙা লোহার ফ্রেম, আর কাটা-ছেঁড়া জালের ধ্বংসাবশেষ সেই স্মৃতি বহন করছে।

দাদাদের মুখে শুনে শুনে মনের মধ্যে কী উচাটন!

উঃ, কবে সেই বিয়েবাড়িতে যাবার দিনটা আসবে!

তোমাদের কী মজা ছোড়দা! কেমন যতবার ইচ্ছে দেখে আসতে পারছ! আমাদের একবার দেখিয়ে আনো না ছোড়দা।

তোদের? তোরা অতটা হাঁটতে পারবি?

খুব পারবো। ফুলি না পারুক আমরা ঠিক পারবো।

হুঁঃ, বলে দেখ্ না একবার গার্জেনদের। পারমিশান পাস তো নিয়ে যাবো।

গার্জেনদের?

মানে মা বাবা তো? দীপুরা জানে দরবার কথা বৃথা। মা বলবেন, এই

তো দুদিন পরেই যাবি, আর তর সইছে না ?

আর বাবা বলবেন, গিয়ে কী চতুর্ভুজ হবে ? মাথার মধ্যে এসব পোকাগুলিকে ঢোকায় ?

জানে। আন্দাজেই জানে।

ছোড়দা, সত্যি 'রাজার বাড়ি' ?

তাই তো শুনলাম। বড়োদাই বললেন কোন্ নাকি রাজার বাড়ি।

কোথাকার রাজা গো ?

তা জানি না। কলকাতারই কোনো রাজা-টাজারই হবে।

কলকাতায় আবার রাজা থাকে নাকি ছোড়দা ? রাজারা তো বিদেশে থাকে।

ইস্! কী হাঁদার মত কথা রে! আর কারো কাছে বলে বসিস নি যেন্। কলকাতায় তো রাজার ছড়াছড়ি। কেন রাজা রামমোনের নাম জানিস না ?

আহা! ও আর কে না জানে!

রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর ? জানিস না ?

সে তো জানি! সে তো সব অন্য রকম রাজা।

অন্য রকম আবার কী ? রাজা ইজ্ রাজা। বেশ ধর্ তাহলে শোভাবাজারের ? দেখিসনি তাঁর রাজবাটি ?

আহা! সে তো দেখেইছি। দুগ্গা ঠাকুর দেখতে গিয়ে। কিন্তু ওসব কি সত্যি রাজা ? তাহলে প্রজা-টজা কই ?

আছে নিশ্চয় কোথাও।

তা ওঁরা তো আর ওঁদের বাড়িটা ভাড়া দিতে আসবেন না ?

আসবেন না তা কি জোর করে বলা যায় ? একটু ঠাট্টা-ঠাট্টা ভাবের হাসি (যেটা ছোড়দার স্বভাব) হেসে বলেন ছোড়দা, এক সময় রাজা, আবার এক সময় হাজা মজা গজা!

মণি দীপু দুজনেরই ব্যাকুল প্রশ্ন, রাজত্বগুলো কোথায় যায় তাহলে ?

যেভাবে যাবার, সেভাবেই যায়। যত ইচ্ছে বিলাসিতা, যত ইচ্ছে জাঁকজমক! তারপর রাজপুত্তুরদের দু'হাতে উড়নো পুড়নো, আর শেষ পর্যন্ত জ্ঞাতিদের সঙ্গে ঝগড়াবিবাদ মামলা-মকদ্দমা। রাজারাজড়াদের তো আবার ঘরজামাই পুষ্যিপুত্তুর এঁরাও থাকেন। যাদের ওই সব রাজত্বের প্রতি কোনো মায়া ভক্তি নেই, শুধু টাকার পাহাড় হাতে পেয়ে—

হঠাৎ দালান থেকে বড়দা বলে উঠলেন, জ্ঞান দেবার আর লোক পেলি না তাজু ?

দাদার এখন এনট্রেন্স পাসের পড়া পড়ায় নিমগ্ন থাকার কথা, কিন্তু বাড়ির সব কথাটথা ঠিকই কানে যায়!

ছোড়দা হেসে উঠে বললেন, 'জ্ঞান' তো অজ্ঞানকেই দিতে হয় দাদা! জ্ঞানী-জনকে দিতে যাব নাকি ?

ওরা সব বুঝল কেমন ?

না বোঝবার কিছু নেই। বোঝালেই বুঝতে পারা যায়।

দাদা শুধু একটু হুঃ করলেন। দাদা ছোড়দার মত অতো আশাবাদী আর উৎসাহী নয়। মেয়েদের মাথায় গোবরভরা, এই ধারণাতেই বিশ্বাসী। হয়তো মজ্জাগত ধারণা থেকে চ্যুত হতে পারেননি এখনো।

নাঃ, সেই যথাদিনের আগে আর একবার গিয়ে দেখে আসা যাবে না রাজবাড়িটা কেমন! তাই দিন গোনা চলতে থাকে।

অবশেষে সেই দিনটা আসে।

নেমন্তন্নর চিঠি হাতে নিয়ে সতুদা এসে হাজির হন,—ঠাকুমা ন'কাকারা, পাটনা থেকে নতুন কাকারা, সবাই এসে পড়েছেন সকালে, বিকেলেই চলে যেও। হ্যাঁ, আর ন'কাকা বলে দিয়েছেন পনেরোটি দিন তোমাদের, আমাদের কারুর বাড়িতেই রান্না-টান্না চলবে না। উনুন জ্বালা হবে না।

ওমা সে কি রে? আমি অবিশ্যি যাবো ছোট কটাকে নিয়ে। কিন্তু রাজু তাজু তোদের পিসেমশাই, এঁদের আপিস ইস্কুল নেই?

আমি ওসব জানিটানি না। আমায় যা বলতে হুকুম করা হয়েছে, তাই করে গেলাম, ব্যাস! তারপর তোমাদের ব্যবস্থা। রাঙাকাকা আসছেন পরশু, নতুন কাকাও বোধ হয় তাই।

হ্যাঁরে সতু, বড়দা আসতে পারেন না? কতো—কতো দিন দেখিনি।

জ্যাঠামশাই? লাহোর থেকে? জ্যাঠামশাইয়ের তো হার্টের অসুখ। আসার কথা ওঠেই না। তা জ্যাঠামশাইয়ের মেয়েরা আসবেন শ্বশুরবাড়ি থেকে।

মা'র ইচ্ছে হচ্ছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আরো সব জিজ্ঞেস করেন, কিন্তু চলে গেলেন তাড়াতাড়ি। আরো অনেক বাড়ি যেতে হবে। ভাগেদের দিয়ে অন্য যত যাই কাজ করানো হোক, এই নেমন্তন্ন-পত্তরটি নিয়ে বাড়ি বাড়ি যাওয়ার কাজটি তো হবে না। তার জন্যে ভাইপো! 'বাড়ি'র ছেলে। যেখানে যেখানে মেয়ে-নেমন্তন্ন করতে হবে, সেখানে সেখানে বাড়ির একটা ছোটোমোটো মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। তা নইলে মেয়ে-নেমন্তন্ন গ্রাহ্য নয়।

তা বলে কি আর মাসি-পিসিদের কাছে এসব? যারা বিয়েবাড়িতে গিয়ে আধমাসটাক বসবাস করতে যাবে! ওসব কুটুমদের ব্যাপার। খুব সেজেগুজে, মাত্র বিয়ের রাত্তিরে নেমন্তন্ন খেয়ে যাবেন, তাঁদের জন্যে।

বাবা অফিস থেকে ফিরে বললেন, সবাই মিলে পনেরো দিন? খেপেছ? রাজু তাজু আমি বাড়িতেই থাকব। কেন; বামুনদিকে ছুটি দিয়ে যাবে নাকি?

মা বললেন, সে কথা কে বলেছে? তবে অনেক করে বলে পাঠিয়েছেন।

তা কী করা যাবে, তোমার ন'দা যেমন পাগল। একমাত্র মেয়ে বলে দশটা মেয়ের বিয়ের সাধ মিটিয়ে নেবার বাসনা। দূর।

শেষ পর্যন্ত রফা, আজ তো মা বিকেলের দিকে দাদা ছোড়দারা ইস্কুল থেকে ফিরলে ওদের সঙ্গে বাক্সপ্যাটরা আর মণি দীপু ফুলি গোপালকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ুন। তারপর যা হয় দেখা যাবে

বিকেল।

উঃ, বিকেল আসতে কত দেরি হচ্ছে আজ ? দুপুরটা ফুরোচ্ছেই না যে। দাদাদের বা ইস্কুল থেকে ফিরতে এতো দেরি কেন ? এরপর আসবেন, জলখাবার খাবেন, ফর্সা জামাকাপড় পরবেন, তবে তো গাড়ি ডাকবেন। না, আর ধৈর্য ধরা যাচ্ছে না। সন্ধ্যে হয়ে গেলে কি তেমন করে দেখে নেওয়া যাবে রাজবাড়িটা ?

অবশেষে ধৈর্যের পরীক্ষায় পাস করা গেল। গাড়ি ডাকা হল। দুটো দাঁড়ি দেওয়া ঘোড়ার গাড়ি।

ছোড়দা বলে উঠলেন, এঃ মা, এই প্যাঁটরাটা নিয়ে তুমি বিয়েবাড়ি যাচ্ছ ? রং-ফং গুবলেট হয়ে গেছে।

মা বকে উঠলেন, তা ক'দিনের জন্যে বিয়েবাড়ি যাব বলে আর একটা নতুন প্যাঁটরা কিনব আমি ?

কেনাই উচিত ছিল। এতো দিকেও তো খরচ হয়।

উচিত কাজ আরো অনেক আছে তাজু, থাকে, সব কি হয়ে ওঠে ?

ন'মামা অতো বড়লোক, এটা দেখে হাসবেন।

মা ভারী গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, বিয়ের সময় ন'দাই ওটা কিনে এনেছিলেন।

বিয়ের সময় ? কার বিয়ের সময় ?

কার আবার! আমারই।

ওরে শ্বাস! সেইটা এখনো আছে ?

মা এখন হেসে ফেললেন, রক্তমাংসর কাঁচা মাল আমি তো রয়েছি। লোহার জিনিসটা থাকবে না ? এ তো আর টিনের তৈরী নয়, আসল স্টীলের। কেননা চার পাঁচ টাকা দাম ছিল। তা ন'দা বরং দেখে খুশিই হবেন, বোন কত গোছানো বলে।

দীপুর চিরকেলে রোগ, মানুষের হঠাৎ ভাব পরিবর্তনটা বড় বেশী বুঝে ফেলতে পারে। ওর মনে হল মা যেন ইচ্ছে করে মন থেকে ভারটা ঝেড়ে ফেলতে চাইছেন। হয়তো মা'র মধ্যেও রাজবাড়ি দেখার কৌতুহলটা মাকে চঞ্চল করে তুলেছে। না কি যত সব আপনার লোককে দেখার আশায় ?

তা এ রোগটা আছে বটে দীপুর মা'র। বাপের বাড়ির লোকেদের মধ্যে গিয়ে পড়লেন তো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিস্মৃত! তখন নিজের ছেলেমেয়েদের চিনতেই পারেন না যেন। হবে—সেই দশাই হবে দীপুদের এখন, বোঝাই যাচ্ছে! যে রকম 'সব্বাই' আসবার কথা হচ্ছে।

মণি অবশ্য খুব উৎফুল্ল। অনেক 'তুতো' বোনদের সঙ্গে দেখা হবে। মণি অনেকের সঙ্গে ভিড়ে যেতে পারে, দীপু পারে না। ফুলি তো আরোই। ফুলি শুধু দীপুর ছায়ায় ছায়ায় ঘোরে।

সেই প্যাঁটরাটা অতঃপর ঘোড়ার গাড়ির মাথায় চড়ল। তার সঙ্গে একটা বড়সড় বেতের ঝাঁপিও। গাড়ির মাথায় চাপলেন দাদাও। গাড়ির মধ্যে

মেয়েদের সঙ্গে বসায় রাজুর ছেলেবেলা থেকেই আপত্তি। বরাবর ও বড়দের সঙ্গে গাড়ির মাথায় চড়ে বসে। তাজুর অতশত কিন্তু নেই। তাকে যদি কোথাও পথপ্রদর্শক হয়ে যেতে হয় তো আলাদা কথা। নইলে ভেতরে বসতে অরাজী নয়। এখনও ভেতরেই বসল সে। একদিকে মা, গোপাল আর তাজু—অন্যদিকে এরা তিন বোন।

অবশ্য কতক্ষণই বা বসাবসি! এপাড়া থেকে ওপাড়া বৈ তো নয়। একটু পরেই গাড়ি 'রাজবাড়ি'র সামনে এসে থামলো। বিকেল পাঁচটা।

বৈশাখ মাস। এখনো আকাশের আলো যথেষ্ট। দীপু চুপি চুপি বলল, আমরা গিয়েই ছুট্টে দোতলায় তিনতলায় চারতলার ছাতে চলে যাব, অ্যাঁ?

মণি বলল, লোকে তাহলে পাগল বলবে।

লোকে সব কিছুতেই পাগল বলে কেন মণিদি?

ওই তো মজা! নিজের ভাল না লাগলেই বলবে, 'ও পাগল'।

হুঁ। আসলে নিজেরাই পাগল তাই!

তা কথাটা মিথ্যে নয় বোধ হয়। গাড়ি থেকে নামামাত্রই ন'মামার বড় ছেলে প্রসাদদা হাতে একটা বটুয়া মত থলি নিয়ে এসে গাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে বললেন, কত লেগেছে?

মা বললেন, থাম তো! তোকে আর গাড়িভাড়া দিতে আসতে হবে না। ভারী তো চার আনা পয়সা! আমিই দিয়ে দিচ্ছি।

প্রসাদদা বললেন, পাগল নাকি! এইজন্যেই বলে আমায় দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে থলি হাতে নিয়ে। আরো কত সবাই আসবে।

তার মানে এতেও 'পাগল' কথাটা উঠল।

উঠল, ভেতরে ঢোকার পরই, 'দেরি কেন'র উত্তর শুনে।

দিদিমা বললেন, তুই পাগল না ছন্ন সরস্বতী! ছেলে দুটো ইস্কুল থেকে আসা মাত্রই তো চলে আসবি। তা নয় জলখাবারটাবার খাইয়ে—ছি ছি। এখানে বামুনঠাকুর কোন্ কালে উনুন ধরিয়ে লুচি আলুরদম মোহনভোগ পটলভাজা করে ফেলে এখন বোঁদে ভাজতে বসেছে। মেয়েরাও খাবার খেয়ে এসেছে? সাধে বলছি পাগল!

বড়মাসিমা বললেন, এসেছে তো এসেছে, আবার বসে পড়ুক সবাইয়ের সঙ্গে। যা, ওই সামনের বড় দালানে।

তা তাতে অবশ্য আপত্তির কিছু নেই। বাড়িতে খাবার খেয়ে আসা হয়েছে বলে বিয়েবাড়িতে অনেকের সঙ্গে খাওয়াটা বাদ দিতে হবে? পাগল নাকি?

বড় দালানে ছোট ছোট কলাপাতার সারি পড়েছে, সঙ্গে কুশাসন।

তবু দীপু খোশামোদ করতে লাগল, চল না মণিদি ছুট্টে একবার, ছাতটা দেখে আসি!

কিন্তু মণি তো আর পাগল নয়!

ছাত দেখা হল পরদিন ভোরে।

উঃ, কী ছাত রে বাবা! গড়েরমাঠ বললেই হয়। তবে দু'তিন জায়গায়

উঁচু-নীচু আছে দু-তিনটে সিঁড়ি দিয়ে। তবু এ-দিক ও-দিক তাকালে আবাক লাগে।

আর বাড়ি?

পনেরো দিন থেকেও দীপুরা সব ঘরগুলো গুণে উঠতে পারেনি, খেই হারিয়ে ফেলেছে। এ-দিকের সিঁড়ি দিয়ে উঠে এক রকম, ও-দিকের সিঁড়ি দিয়ে উঠে আর এক রকম। বিশেষ করে বারান্দাগুলো। কোন্ ঘর থেকে বেরিয়ে কোন্ বারান্দায় পড়ছে কে জানে! সবই তো কালো কালো ছাপ ধরে যাওয়া মার্বেল পাথরের টালী মোড়া।

ঘরের মধ্যেকার মার্বেল পাথরগুলো তবু বেশ ফর্সা ফর্সা, বারান্দাগুলোয় বোধহয় রোদে জলে ধুলোয় এমন দশা!

বুড়োদার কথা মিথ্যে নয়, এ বাড়িতেএকসঙ্গে তিন-চারটে বিয়ে দেওয়া যায়।

পনেরো-ষোলোটা তক্তপোশ, এক কুড়ি মাদুর, খানদশেক শতরঞ্চি সবই পাতা হয়েছে, কিন্তু তারা যেন এখানে নস্যি হয়ে গেছে! কোথায় পড়ে আছে খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছে না যেন।

মেয়েমানুষরা আর ছোট ছেলেমেয়েরা সবাই তো নীচের তলায় আড্ডা গেড়ে ফেলেছে। বড় ছেলেরা আর কর্তাব্যক্তিরা দোতলায়। তিনতলাটা পুরো ফাঁকা। দোতলারও অর্ধেকটা।

আগে অনেকে আসবে অবশ্য, তবু কতই আর ভরবে? ঘরের মাপ যদি এমন হয়, কুড়িটা লোক হেসে খেলে ঘুমোতে পারে, আর তেমন ঘর যদি অগুনতি হয়? কত লোককে ডেকে আনবেন মা'র ন'দাদা তাঁর এক মাত্তর মেয়ের বিয়েতে? তিনি তো আর রাজারাজড়া নন।'

তা তিনতলায় কেউ উঁকিও দিতে গেল না। যত কলকোলাহল নীচের তলায়। সেখানেই তো রান্না-খাওয়া কুটনো-বাটনা, মাছ কোটা, হৈচৈ। তারই পাশের দিকের একটা ঘরে যত দিদি-বৌদিদের জটলা। কেবলই হি হি, খি খি!

দীপু ভেবে পায় না কী নিয়ে এতো হাসি ওদের? আর বুঝবেই বা কী, একটু গিয়ে পড়লেই তো শুনতে হবে, তোরা এখানে কেন রে? পাকা পাকা কথা শিখতে? যা ভাগ!

মণি কিন্তু নিজ স্বভাবগুণে ওদের মধ্যে পাত্তা পেয়ে গেছে। অথচ কতই বা বড় মণি দীপুর থেকে?

অতএব দীপুর সঙ্গী ফুলি আর ন'মামীর বাপের বাড়ির থেকে আসা কার যেন মেয়ে ইন্দু—ওরাই একসঙ্গে ঘোরে।

ওদের বয়সী আরও কি নেই কেউ? আছে। তারা এদের দলে ভিড়তে চায় না। পাগলের মত শুধু ফাঁকা ফাঁকা ঘরে দালানে বারান্দায় ঘুরে বেড়াবার মধ্যে কী রস আছে বোঝে না তারা।

ইন্দু ঠিক দীপুর মত। ওকেও সবাই বলে বোকা হাঁদা খাপছাড়া!

ভাগ্যিস তুই এসেছিলি!

ইন্দু কৃতজ্ঞ, একা একা ছাতে উঠতে, তিনতলায় ফাঁকা ঘরে ঘুরে বেড়াতে

নিশ্চয় ভয় করতো। ভয় অবশ্য এদেরও করে না তা নয়, তবে সব সময় তিনজনে সেঁটে থাকে তো! আর ভয়-ভয় করলেই মনে মনে বলে নেয়, 'ভূত আমার পুত, শাঁকচুন্নি আমার ঝি, রাম-লক্ষ্মণ বুকে আছেন, ভয়টা আমার কী!'

রোজ রোজ এই দেখা ঘরগুলো আবার দেখার মানেটা কী? মানে হচ্ছে, দেখেও যে গুলিয়ে যায়। মনে হয় এগুলো বোধ হয় দেখা হয়নি।

কিন্তু ঘর তো খালি, দেখবার কী আছে?

কী আছে? ছাত থেকে ঝুলে থাকা ঝাড়লণ্ঠনের আলো নেই? ভীষণ উঁচু উঁচু জানলার শার্সিতে শার্সিতে নানারকম ছবি আঁকা নেই? লক্ষ্মী, সরস্বতী, রাধাকৃষ্ণ, গণেশ, হরপার্বতী, সাহেব মেম।

কাঁচের ওপর কী করে ছাপ মারে রে ইন্দু, জানিস তুই?

ইন্দু অবলীলায় উত্তর দেয়, বিলিতি কলকব্জার ব্যাপার, আমরা কী বুঝব!

আচ্ছা এতোবড়ো বাড়ি কী জন্যে তৈরী করে রে লোকে?

বাড়িতে হয়তো গাদা গাদা লোক ছিল।

কোথায় গেল বল্ তো তারা? সব্বাই কি আর মরে যায়? কেউ তো থাকবে?

দূর, মরে যাবে কেন? চলে গেছে।

অ্যাঁ! এমন বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে ইচ্ছে হল?

ইচ্ছে কী আর হয়েছে? আমার ছোড়দা বলেছেন, সব টাকাপয়সা ফুরিয়ে ফেলে বাড়ি বিক্কিরী করে দিয়ে চলে গেছে।

উঃ! কী করে খরচ করেছে রে ভাই? কতো কতো টাকা থাকলে, তবে তো এতোবড় বাড়ি বানানো যায়!

শুধু বাড়ি? কতো কতো গাড়িও ছিল। দেখিসনি ওই ওদিকে কী মস্ত আস্তাবল পড়ে আছে!

যেমন দীপু, তেমনি ইন্দু। দু'জনের মধ্যেই অগাধ প্রশ্ন। জীবনে এই প্রথম দীপু ঠিক তার মনের মত একটা বন্ধু পেয়েছে।

মানুষ এতো বোকা হয় কেন রে?

এতো এতো টাকা সব খরচ করে ফেলে, গরীব হয়ে যেতে ভাল লাগে?

সেই তো! অথচ রাজা-টাজারা তো অনেক বিদ্বান বুদ্ধিমান হয় জানি!

ছাই বুদ্ধিমান।

আচ্ছা ইন্দু, তোর কখনো হঠাৎ হঠাৎ চোখ বুজে বসে ভাবতে ইচ্ছে করে না, এই বাড়িতে যারা ছিল, তারা কী রকম ছিল। কী রকম সাজতো-গুজতো, কী করতো?

ওমা! দীপু, তোরও হয় নাকি? আমার তো খুবই হয়! আমি তো চোখ বুজে বুজে ভাবতে চেষ্টাই করি, তারা সব যেন আছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আমিও তা ভাবি রে ইন্দু, কিন্তু ঠিক বুঝতে পারি না তো কী রকম দেখতে ছিল তারা। তাই আন্দাজ করতে পারি না।

অনেক বড় বড় অয়েলপেণ্টিং ছিল ওদের, তাই না রে? উঁচু দেয়ালে

চৌকো চৌকো সব দাগ রয়েছে। কবেকার রং দেওয়া দেওয়াল, আর তো রং হয়নি, দাগগুলো রয়ে গেছে।

ঘরের মধ্যে দেওয়ালে এমন হলদে নীল সবুজ গোলাপী রং করে কেন রে বড়লোকেরা বলতে পারিস? কোনো মানে হয়? এই হে এখন কেলে কেলে মতন হয়ে গেছে, চটা উঠছে, এ ভালো? সাদা কেমন সুন্দর! যেই ময়লা হয়ে গেল, চুনকাম করে ফেলো, ব্যাস! আবার সাদা—ধপধপ!

যা বলেছিস ভাই। সাদা ধবধবে ঘর দেখলে মনটা কেমন আহ্লাদ-আহ্লাদ লাগে, আর এই পুরনো হয়ে যাওয়া রং-করা দেয়ালের দিকে তাকালে মনটা কেমন দুঃখু-দুঃখু হয়ে ওঠে।

ঠিক—ঠিক বলেছিস রে! তোর আর আমার মনটা একরকম। তাই তোতে আমাতে এতো ভাব হয়ে গেল।

এতো যে গল্প সারাক্ষণ, সবই প্রায় এই বাড়িটার ভুত ভবিষ্যৎ বর্তমান নিয়ে। এটাই হচ্ছে ওদের আলোচ্য বিষয়।

কথা অবশ্য এই দুটোর মধ্যেই। ফুলি আগাগোড়াই শ্রোতা। কখনো কখনো শুধু বলে ওঠে, এইবার তোমরা নীচে চল না দীপুদি! আর কতক্ষণ থাকবে? তোমাদের ভয় করে না?

ও বাবা, ভয় আবার করে না! খুবই করে। তবু কে যেন টেনে নিয়ে আসে, চেপে বসিয়ে রাখে। বিয়েবাড়িতে এসে 'রাজবাড়ি'র নেশা ধরে গেছে!

আবার অন্য ভয়ও আছে।

নীচে নামার পর একপালা বকুনি খেতে হয় না?

কোথায় ছিলি এতক্ষণ? আবার সেই তেতলায় গিয়ে উঠেছিলি? কী হল তোদের? ভূতেটুতে পেল নাকি? রোসো ওই তিনতলার সিঁড়ির দরজায় চাবি লাগিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক।

বাবাঃ, ছোট্ট ছোট্ট তিনটে পুঁটকি মেয়ে, সাহসও তো খুব! আমাদেরই তো উঠলে গা ছমছম করে। খবরদার আর যাবি না।

ছোটঠাকুরঝির এই মেয়েটা ঠিক ওর মায়ের মতই। বিদঘুটে হয়েছে। আবার সোনায় সোহাগা জুটেছে ওই মাথাপাগলা ইন্দুটা।

আহা, ও না হয় অকালে মা-মরা! না ভাই না বোন। কিন্তু অন্য দুটো? ওরা অমন ভুতুড়ে মত হয়ে তেড়ে তেড়ে ছাতে ওঠে, তিনতলার খালি ঘরগুলোয় ঘুরে বেড়ায়, জিজ্ঞেস করলে শুধু বলে, এমনি! দেখছিলাম!'

কে বলছিল ছাতে চিলেকোঠায় কবে নাকি কোন একটা বৌ গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিল।

দেখো কাণ্ড! যাই বল বাপু, ছোটঠাকুরঝির কোনো জ্ঞানগম্যি নেই।

এইসব মন্তব্যের ফলশ্রুতি মেয়ে তিনটে মূল রঙ্গমঞ্চে নেমে আসামাত্রই বকুনি খাওয়া! তারা পাগল হয়ে গেছে কিনা অথবা তাদেরকে ভুতে পেয়েছে কিনা জানতে চাওয়া! কবুল করিয়ে নেওয়া, আর যাবে না।

কিন্তু আবার পরদিন দুপুর হলেই নিঃশব্দে চুপি চুপি অন্য সিঁড়িটা দিয়ে

উঠে যাওয়া!

ওই যে গা-ছমছমানি, ওই যে একটা নিষিদ্ধ কাজ করার ভয়-ভয় ভাব, এটার কী কোনো মাদকতা আছে? তাই তিনটে ছোট্ট মেয়ে নেশাগ্রস্ত হয়ে বসে আছে?

আর সেইজন্যেই কি কেউ একটা ভয়াবহ হাতছানি দিয়ে চলেছিল অদৃশ্য কোনোখান থেকে?

অথচ—

অথচ নীচের তলার উদ্দাম কলরোলের আবহাওয়ায় বেশ তো স্বাভাবিকই হয়ে যায় ওরা।

সমবয়সীরা যখন ওদের শুনিয়ে শুনিয়ে বলে, বুড়োদা না, যা খাসা খাসা এক ঝুড়ি ডাঁসা ডাঁসা পেয়ারা এনেছিল, তোরা ছিলিস না, সব উঠে গেল।

রাণুবৌদি না, ওই পেছনের গলির দিকের জানলা থেকে একটা অবাক-জলপানওলা ডেকে তার ঝুলির সব অবাকজলপানের মোড়কগুলো কিনে নিয়েছিল। সারাদুপুর তোফা চলল সবাইয়ের! তোরা যে কোথায় থাকিস?

তখন খুবই রাগ দুঃখু হয় এদের। কেন মরতে যে ওপরে উঠে যায়। তবে মুখে বলে, আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। আমরা তোদের মতন অতো হ্যাংলা নয়। না খেলাম তো না খেলাম।

মণি অবশ্য তখন কাছে এসে চুপি চুপি বলে, আহা! তা বলে সব ফুরিয়ে ফেলা হয়েছে নাকি? আমি এমনি বোকা? তোরটা, ফুলিরটা, ইন্দুরটা আর ছোড়দারটা নিয়ে তুলে রাখিনি বুঝি?

মণিদির ওপর চাপা অভিমানটা মুছে যায়।

আস্তে বলে, আর মার জন্যে?

মা? বাবা! এ বাড়িতে ওই সব ঝাঁক ঝাঁক গিন্নী-গিন্নী মেয়েমানুষদের মধ্যে মাকে একটা অবাকজলপান কি নকলদানা দিতে গেলে সবাই তো হেসে মরেই যাবে। আর মাকেও ঠাট্টা করবে।

ধ্যেৎ বড়রা যেন কী!

তা দাদাই বা কী, বল? একটা দিতে যাই না দাদাকে!

যাঃ ভাগ, বলে ফেলেই দেবে হয়তো।

আসলে কী জানো গো—

ইন্দু বলে ওঠে, ভেতরে ভেতরে ইচ্ছে সকলেরই খুব। ওপরে ভাব দেখাবে যেন কতই বড় হয়েছি। একেই তো ছদ্মবেশী বলে, তাই না রে?

হেসে হেসে মুখ নেড়ে বলে।

ভারী সুন্দর দেখতে ইন্দু।

ওর মা নাকি পরমাসুন্দরী ছিলেন।

ওর বাবাকে নাকি সবাই আবার বিয়ে করতে বলেছিল, তিনি বলেছেন, ইন্দুর মার মত সুন্দর মেয়ে যদি এনে দিতে পারো, তাহলে করতে পারি। তা' তেমন সুন্দর পাওয়াও যায়নি, ওনার আর বিয়ে করাও হয়নি। আসলে আর বিয়ের ইচ্ছেই নেই।

ডালা ভর্তি ভর্তি কিসমিস বাছতে বাছতে এসব আলোচনা চালাচ্ছিলেন দিদি-বৌদিরা। বাছছিলেন যত খাচ্ছিলেনও তত। তা সে সবাই জানে যে, কিসমিস বাছার সময় পুরো ওজনটা ঘরে ওঠে না। না উঠুকগে। তাই তো কেনাও হয় অনেক বাড়তি ওজন চাপিয়ে।

একমুঠো কিসমিস মুখে পুরে কনকদি বললেন, বিয়েটিয়ে আর করবেন না তাই ওই ধনুকভাঙা পণ। জানেন তো দোজবরে বরের ভাগ্যে অমন রূপসীটি জুটবে না! চালাকি আর কি।

সবাই ওঁর কথায় সায় দিয়েছিল।

কিন্তু সবাই কি?

মণি আর দীপু ইন্দুর আড়ালে বলেছিল, এতে চালাকির কী আছে বাবা? তার থেকে বলে দিলেই তো হত—না না, আর বিয়ে করব না। সৎমা এলে ইন্দুর কষ্ট হবে।

আবার হাসে হি-হি করে দীপু।

আমরাও তাহলে কম ছদ্মবেশী নয় বাবা! বড়রা ভাবেন, আমরা যেন ওঁদের কথাটথা কিছু বুঝতেই পারি না। সব পারি। এই তো দেখ না, দিদিমা বড় মাসি মেজ মাসি, আমাদের বাড়িতে বামুনদি রান্না করছেন, বাবা আর দাদা ছোড়দা ওইখান থেকে খেয়ে আপিস ইস্কুল যাচ্ছেন বলে যতটা দুঃখু করছেন, মামীমারা করছেন তা? বরং বলছেন, ছোট ঠাকুরজামাই তো চিরকেলে মানী, উনি আবার রোজ রোজ শ্বশুরবাড়ী আসবেন আপিসের ভাত খেতে? ছেলেদেরও সাকরেদ করেছেন। এতো সবাইয়ের অফিস ইস্কুলের ভাত হচ্ছে আর ওঁদেরই হতো না? তা এটা তো আর দুঃখু নয়, নিন্দে। বুঝি না যেন।

তবে এই ক্ষুদে 'ছদ্মবেশী'দের কথার সবটা সত্যি নয়। ন'মামা বেশ মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন, সরির বাড়িতে উনুন জ্বলছে, হাঁড়ি চাপছে শুনে। তাঁর কল্পনার ছবিতে যে ঢালাও ব্যবস্থা ছিল, এটুকু যেন তাতে একটু কালির পোঁচ। সরি অর্থাৎ সরস্বতী তাঁর নিজের ছোট বোন।

বড় মাসী বললেন, কী করবো বল? অনেক তো বললাম, না শুনলে? এই তো ভোররাত্তিরে দু-দুটো রাক্ষুসে উনুন জেবলে দুটো ঠাকুরে মিলে একপ্রস্থ রান্না তো বেলা নটার মধ্যেই সাঙ্গ করে ফেলছে। যারা যারা এসে জুটেছি, সক্কলেরই সব হচ্ছে। অবিশ্যি যারা বিদেশ থেকে এসেছে, তাদের আর টাইমের ভাত কী? কলকাতার যারা তাদেরই। তাও কম-সে-কম নটার মধ্যে পঁচিশ-তিরিশটা পাত তো পড়ছেই। এর মধ্যে আর ওদের তিনজনের হতো না? কেবলই বলে, না না, সে সুবিধে হবে না। ছেলে দুটোকেও দলে টেনেছে। চিরকেলে একবগ্‌গা তো!

তা সেই চিরকেলে 'একবগ্‌গা' মানুষটিকে দিদিমা তুতিয়ে-পাতিয়ে এইতে রফা করেছেন, ছেলেরা বিকেলে ইস্কুল থেকে সোজা এইখানে চলে আসবে এবং ছেলেদের বাবা সন্ধ্যেবেলা অফিস থেকে। অতঃপর রাত্রের আহার সেরে ছেলেদের নিয়ে বাড়ি ফিরবেন। সকালে বামুনদির হেফাজতে।

মেজ মাসিমার সন্দেহ প্রশ্ন, মাইনে করা লোক, যত্ন করে খাওয়ায় ?

ওরে বাবা ! রাজু তাজুর সমস্বর, যত্নের ঠ্যালায় অস্থির। মা বাড়ি নেই তাই। মার চেয়ে তিনগুণ যত্ন।

তা হ্যাঁরে, একা ঘরে গিন্নীত্ব করছে বামনী, হাতটানফান নেই তো ?

হাতটান মানে ?

দুই ভাই চমকিত।

ও মা ! কী ন্যাকা ছেলেরা গো ! হাতটান মানে জানিস না ? চুরিফুরি করে না তো ?

তাজু আরক্ত, কী বলছো ? ছিঃ ! উনি বামুন না ? বিধবা না ? রোজ গঙ্গাচান করেন না ? ভদ্রলোক না ?

চলে গেল রাগ করে।

জেনে গেল না, তার প্রশ্নে সেখানে হাসির ঢেউ খেলে গেল।

বিয়ের আট দিন আগে থেকেই তো চলছিল যজ্ঞি ! জলখাবার মানেই বাড়িতে ভিয়েন বসানো—পান্তুয়া রসগোল্লা বোঁদে। দুপুরে খাওয়া মানেই গাদা গাদা মাছ তরকারি চাটনী দই আর রাত্রে খাওয়া মানেই লুচি ছোলার ডাল পটল ভাজা কুমড়োর ছক্কা ! এর ওপর এসে পড়ল বিয়ের দিনটি। সে এক কাণ্ড !

বাড়ি ধোঁয়ায় ভরে আছে, উঠোনে ইয়া-ইয়া মাছের মুণ্ডু থেকে রক্তগঙ্গা বইছে, দোতলার একটা ঘরে কাল সারারাত ধরে দশখানা বঁটি নিয়ে কুটনো হয়েছে। এখন আধখানা ঘর জুড়ে মাটিতে ভিজে কাপড় বিছিয়ে পানসাজা হচ্ছে। কোণের বারান্দায় মাটির খুড়ি গেলাস ধোওয়া আর কলাপাতা মোছা হচ্ছে। এবং এই সব কাজে, এই তুচ্ছ তুচ্ছ কাজে ছোট মেয়েগুলোকে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ছেলেরা ?

তারা রাত্রে নুন আর জল পরিবেশন করবে।

গরমের দিনে, চারদিকে এতো কাণ্ড—প্রাণ যেন হাঁপিয়ে উঠছে। ভালর মধ্যে শুধু ভোর থেকে সানাইয়ের সুরটি। যদিও মন-খারাপ মন-খারাপ সুর, তবু ভাল লাগে। এতেই ঠিক বিয়েবাড়ি বলে মনে হয়।

এদের মানে দীপু-মণিদের জ্ঞান হওয়ার পর এভাবে আস্ত একটা বিয়ে দেখা। গোড়া থেকে শেষ। এ হয়নি। পিসিদের মেয়েদের বিয়েতে গেছে বটে, সে তো শুধু ক'ঘণ্টার জন্যে গাড়িতে গিয়ে নেমন্তন্ন খাওয়া।

জেঠামশাইয়ের মেয়ের বিয়ের ? অবশ্য সকাল থেকে গিয়ে থাকা হয়েছে, কিন্তু সে এতো সমারোহের ব্যাপার নয়। ভাল ভাল রান্নাটান্না, কোথা থেকে যেন আনানো দই মিষ্টি সব তোলা থাকলো বরযাত্রীদের জন্যে। বাড়ির লোকরা যেমন-তেমন। পান পর্যন্ত বরযাত্রীর জন্যে মিঠেপান আর বাড়ির জন্যে বাংলা পান।

কিন্তু এখানে ঘটার জ্বালায় ক্রমশই প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছে যেন।

মার তো পাত্তাই নেই। একবার দেখা গেল গায়েহলুদ আর এয়ো কামানোর সময়। আর তার পরে—রাত্তিরে ছাঁদনাতলায় সাত পাক ঘোরানোর সময় কুলো মাথায় নিয়ে। পরনে বেনারসী, হাসিতে ডগমগ, মাকে যেন চেনাই যাচ্ছে না।

কিন্তু একটা বিয়েতে এতো রকম কাণ্ডকারখানা? ওরে বাবা রে! এতো হাজার রকম ব্যাপার লাগে এক-একটা বিয়েতে? সব বিয়েতে?

সেজ মাসি বললেন, লাগে বাবা লাগে। এতো ঘটা না থাক, ল্যাটাটা ঠিকই থাকে। পাকা-দেখা থেকে আইবুড়ো ভাত গায়েহলুদ, জল-সওয়া, দধিমঙ্গল, এয়োকামানো, কলাতলা, কুলো-ডালা, 'ছিরি' গড়া, কড়ি খেলা, বরণ অধিবাস ফুলশয্যে, তত্ত্বতাবাস, বরণ, বর-কনে বিদেয়, অষ্টমঙ্গলা, শেষ অবধি সুবচনী সত্যনারাণ—কোনটা বাদ দেওয়া চলে শুনি? কেন এর আগে কি বিয়ে দেখিসনি তোরা?

দেখেছি তো। তো এতো সব দেখতে পাইনি। কোথায় কী হয় কে জানে?

ও হো, তা বটে!

আবার হাসির ধুম। কেন যে সব বয়েসে, সব মহলে কথায় কথায় এতো হাসির ধুম পড়ে যায় ভগবান জানেন। কর্তাদের হা-হা হাসিতে তো দোতলার ছাদ ফাটে। তাছাড়া যেখানেই জটলা সেখানেই হি-হি খি-খি।

এ কী হাসব বলেই হাসা? না বিয়েরবাড়িতে হাসাটা কর্তব্য ভেবে চেষ্টা করে?

না কি, যেখানেই পরের দারিত্বে খাওয়াদাওয়া চলে আর অনেক দিক থেকে অনেকে একত্র হয় সেখানেই আপনি প্রাণ থেকে হাসির মেজাজ এসে যায়!

তবে ওঁদের হাসির মধ্যে থেকে এই কথাটা আবিষ্কার করা গেল, এতো বড় বাড়ি, এত ঘর বারান্দা সিঁড়ি দালান আর কোথায় মিলেছে? সব কাজটাজ হয় কোথায় কোণের মধ্যে গুঁজে গুঁজে। আর এখানে? এক-একটা কাজের জন্যে এক-একটা ঘর দালান ফাঁকা পাওয়া যাচ্ছে।

এই যে গায়েহলুদে হুড়োহুড়ি করবার জন্যে ওই প্রকাণ্ড দালানটা পাওয়া গিয়েছিল বলেই না তুষুদির বরকে সবাই মিলে মাটিতে ফেলে অমন পুরো হলুদ মাখা করে ছাড়তে পারল? নতুন জামাই, ধুতির ফুল কোঁচাটি হাতে নিয়ে দুলে দুলে বেড়াচ্ছিলেন, মনেও ভাবেননি তাঁর ওপর এভাবে আক্রমণ আসবে।

ধুতিটা খতম?

তাতে কি? জামাই-বরণ বাবদ, বাড়ির সব জামাইদের নামে নামে তো একখানা করে জরিপাড় ধুতি ফুল কোঁচা করে কুঁচিয়ে রাখা হয়েছে। আবার যারা কনের পীঁড়ি ঘোরাবে, তাদের আলাদা আর একখানা করে। পীঁড়ি ঘোরানোর মজুরি। যেমন মেয়েরা ওই সব 'শ্রী গড়া, জল সওয়া, পীঁড়ি আলপনা দেওয়া—যত সব হ্যানো-ত্যানো কাজ করার বদলে একখানা করে লালপাড় শাড়ি পায়। আর বড়রা, যাঁরা এসবের মধ্যে নেই তাঁরা পাবেন নমস্কারী।

শুধু বিধবারাই বিয়েবাড়ির এই সব পাওয়াপায়ির থেকে বাদ। তাঁরা শুধু

ভুতুড়ে খাটুনিগুলো খেটে মরবেন। যেমন বড়মাসি, মেজমাসি, পুঁটুদিদি, ননী-বৌদি। আর মজা এই, অন্য সময় মেয়ে-বৌরা তো বড়দের সামনে কথাটি কয় না, কিন্তু বিয়েবাড়িতে যেন কেয়ারই নেই। হাসি-হুল্লোড়, ঠাট্টা-তামাসা।

'জনতা'র ব্যাপার।

ধরা পড়ার ভয় নেই। কে হেসেছে কে জানে। কে তুষুর বরকে নাস্তানাবুদ করে মুখে চোখে এমন হলুদ মাখিয়ে দিয়েছে যে বেচারার চোখের মধ্যে হলুদ ঢুকে চোখ ফুলে লাল! কে জানে কে!

ওই নিয়ে কর্তাদের মধ্যে খুব চেঁচামেচি চলছে, কিন্তু কাকে যে শাসন করা হবে কে জানে।

এখন তো এঁদের মুখ দেখে মনেও হয় না—কেউ ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানেন।

ফুলি বলল, আহা মণিদি, এদিকে তো বৌমানুষের এতো লজ্জা, ব্যাটাছেলে-দের সঙ্গে কথাও বলেন না, ঘোমটা দ্যান, আর এখন একজন ব্যাটাছেলেকে এতো জ্বালাতন, কাতুকুতু দেওয়া! এর বেলায় লজ্জা করে না?

ইন্দু বলে উঠল, লজ্জা না হাতি! বড়দের ভয়ে ঘোমটা দিয়ে থাকে। সত্যিকার লজ্জাফজ্জা কিছু নেই। বিয়েবাড়িতে এলেই বেশ বোঝা যায়। কাল তো নাড়ুদার বৌ কনকদির বরের মুখের মধ্যে পান গুঁজে দিল। নিজের চক্ষে দেখলাম।

অ্যাঁ! ধ্যাৎ!

দেখলাম, আবার ধ্যাৎ!

দীপু টের পাচ্ছে ও যা ভাবে, সত্যিই তাই। ও তো ভাবে মানুষরা সব বাইরে যেমন ভাব দেখায় ভেতরে তেমন নয়। সব্বাই-ই যেন ছদ্মবেশী! আর সত্যিকার লজ্জাই বা কার আছে? এই যে মেজমাসি কেবল নিজের নাতি-নাতনীদের ডেকে ডেকে লুকিয়ে লুকিয়ে বেশী বেশী খাওয়ান, আর হঠাৎ কেউ দেখে ফেললে উল্টোপাল্টা কথা বলে চাপা দিতে চেষ্টা করেন, এতে লজ্জা আসে না? আর ভাবলে দীপুর নিজেরই লজ্জায় গায়ে কাঁটা দেয়, দীপু সেখান থেকে পালিয়ে আসে, কাউকে বলতে পর্যন্ত পারে না। শুধু গোলোক মেসোমশাইয়ের দিকে আর তাকাতে পারে না। অথচ কিছুতেই কাউকে বলে দিতে পারে না, দোতলার চানের ঘরে যেটাতে শুধু বৌ-মেয়েরা চান করতে হুকুম পেয়েছে, সেই ঘরের পিছন দিকে একটা জানলার ফাটা কাঁচের ওপর চোখ ফেলে দাঁড়িয়ে থাকেন গোলোক মেসো জমাদারের ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে উঠে।

উঃ! ওই জামাকাপড় পরেই উনি সব ছুঁয়ে বেড়ান। কিন্তু বলে দেবে কী করে? বলা যায় নাকি? আর কেউ কি বিশ্বাসই করবে? গোলোক মেসো রোজ সকালে দিদিমার পুজোর ঘরে গিয়ে গীতা না কি যেন পড়েন আর মাছ খান না বলে দিদিমাদের রান্নাঘরে খান। উঃ, ওনার ওপর লোকের কী ভক্তি! আর কী তোয়াজ! কার্পেটের আসনে বসিয়ে সবাই মিলে ঘিরে বসে খাও খাও করে খাওয়ানো, পাখার বাতাস করা। আর মাছ খান না বলে

পাতের পাশে দশ-বারোটা বাটি সাজিয়ে দিয়ে কেবল হা-হুতাশ,—আহা কী দিয়েই বা খাবে ! ··এ'র ব্যাপারে এই বিচ্ছিরি কথা কেউ বিশ্বাস করবে ?

সকালবেলা বরের বাড়ি থেকে অধিবাসের তত্ত্ব এসেছিল। তিনতলার একটা ফাঁকা হলঘরে সেগুলো সাজিয়ে রেখে দরজায় দু'দুটো তালা ঝুলিয়ে রেখে দেওয়া হয়েছে। যে যা দেখবে সার্সি'র কাঁচ দিয়ে দ্যাখো। ঘরে ঢুকে পড়তে পেলে আর রক্ষে আছে ! এমন 'অধিবাস' আর কখনো কোনো মেয়ের শ্বশুর-বাড়ি থেকে এসেছে ?

অতবড় হলটা ঠেসে গেছে বারকোশে আর ডালায়। কত জামাকাপড়, কত থালা থালা মিষ্টি দই ক্ষীর। আরো কত কি কে জানে।

কিন্তু সে-সবের দিকে কে তাকাতে যায় ? বিয়েবাড়ির যত ছোট ছেলেমেয়েরা দেখবার জন্যে মরে যাচ্ছে কনের জন্যে যে খেলনা পুতুলগুলো দিয়েছে ওরা। সেইগুলো দেখবার জন্যে সবাই তিনতলায় উঠে এসে সার্সি'র কাঁচে নাক থেবড়ে থেবড়ে হাঁ করে দেখছে। কী বড় বড় দুটো বরকনে সাজানো পুতুল ! মাটির নয়, ন্যাকড়ার নয়, কাঠের নয়—কী একটা অদ্ভুত জিনিসে তৈরি। ঠিক যেন মানুষের মত। পুতুল বলে মনেই হয় না। তাদের গায়ে সত্যি বেনারসী আর শার্টিনের জামাকাপড়। মাথায় টোপর। কনের গা-ভর্তি গহনা।

কিসের পুতুল রে ওগুলো ?

একটা মেয়ে ফুলিকে নস্যাৎ করে বলে উঠল, এ মা, তাও জানিস না ? ওকে বলে 'গাটাপার্চা'। তোদের নেই ? আমার আছে। খুব ছোট্ট ছোট্ট অবিশ্যি।

আর একজন বলে উঠল, এই, আমার দিদির বিয়েতেও দিয়েছিল তো। এত বড় নয় যদিও। যা-বাবা বলল কাঁচকড়া।

তা নামেতে কী করে।

কাঁচকড়াই হোক, আর গাটাপার্চাই হোক—হৃদয়হরণকারী তো বটে !

কি দুর্লভ সৌন্দর্য ! এমন পুতুল ওরা জম্মেও দেখেনি।

কিন্তু কতটুকুই বা দেখেছে ফুলিরা এর আগে ? ওই যে থালায় সাজানো ইয়া-ইয়া মাছ দুটো ! কেউ বিশ্বাস করবে যে ও দুটো মাটির ! গোকুল পিসি তো হাঁ-হাঁ করে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন এই যাঃ ! দইয়ের হাঁড়িগুলো সব আঁশ হয়ে গেল। দইয়ের হাঁড়ির সঙ্গে মাছ ! এ আবার কী বাবা !

তা ভুল ভেঙে দিল বরের বাড়ির ওই ঝি-টি ও যার হাতেই ছিল মাছ। হলুদে ছাপানো কাপড় পরা ঝি-চাকরের সারি তো থালা আর ডালা হাতে করে সিঁড়ি দিয়ে উঠছে তো উঠছেই। ইন্দু গুনতে চেষ্টা করেছিল—দু'দুবার ফেল।

তো ওই লোকটাই শুনতে পেয়ে বলে উঠল, শোনো কত ! ওনারা কি মেলচ্ছ যে দইয়ের হাঁড়িতে মাচ ঠ্যাকাবে ? ক্যানো কেষ্টনগরের মাটির মাচ দ্যাকো নাই কখনো ?

কিন্তু শুধুই কি মাছ ? ওই ডালাভর্তি ফলগুলো ? কে বলবে ওগুলো সত্যি ফল নয় ? আর শুধুই কি মাটি ? খেলনার রাজ্যে কাঁচ নেই ? পেতল

নেই ? কত ঠাকুর-দেবতার মূর্তি ! কত হাঁড়িকুঁড়ি জাঁতাকুলো। কোনটা ছেড়ে কোনটা দেখবে ?

হঠাৎ হুড়মুড়িয়ে চলে এলেন দুজন গিন্নী—এই তোরা এখানে কিসের গুলতানি করছিস রে ? যা, পালা। মেয়ে-নেমন্তন্নিরা এসে গেল। সব এই তেতলায় বসবে ! ওঘরে ফরসা চাদর শতরঞ্জি বিছানো হয়েছে, দয়া করে কেউ কাদা-কাদা পায়ের ছাপ দিও না।

মেয়ে-নেমন্তন্নিরা এসে গেছে।

এও তো এক রোমাঞ্চ। যাদের জন্যে দুপুর থেকে এই বালখিল্য বাহিনীর সাজগোজ চলেছে। বিয়েবাড়ির জন্যে আলাদা জামা-পোশাক তো তৈরী হয়েছে অনেকেরই।

আবার হুড়মুড়িয়ে নামা।

ওই আসাটাও তো একটা দ্রষ্টব্য !

এক-একখানি ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ি থেকে একে একে বেরিয়ে চলেছে ছোটয়-বড়য় সাতটি আটটি ন'টি। ঘরের গাড়িও আছে কারুর কারুর, তার মধ্যে অত লোক বেরোচ্ছে না। তারা সভ্যভব্যবড়লোক মানী। বাড়ি ঝেঁটিয়ে নেমন্তন্ন আসার লোক নয় তারা। তবে বেশীর ভাগই তো ভাড়াটে গাড়ি। আবার থার্ড ক্লাসই বেশী।

গাদাগাদা গহনায় মোড়া সব মহিলারা। হয়তো একটিমাত্র মাঝারি বয়সের ছেলে, কিম্বা বাড়ির ঝিয়ের সঙ্গে চলে এসেছেন এই সোনার কাঁড়ি সমেত নিজেদেরকে একটি গাড়োয়ানের হাতে সঁপে দিয়ে।

ও'রা নামছেন।

সতুতা হাতবাক্স খুলে ভাড়ার টাকাপয়সা বার করে দিয়ে দিচ্ছেন, সবাই কলকোলাহল করতে করতে ভিতরে ঢুকছেন।

দীপু বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সিঁড়ির পাশে। যেখানে থেকে সবাইকে একবার করে দেখে নেওয়া যাবে।

দেখতে দেখতে হঠাৎ থমকে গেল দীপু আর মণি।

কে এই মেয়েটা রে ? কাদের বাড়ির ?

এত সুন্দর মেয়ে তো একটাও দেখা যায়নি !

সেজেছেও তেমনি। যেন ওরই বিয়ে। ঠিক কনের মত একগাদা গহনা পরা ! জরি-ঝকমকে নীল একটা বেনারসী পরা, ভাবটাও দেখো, যেন মহারাণী !

ফিসফিস কথা, এই দীপু, দেখেছিস ? আইবুড়ো মেয়ের এতো গয়না !

আহা, নিজের নাকি ? দেখছ না সব ঢলঢলে, বড় বড়। মাথার টায়রাটা ঝুলে কপালে আসছে।

অন্যের গয়না পরিয়ে এনেছে, না ? কিন্তু এতো সোন্দর মেয়েকে এতো সাজাবার দরকার কী হল ?

ভগবান জানেন।

ইন্দুকে আমরা এতো সোন্দর বলি, এ বাবা ইন্দুর থেকেও—এই ইন্দু কোথায় গেল রে? এই তো এখানে ছিল।

ওদের সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেছে বোধ হয়।

কই না তো! দেখলাম না তো!

তা'হলে উপে গেছে! হি হি!

ফুল হেসে ওঠে।

ঠিক এই সময় মেজ মাসীর বোন মালতী না কে তাড়াতাড়ি চলে এসে, ওমা তোমরা এসে গেছ? এ কী! মেয়েটার গায়ে এতো গহনা চাপিয়েছ কেন? গরমে যে একেবারে—চলো চলো—বলে ঠিক যেন চিলের মত ছোঁ মেরে নিয়ে যান সোন্দর মেয়েটাকে। পিছু পিছু তার মা-টা সবাই যান।

একটা কথা কানে আসে দীপুর, হ্যাঁ হ্যাঁ, বর এসে পড়ার আগেই সেরে নেওয়া ভাল। পরে হৈ-চৈ পড়ে যাবে।

খুব ব্যস্তভাবে চলে গেলেন।

কী সেরে নেওয়া রে বাবা! খাওয়া নাকি? দূর, তাই আবার হয় নাকি! ডাক পড়লে তবে তো খাওয়া। খাওয়ার ব্যাপার নয়। ওই মালতী না কে, ওঁর মুখে যেন একটা চাপা আহ্লাদ আর ষড়যন্ত্র-ষড়যন্ত্র ভাব।

কেন রে বাবা!

দীপুদের ন'মামার ভাগ্যটা যে খুব খারাপ তাতে আর সন্দেহ কী! নাহলে এমন কাণ্ড ঘটে! কে জানতো অমন একটা সমারোহময় নাট্যদৃশ্যের ওপর যবনিকা পড়ে যাবে।

মানুষটা সারাজীবন দেশঘর আত্মীয়জন সকলের কাছ থেকে বহুদূরে একটা মরুভূমির দেশে পড়ে থেকে রোজগার করে মরেছেন অজস্র, অথচ জীবনে কখনো জীবনের বিকাশ দেখতে পাননি। এমন একটা দেশ নয় যে কেউ ভালবেসে বেড়াতে যাবে। স্বামী-স্ত্রী আর একটামাত্র সন্তান, এই জীবনের পরিধি। তাও ভাল খাবার ভাল পরবার আরাম আয়েস করবার উপায়ও কিছু নেই। কীই বা পাওয়া যায় সে পোড়া দেশে।

সারাজীবন ধরে তাই স্বপ্ন দেখেছেন, জীবনে একবার জীবনটাকে বিকশিত করে লোককে দেখিয়ে দেবেন টাকার সার্থকতা কাকে বলে। কোন্ শৈশবে বাল্যে বড়পিসির বাড়িতে দেখেছেন সমারোহের বিয়ে, সমারোহের দুর্গোৎসব। তার ছোটখাটো ব্যাপারগুলি পর্যন্ত মনে গাঁথা আছে, আর এই বাসনাটি মনের মধ্যে লালন করেছেন,—'খুকুর বিয়েতে ওইরকম করবো আমি!' মেয়ের বিয়ে আর দুর্গোৎসবের ঘটা একত্রে ঘটাবেন।

সারাজীবনের জমিয়ে তোলা সব টাকা হাতে নিয়ে মেয়ের বিয়ে দিতে কলকাতায় এসেছিলেন তিনি, আর মনের মধ্যে তিলে তিলে এঁকে তোলা স্বপ্নের ছবিটিকে রূপও দিয়ে তুলতে পেরেছিলেন, কিন্তু শেষটায় যে নিষ্ঠুর ভাগ্য শেষরক্ষা করতে দেবে না, সে ছবির ওপরে আলকাতরা ঢেলে দেবে, তা কী স্বপ্নেও ভেবেছিলেন? ভাবার বাইরের ব্যাপার তো!

অথচ বলতে গেলে অকারণ। তাঁর সঙ্গে যোগসূত্রহীন একটা দুর্ঘটনার ঘটনা। দুর্ঘটনাটা তো আর দুটো দিন পরে হলেও হতে পারতো। সরস্বতীর বড় ভক্তি ভালবাসায় ন'দাদার এমন হরিষে বিষাদ হতো না। কথাটা বললেন দীপুদের দিদিমা। বললেন, ভগবানের যদি একটা অঘটন ঘটাবার ইচ্ছে ছিলই, ঘটাতেন—দুটো দিন সবুর করতে পারলেন না!

দুটো দিন পরে হলেই বিয়েবাড়িতে এসে জমায়েত হওয়া আত্মীয়জন মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে ফুলশয্যার তত্ত্বটি পাঠানো দেখে (যেটা ভীষণভাবে 'দেখবার মত' ছিল) ওরা কত দিয়েছে অধিবাসের তত্ত্বে, তার যুগ্যি দিতে হবে তো? তাই আগে থেকে গোছানো জিনিসপত্রের ওপর আবার কেনার ফর্দ তৈরি হয়ে গেছে।

সবাই আজ বরকনে বিদায় দেখে এবং আগামী কাল তত্ত্ব দেখে যে যার বাড়ি ফিরতো রাতের খাওয়া-দাওয়া সেরে। এই দু'দিনে বিয়ের রাতের উদ্বৃত্ত মাছ তরকারি দই মিষ্টির সম্ভার খানিকটা কমিয়ে ফেলতে পারতো তারা আর বাকি যে পাহাড় পাহাড় মিষ্টি আর কাঁচা আনাজের বোঝা বাড়তো, তা তাদের সঙ্গে গুছিয়ে-গাছিয়ে গাড়িতে তুলে দেওয়া হতো, তার সঙ্গে মহিলাদের নমস্কারী শাড়ি, ছেলে-পুলেদের জন্যে উপহার দ্রব্য। তাদের চাকর-ঝিদের জন্যে দু-চার জোড়া কোরা কাপড় কেনা ছিল।

সাধ-আহ্লাদের সীমানা কতদূর পর্যন্ত যেতে পারে, সেটাই দেখাতে সাধ ছিল ন'মামার। ন'মামী তেমন কিছু না। তাঁর নীতি হচ্ছে কর্তার ইচ্ছেয় কর্ম। সেই কর্তা কন্যা সম্প্রদান করতে বসেও ভাবছিলেন মেয়ে-নেমন্তন্নীদের গাড়িভাড়াটা ঠিক মত দেওয়া হয়েছে কিনা, তাঁদের প্রত্যেকের সঙ্গে ছাঁদাটা গাড়িতে তুলিয়ে দেওয়া হয়েছে কিনা। আটকে পড়েছেন তো তখন।

অবশ্য বাড়ি-পিছু গুনতি হয়েও ছাঁদা সাজানো হয়েছিল অনেক বেশী। তা হোক, কম না পড়ে। যারা বাড়িতে থাকছে, তারাও না-হয় পেয়ে যাবে এক একটা ছাঁদার সরা। সরায় সরায় চারজোড়া করে মিষ্টি আর চারখানা করে নোনতা। খাস্তা নিমকি, খাস্তা কচুরি আর দু-খিলি করে মিঠেপান পেলে কেন খুশী হবে? যদিও বিয়েবাড়িতে ভিয়েন-বসানো-মিষ্টির হেলাফেলা, কিন্তু সে তো শুধুই রসের ছড়াছড়ি। ছাঁদার মিষ্টি শুকনোসাকনা। খাজা খাস্তাগজা লবঙ্গলতিকা—এই সব ধরনের। মুখ বদলাবে।

তা তবু ভাগ্যিস মেয়ের বিয়েটা হয়ে গিয়েছিল সুশৃঙ্খলেই। বরযাত্রীরা আর কন্যাযাত্রী-নিমন্ত্রিতেরা সবাই বিদায় নিয়েছিল, বরকনে কড়ি খেলাখেলিও করেছে। কিন্তু অতোবড় বাড়িতে আর অতো গোলমালের মধ্যে কোথায় কী ঘটলো তা টের পেতে সময় লেগেছে।

কিন্তু টের পাওয়ার পর?

বিনামেঘে বজ্রাঘাত তুল্যই।

টেরটা পাওয়া গেল কখন, কী সূত্রে?

সেই তো তখন, দীপুরা দেখল মালতী মাসি কেমন চাপা-হাসি মুখে মেখে

ষড়যন্ত্র-ষড়যন্ত্র মুখে বললেন, বর আসার আগেই সেরে নেওয়া ভাল। তারপর ?

তারপর তখুনি তো বর এসেই গেল ইংরিজি বাজনা বাজিয়ে। কে আবার তখন মালতীমাসির মুখের চাপা-হাসির কারণ খুঁজতে যায়! তখন দুদ্দাড়িয়ে নীচে ছোটা—যে যেখানে ছিল।

তারপর ? 'উলুর ডাকে গগন ফাটে, শঙ্খরবে কানে তালা।'

তারপর ? ও বাবা, তারপরই তো আসল মজা। গিন্নী-গিন্নী মহিলারা নিজেদের সোনাদানা আর জরিতে মুড়ে, মাথায় কুলো-ডালা নিয়ে বরকনেকে সাতপাক ঘোরাতে লাগলেন, নাপিতের বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি গালাগালির ছড়ার চিৎকারের মধ্যে শুভদৃষ্টি, কনের মার জামাইয়ের হাতে মাকু ধরিয়ে দিয়ে 'ভ্যা' করতে বলার নির্দেশ, যা নাকি কতশত বছর ধরে চলে আসছে, সেইসব তো ঘটতে লাগল।

দীপু মণি ফুলি তো আঠার মত আটকে থেকেছে সে দৃশ্যের সঙ্গে। তবু তখন বার বার বলেছে, 'ইন্দুটা কোন্ দিকে রে ? ভাল করে দেখতে পাচ্ছে তো ? কখন থেকে যে কোথায় বেড়াচ্ছে আমাদের সঙ্গছাড়া হয়ে।···এই একবার দ্যাখ না ভাই।'

দেখার আর কী আছে ? নেমন্তন্নীদের সঙ্গে বোধ হয় ওর বেশী বন্ধু কাউকে খুঁজে পেয়েছে!

'বেশী বন্ধু' ভাবতেই একটু অভিমান-অভিমান হয়েছিল দীপুর। কিন্তু তারপর যখন বরকনেকে সম্প্রদানের ঘরে নিয়ে গেল, তখন 'ছোটদের পাত হয়েছে' বলে ডাক পড়ল। তখন দীপু সেই বাড়ির ম্যারাপ-বাঁধা বিশাল ছাতটার কুশাসন পাতা লাইনের দিকে এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত তাকিয়ে দেখে বেড়াতে লাগল, কী রকম বন্ধুর সঙ্গে পাশাপাশি খেতে বসেছে ইন্দু! কিন্তু দেখতে তো পাওয়া গেল না।

এদিকে ঘুরে বেড়ানোদের ধমক দেওয়া হচ্ছে বসে পড়বার জন্যে। তবু ঘুরছিল দীপু, কিন্তু যখন তার পায়ের ধাক্কা খেয়ে একটা মাটির গেলাস উল্টে জলে জলময় হয়ে দু'দুখানা পাতা নষ্ট হলো, তখন ভয়ে ভয়ে বসে পড়ল।

মণি বলল, নির্ঘাত ঘুমিয়ে পড়েছে ইন্দুটা।

আহা ছাতে বসে নেমন্তন্ন খাওয়াটা হল না।

এইসব জিনিসপত্র থাকবে ঠিকই কিন্তু পরে আলাদা বসে খাওয়ায় এ মজাটা পাওয়া যাবে ?

আচ্ছা কখন থেকে ইন্দুকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না রে ?

কি জানি! বর আসার সময় থেকে বোধ হয়।

ভাবল, খেয়ে উঠেই বলবে গিয়ে ইন্দুকে। কিন্তু কোথায় গিয়ে ঘুম লাগাচ্ছে—খুঁজে খুঁজে হয়রান! বলল, কাল সকালে দেখাব মজা।

মজা দেখাবার সংকল্পের পরই হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যাওয়ায় বলে ওঠে মণি, এই, আমরা কী বোকা রে। আজ যে ইন্দুর বাবা এসেছেন নেমন্তন্ন খেতে। আর ইন্দুকে কে পাবে ? ঠিক বাবার পায়ে পায়ে ঘুরছে। বাবার

সঙ্গে খাবে বলে বসে আছে। বারো-চোদ্দ দিন বাবাকে ছেড়ে আছে।

এই দ্যাখ্‌না দোতলায় কোন্‌ ঘরে রয়েছেন ইন্দুর বাবা।

এখনো আছেন? তাঁর তো শুনি অনেক কাজ।

এ মা! তা বলে না খেয়েই চলে যাবেন? সবে তো ছোটদের খাওয়া হল।

ভরা পেটে ঘুম-ঘুম-চোখে মুখভর্তি মিঠেপান নিয়ে এঘর ওঘর ঘুরতে লাগল দীপু ইন্দুর সন্ধানে। কারণটা হচ্ছে ইন্দু বাসর জাগবে কি না জানা, বাসরে নাকি গান হবে। এবং গাইবে নাকি স্বয়ং বর। খুব নাকি ভাল গান-গাইয়ে।

বর গান গায় শুনে দিদিমা একটু নাক কুঁচকে ছেলেকে বলেছিলেন, হ্যাঁ রে, বলেছিলি যে খুব ভাল ছেলে? তবে আবার শুনছি কেন গান গায়!

ন'মামা হো হো করে হেসে উঠেছিলেন, গান গায় তো কী? তাতে খারাপ ছেলে হয়ে গেল?

কী জানি বাবা! গানফান আবার কেন? ভাল করে খোঁজ নিয়েছিলি কী রকম সব বন্ধু-বান্ধব জামাইয়ের!

তা কী আর না নিয়েছি মা। গান গায় বলে কী আর টপ্পা গায়? ব্রহ্মসঙ্গীত গায়। মেয়েদের বলবো বরকে ধরে-করে বাসরে গান গাওয়াতে। শুনো।

সেই কথা শোনা আছে।

বার দুই ওপর নীচে করে মণি আর ফুলি বলে উঠল, আর পাচ্ছি না বাবা। ইন্দুর যা ইচ্ছে হবে করবে। এখন তো একটু শুয়ে নিই।

কিন্তু দীপুর 'একবগ্‌গামি'। যা ভেবেছে তা করবেই। মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন—এটাই দীপুর মূলমন্ত্র।

হায়! তা যদি না হতো।

দীপুও যদি হাল ছেড়ে দিতো 'এখন একটু শুয়ে নিই' বলে, তা'হলে কী দীপুকে সারাজীবন একটা প্রশ্নের কাঁটা নিয়ে থাকতে হতো?

দীপু দেখতে পেল যে ঘরে খুকুদির শ্বশুরবাড়ি থেকে আসা সেই তত্ত্বর জিনিসপত্র রাখা রয়েছে, সেই ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে মালতী মাসি ইন্দুর বাবার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে হেসে হেসে বলছেন, 'কনেটি দেখিয়ে দিলাম তো? এখন তোমার মর্জি! তবে বলতে পারবে না ভাই, 'ইন্দুর মার মত সুন্দর নয়'। সত্যি বলব, তার চাইতেও সুন্দরী। তার এতোটা বড় বড় চোখ ছিল না।

ইন্দুর বাবা একটু হেসে বললেন, সেটা অস্বীকার করতে পারছি না।

দীপুর চোখের সামনে থেকে একটা অন্ধকারের পর্দা সরে যায়। দিনের আলোর মত ধরা পড়ে যায় ঘটনাটা। সেই গাদা-গাদা গহনা পরা সোন্দর মেয়েটাকে নিয়ে ইন্দুর বাবাকে 'কনে দেখানো' হয়েছে!

তার মানে ইন্দুর বাবা আবার বিয়ে করবেন। তার ইন্দুর ভাগ্যে সৎমা জুটছেন। নিশ্চয় এই ষড়যন্ত্র জানতে পেরেছে ইন্দু। তাই মনের দুঃখে না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়তে গিয়েছে।

তা সত্যিই তাই গিয়েছিল ইন্দু। তবে শুধু-ঘুমটা বড় বেশী হয়ে গিয়েছিল! ছেলেমানুষ ইন্দু সেই গাঢ় ঘুমের মধ্যে থেকে আর ফিরে আসতে পারল না। চিরকালের মত তলিয়ে গেল।

দীপু যদি মালতী মাসির ওই কথাটা না শুনতো, দীপুও আর সকলের সঙ্গেই ভেবে নিশ্চিত হতো, ইন্দু বোকার মত বাড়ির পিছনদিকের বারান্দায় গিয়ে তার ভাঙা রেলিঙে ঝুঁকে নীচের তলায় বাঠুনঠাকুরদের রান্না দেখছিল। ওই দিকেই তো খানিক দূরে চাতালে চালা বেঁধে রান্না করছে ওরা। ছোটরা এক-একবার করে উঁকিঝুঁকি মেরে দেখে গেছে, 'রাক্ষসের মত উনুন' কাকে বলে। কিন্তু সে তো কোন্ কালে বিকেলে। কখন থেকে তো বসে রান্না করছে এক-কুড়ি লোক মিলে। এখন তো সেসব ফুরোতে বসেছে।

আচ্ছা সন্ধ্যেবেলা যখন বর আসা দেখতে হুড়োহুড়ি, তখন কেন ইন্দু একা ওই ছায়া-ছায়া বারান্দাটায় যেতে যাবে? আর পড়েই যদি যাবে তো রেলিঙের ভাঙা দিকটাতেই তো পড়বে? আস্ত দিকে কেন?

অনেক রাত্রে বামুনঠাকুররা যখন সব কাজ সাঙ্গ করে রাক্ষুসে উনুনগুলোর কাছ থেকে সরে এসে এদিকে কল-চৌবাচ্চার দিকে আসছিল, হঠাৎ চমকে গিয়ে হাউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠেছিল।

আর এমনই সেই ভয়াবহ দৃশ্য যে, ওই এককুড়ি জোয়ান জোয়ান লোক কপালে হাত চাপড়ে চাপড়ে তাদের বালেশ্বর জেলার ভাষায় চিৎকার করে করে আক্ষেপ করেই চলেছিল।

এ কী কাণ্ড!

অত সাজাগোজা গোলাপফুলের মত ওই মেয়েটা এখানে কেন মরে পড়ে থাকতে এল? তবে ওপর থেকে পড়ে গেছে, তাতে তো আর সন্দেহ নেই। মাথা কেটে রক্ত গড়িয়ে ঘাস-পাতায় জমাট হয়ে রয়েছে।

কেউ কেউ শুধু বলল, নিয়তি। কেন মরতে এসেছিল এদিকে।

কিন্তু অনেকেই আবার গলার স্বর নামিয়ে বলাবলি করতে লাগল, সবাই বলেছে 'বাড়ি ভাল নয়'। রাতদিন তো মেয়েগুলোর কেবল গা-ছমছমে তিন-তলাটায় বসে থাকতে যাওয়া।...কী বলব আমাদেরই একেবারে একা গেলে গা-ছমছম করতো।...অপদেবতাদের সুন্দরী মেয়ে দেখলেই লোভ হয়। তাকে দলে টানতে ইচ্ছে করে। কোনো অপদেবতাই যে ইন্দুকে ওখানে টেনে নিয়ে গিয়ে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছে, এমন সন্দেহ অনেকেই চুপিচুপি ব্যক্ত করতে লাগল।

সেই রাত্রে কে যেন ডাক্তারও ডেকে আনলো। কিন্তু ডাক্তার আর কী করবে তখন?

এই ভয়ংকর বীভৎস ঘটনা ঘটল ন'মামার বড় সাধের মেয়ের বিয়ের জমকালো গ্রন্থখানির শেষ অধ্যায়ে।

কিন্তু ইন্দুর বাবা?

তিনি তো তখন চলেই গেছেন। অনেক দূরে বাড়ি যে।

কে এসেছিল তবে ইন্দুর সঙ্গে ? কিম্বা ইন্দু কার সঙ্গে ?

সে তো ইন্দু তার এক পিসির সঙ্গে। যে পিসি নাকি দীপুদের ন'মামীর খুড়িমা।

মা-মরা মেয়ে, পিসির কাছেই থাকে বেশী বেশী।

সেই পিসির পরিত্রাহি চিৎকারে ছুটে এসেছিল বাড়িটার আশপাশের সব লোক। এই উৎসবের মাঝখানে এই। সকলেই হায় হায় করতে লাগল। আর অনেকেই ওই ইসারা দিয়ে গেল—বাড়িটা 'ভাল নয়'। কবে যেন একটা বৌ কোন একটা ঘরে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিল।

কিন্তু দীপুর মনের মধ্যে ওই ভৌতিক-কাহিনী কিছুতেই দাগ কাটতে পারে না। সেই কখন শোনা একটা কথা দীপুর মাথার মধ্যে অনবরত 'ডাঙস' মারতে থাকে। 'বলতে পারবে না, ইন্দুর মার মত সুন্দরী নয়।'

ওইটাই তো শর্ত ছিল ইন্দুর বাবার।

রাতের অন্ধকার কাটতে না কাটতেই বরকনে চলে গেল।

ফুলসাজানো ল্যান্ডোগাড়ি তো বসানোই ছিল কালকের। আর বরের সঙ্গে নাপিত পুরুত নিতবর আর বরের এক মামা ছিলেন। তাঁরাই তাড়া লাগিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। মৃতদেহ বার করার আগেই নিঃশব্দে বার করে নিয়ে যাওয়াই শ্রেয়। বাসিমুখেই বিদায়। না বরণ না কিছু। এখন তো আর শাঁখ বাজানো চলবে না, উলু দেওয়াও না। বরকনে মিষ্টিমুখও করবে না এ বাড়িতে।

সঙ্গে মিষ্টির হাঁড়ি দেওয়ার নিয়ম না ? যার জন্যে বড় বড় চার হাঁড়ি মিষ্টি মজুত করা ছিল টাটকা ভিয়েনের। সে জিনিস কে নেবে ? যে বাড়িতে মড়া পড়ে !

চুপি চুপি বলা হলো, বরকনের সঙ্গে এ বাড়ি থেকে বড় মাসির এক ছেলে যাচ্ছে তো, সে ওদের পাড়ার কোনো ভাল দোকান থেকে টাকা দিয়ে ওদের বাড়িতে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে ফেলবে। এই ভাল যে আসলে মেয়েটা এদের বংশের কেউ নয়। তাহলে তো আবার অশৌচ ফশৌচের ফেরে পড়তে হতো। এ তো শোকের মৃত্যু নয়—বিপদের।

শোক কি আর হচ্ছে না একেবারে ? আহা, অমন ফুলের মত মেয়েটা। এমন বেঘোরে গেল। কিন্তু 'বিপদটা' যেখানে বড় হয়ে ওঠে, শোক কি সেখানে দাঁড়াতে পায় ?

বরকনে নিয়ে চলে যাবার সময় বরের মামা খুব ধিক্কার আর রাগের গলায় বলেছিলেন, আমাদের এই প্রথম কাজ, আর এরকম একটা অশুভ ঘটনা ! আপনার মেয়ে তো দেখছি ঘোরতর অপয়া।

আশ্চর্য, দীপুর ন'মামা একথা বলে উঠতে পারলে না তো, আমারও এই প্রথম কাজ, আর একমাত্র মেয়েরই। তা আপনার ছেলেকেই বা অপয়া বলবো না কেন ?

ও বাবা ! মেয়ের বাবা আবার ন্যায্যকথা বলতে যাবে ? বলতে গেলেই হয়তো

'কনে নিয়ে যাব না' বলে বৌ ফেলে রেখে দিয়ে চলে যাবে।

ওরা চলে যাবার পর একে একে সবাই চলে যেতে থাকে। বাসিমুখেই। কেউ তো আর এখন এ বাড়িতে খাবে না। রইলেন শুধু দীপুদের বড় মাসী আর তাঁর বড় দুই ছেলে, বোধ হয় সাহায্যার্থে। আর রইলেন ন'মামীর সেই খুড়ি, আরও কে কে যেন।

ইন্দুর বাবাকে খবর দিতে গেছে, তিনি আসবেন তবে তো কাজ। পুলিস-টুলিসও নাকি আসতে পারে। কে যেন চুপি চুপি বলছিল।

ঘোড়ারগাড়ি ডাকা হচ্ছে আর এক এক দল চলে যাচ্ছে। দীপুদেরও গাড়ি ডাকা হলো। উঠে এল ওরা।

ওদের ন'মামা ওই বিশাল বাড়িটায় জনাকয়েক লোক পরিবেষ্টিত হয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন ইন্দুর বাবা আসার অপেক্ষায়। একবারই শুধু বলে উঠেছিলেন, আমি কী করে মুখ 'দেখাবো শিশিরবাবুকে।'

সেখানে যজ্ঞিরান্না হয়েছিল, সেখানে তখনো উনুনগুলো জ্বলছে ধিকি ধিকি করে, খুঁচিয়ে আগুন নামিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও। তার আশেপাশে বসানো হয়েছে হাণ্ডা হাণ্ডা পোলাউ, মাছের কালিয়া, চিংড়ির মালাইকারি। বারকোশ ভর্তি ভর্তি ছ্যাঁচড়া কুমড়োর ছোঁকা পটলভাজা আর গামলা গামলা চাটনি। বে-আন্দাজী ব্যবস্থায় অপচয়ের নমুনা। যেটা হতই তখন। অবশ্য এই যে লোক-গুলো গাড়ি ভর্তি করে করে চলে গেল, তারা থাকলে খেতো পরিতোষ করে।...

আর পরদিন যাবার সময় সঙ্গে করে নিয়েও যেত মিষ্টির ঘরে রাখা তত্ত্বয় আসা পাহাড় পাহাড় মিষ্টির ভাগ। হল না। ভিখিরি ডেকে সব বিলিয়ে দেবার মত এনার্জি কার আছে?

অভিশাপাহত লোকের মত পাথর হয়ে বসে রইলেন ন'মামা। অভিশপ্ত ওই সব বস্তুপুঞ্জের মাঝখানে।

দীপু তো এসে পর্যন্তই ভেবে চলেছিল, তুষারদির কাছে গল্প করবার কত কত মালমশলা জমে চলেছে তার। সব বলতে হবে গিয়ে। একদিনে কি আর কুলোবে? এতো ঘটার বর্ণনা, এতো রকম লোকের কাণ্ডকারখানা নিয়ে মজা, হাসি, কারো কারো বেদম খাওয়ার কাহিনী—কিছুই বলা হবে না। এখনকার এই মানসিক অবস্থা নিয়ে কি ঘটাপটার গল্প হয়?

এখন শুধু এই ভয়ংকর ঘটনার কথাটাই—

একমাত্র তুষারদির কাছেই দীপু তার সন্দেহের কথা ব্যক্ত করবে। মা বোন ভাই কারুর সামনেই পারবে না বলতে। শুধু যে লোকে মানবে না বলে তা নয়। কে কোনখানে কার কাছে বলে ফেলে বসবে, আর দীপু হয়ত বকুনি খাবে।

তুষারদির কাছে এ ভয় নেই।

বাড়িতে এসে একটু এদিক-ওদিক তাকিয়ে টুক করে দু-বাড়ির মাঝখানের দরজাটার কাছে এসে খিলটা ঠেলে খুলতেই—কী আশ্চর্য, দরজাটা খুলেই

গেল। ওদিক থেকে খিল বন্ধ নেই।

ওঃ, তার মানে দীপুর সাড়া পেয়েই তুষারদি দরজাটি খুলে রেখেছেন। কিন্তু দীপুরা তো কোনো সাড়াশব্দ করেনি। যদিও এরা হঠাৎ ফিরে আসায় বাবা আর দাদারা আশ্চর্য হয়ে গিয়ে কিছু প্রশ্ন করে উঠেছিলেন, সঙ্গে সঙ্গেই মার 'পরে বলছি' শুনেই চুপ করেই গিয়েছিলেন। তাহলে হয়তো দেখতে পেয়েছিলেন দরজার ফুটো দিয়ে।

আস্তে আস্তে দালান থেকে ঘরের দিকে এগিয়ে যায় দীপু। আর সঙ্গে সঙ্গেই যেন ভুত দেখার মত চোখ বুজে ফেলে ছুটে পালিয়ে আসে।

সমস্ত দরজা জানলা হাঁ হাঁ করে খোলা, ঘরে সংসারে কোনো জিনিসের চিহ্নমাত্র নেই। এখানে-ওখানে হাওয়ায় উড়ে বেড়াচ্ছে ক'টা শালপাতা।

ছুটে চলে আসবার সময় ধাক্কা লাগল দীপুর বামুনদির সঙ্গে। না, বামুনদির দেহটার সঙ্গে নয়, ধাক্কা লাগল তাঁর খ্যানখেনে কণ্ঠস্বরের সঙ্গে। সেই স্বরের ধাক্কাতেই দীপুর সর্বশরীর হিম হয়ে গেল। স্বরের মধ্যস্থিত বাক্যটি এই—

অ আমার কপাল! এসেই ছুটছো ওখেনে! ওরা নেই! আজ তিন-চার দিন হলো চলে গেচে! তো আক্কেলটি দ্যাকো না, চলে গেছে ঘরদোর অলক্ষ্মীর দশা করে। একটু সাফ-সুৎরো করে যাবি তো! রান্নাঘরের উনুনটা ভেঙে দে যাবি তো! তা না ছাইসুদ্দু উনুন রান্নাঘরে জীওনো!

দীপু এইসব কথা থেকে বুঝতে পারে, এই 'চলে যাওয়াটা' মারা যাওয়া নয়। কিন্তু চলেই তো গেছে। তবু তার নিন্দে!

দীপু শুকনো গলায় বলে, কোথায় গেছেন?

যাবে আর কোথায়! নিজেদের ভিটে-বাড়িতেই গেচে। তো বৌটাকে নিন্দে করাও মিথ্যে। যা ঠ্যাঙানি খেয়েছে। অত ঠ্যাঙানি খেলে—

ঠ্যাঙানি খেয়েছে!

দীপুর চোখের সামনেটা শূন্য হয়ে যায়। ঠ্যাঙানো মানে? শূন্যতা থেকে ব্যাকুলতা। ডাকাত পড়েছিল ওঁদের বাড়ি?

ডাকাত আবার পড়তে আসবে কোথা থেকে! ওই সোয়ামীই ডাকাতের মতন উগ্রচণ্ডা হয়ে!

দীপুর ভিতর থেকে একটা কান্না উথলে ওঠে। দীপুর গলার স্বর কিন্তু বাষ্পহীন শুকনো। একটিই শব্দ বার হয়, কেন?

কেন কী করে বলব বাছা। অ্যাতোকালের বাঁজা বৌ, কোথায় ছেলেপুলে হবে শুনে আহ্লাদ করবে তা না, ওনার মাকে কেন পেথমেই বলা হয়নি, এই ছুতো তুলে পিটুনী!

হঠাৎ দীপুর মার গলা শোনা যায়, কার সঙ্গে এতো কথা হচ্ছে বামুনদি?

বামুনদি তাড়াতাড়ি বলেন, এই যে দীপুখুকু এসেই ওবাড়ি ছুটেছিল, তা বলছিলুম ওরা তো নাই।

সরস্বতী বিরক্ত গলায় বললেন, থাক, ছেলেমানুষের সঙ্গে এতো কথায়

দরকার নেই।

তার মানে সরস্বতী এসেই শুনেছেন। কিম্বা আগেই শুনেছেন। তাঁর স্বামীপুত্র তো এখানেই ছিল।

শুনেছেন, অথচ তুষারদির ছেলেমেয়ে হবে শুনে আশ্চর্য্যও হননি, আহ্লাদিতও হননি। আর ওই তুচ্ছ কারণে মারার কথা শুনেও 'আহা আহা' করেননি। দীপুর মনে হলো, সমস্ত পৃথিবীটাই খুব খারাপ! আর অদ্ভুত উল্টোপাল্টাও! ইন্দুর বাবা আবার বিয়ে করবার জন্যে 'সুন্দর মেয়ে' দেখে বেড়ান, তুষারদির বর শুধু শুধু তুষারদিকে ধরে মারেন। মা সেসব কথা শুনেও দুঃখে অস্থির হন না।

কেন এরকম? কেন? কেন? কেন?

দীপুর বড় কষ্ট। দীপুর মধ্যে অবিরত এই 'কেন'র জ্বালা। যা কিছু উল্টোপাল্টা দেখে দীপু, তাতেই ওর মনের মধ্যে এই 'কেন'র ছুঁচ ফুটতে থাকে! এটাই বা কেন?

অথচ দীপু বুঝে ফেলেছে, এই কেন'র উত্তর তাকে কেউ দেবে না—দিতে পারবেই না। তাই দীপু কাউকে জিগ্যেস করতেও যায় না।

দীপু যখন একা থাকে, নিজেনিজেই ওই 'কেন' গুলোর উত্তর খোঁজবার চেষ্টা করে। কিন্তু যা উত্তর পায়, সেও তো তীব্র তীক্ষ্ণ একটা প্রশ্নই! ইন্দুর বারান্দা থেকে পড়ে যাওয়া কি সত্যিই অসাবধানে পড়ে যাওয়া? তুষারদির বরের ওই ডাকাতের মত রাগ, সে কি সত্যিই তুষারদি ওঁর মাকে বলতে যাননি বলে? ওঁর মা তো কাশীতে ছিলেন। সেখানে ছুটবেন নাকি তুষারদি?

চুল বাঁধতে বসে আর্শি'র দিকে তাকিয়ে তুষারাদির সেই যে অদ্ভুত রহস্যময় একটা হাসি দেখে মানে বুঝতে না পেরে হাঁ করে তাকিয়েছিল দীপু, সেই হাসিটার মানের সঙ্গে কি তুষারদির এই লাঞ্ছনার কোনো সম্পর্ক আছে?

এতো ভালবাসার, এতো ভাল লাগার এই বাড়িটা ছেড়ে চলে যেতে হল দীপুদের। উপায় কী? বাড়িওলা যদি বলে, এখন সে নিজের বাড়িতে বাস করতে আসবে, বাড়িটা খালি করে দিয়ে যেতে হবে না?

কিন্তু তুষারদিদের ওইদিকটার সেই খাঁ খাঁ করা দৃশ্যটা, এ বাড়ির আকর্ষণটা যেন কেড়ে নিয়েছে। মণিও বলে, ওদিকটায় তাকালে কীরকম যেন ভয়-ভয় করে রে। একে ইন্দুটার ওই হলো, আবার এখানে এই! কিছু যেন আর ভাল লাগে না।

এটা তো দীপুরও মনের প্রতিধ্বনি!

তবে 'বাড়ি ওঠার' উত্তেজনায় সেই মনমরা ভাবটা আর রইল না।

কতো গোছগাছ, কতো খাটুনি।

শুধু তো বড়দেরই নয়, ছোটদেরও। দীপুর নিজস্ব তেমন কোনো সম্পত্তি নেই, কারণ দীপুর খেলার জগৎটা ছিল যত রাজ্যের আলাত-পালাত জিনিস নিয়ে। দীপুর খেলা প্রধানতঃ 'জিনিস বানানো'। তাই দীপুর খেলার

সরঞ্জাম পেরেক-হাতুরী, কাঠ-টিন, দড়ি-তার।

দীপু সেইসব নিয়ে বাড়ি বানাচ্ছে, নৌকো বানাচ্ছে, দোকানঘর বানাচ্ছে, মণির খেলাঘরের 'গোয়াল'ও বানিয়ে দিচ্ছে। কাজেই দীপুকে নিজের কোনো 'সংসার' উঠিয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছে না। ওসব জিনিস তো বাড়ির জিনিস, চলে যাবে ঠিকই।

তাছাড়া দীপুর প্রধান আকর্ষণ দাদাদের খেলার জগতের দিকে। দীপু ছোড়দার খোসামোদ করে লাট্টু ঘোরায়, ক্যারম খেলে, লুডো খেলে। তা এ সবের সরঞ্জামও তো দীপুর নিয়ে যাবার দায়িত্বে নেই।··আর বইয়ের সাম্রাজ্য? সে তো যার ব্যাপার।

দীপুর তাই বাড়ি ওঠায় তেমন কোনো কাজ নেই। পুতুলের বাক্স একটা আছে বটে, মেয়ে হিসেবে ওটা অবশ্য প্রাপ্যর তালিকায় পড়ে। আত্মীয়স্বজন যখন যেখানে তীর্থটির্থয় যায়, সেখানকার খেলনা পুতুল এনে তিন বোনকেই দেয়। এটা তো একটা সামাজিকতা। কাশীতে গেলে আত্মীয়জনের মেয়েদের জন্যে ছোট্ট ছোট্ট পেতলের হাঁড়কুঁড়ি থালাবাসন, বদ্যিনাথ গেলে লোহার সেট যাঁয় চাকি বেলুন পর্যন্ত, এসব তো আনতেই হবে। দৈবাৎ কেউ দার্জিলিঙে বেড়াতে গেলে লাল নীল সবুজ হলদে পাথরের মালা, কানের দুল, আর বড়দের ফুলঝাড়ু এ তো আনতেই হবে।

এছাড়া ঠাকুমার পাঠিয়ে দেওয়া কালীঘাটের মাটির খেলনা, গিন্নীপুতুল, বেণে-পুতুল, টিনের ছোট্ট ক্যাশবাক্স, চাবির গোছা। সর্বোপরি বাবার সেই প্রিয় বাজার মুর্গিহাটা থেকে এনে দেওয়া বড় মেজ সেজ কাঁচের পুতুল, কচি পুতুল, পুঁতির হালি, এর সমস্ত কিছুরই সমান ভাগ জোটে দীপুর, ওপরওলা আর নীচেওলা দুই বোনের সঙ্গে। সমান করে ভাগ তো পায়।

কিন্তু দীপু কোনোদিন মণির মত বাক্স থেকে পুতুলগুলো বার করে সংসার-লীলার স্বাদ পেতে বসে না। মণির আবার ইচ্ছে সেই স্বাদ গ্রহণেরই ষোল আনা বাসনা।

মণির ওই চারচৌকো কাঠের বাক্সটির মধ্যে বিশাল সংসার। (একাধিক ছেলে-বৌ নাতি-নাতনী, মেয়ে-জামাই, ভাগনে-ভাগনী, জা, দ্যাওর—সে এক এলাহী ব্যাপার। প্রতীক হিসেবে অবশ্য ওই বাক্সের মধ্যেই একটি লালপাড় শাড়ি পরা গিন্নী আছে, তবে জীবন্ত গিন্নী মণিমালাই স্বয়ং। মণি একাই সংসারের প্রত্যেকটি সদস্যের পার্ট প্লে করে চলে।

মণির সেই সংসারে ছেলেমেয়ের অসুখ করে, ডাক্তার আনতে যেতে হয়। বৌ বাপের বাড়ি যায়। কর্তা সংসারে খরচ বেশী হচ্ছে বলে রাগারাগি করে এবং সেই উপলক্ষে কর্তা-গিন্নীতে লাঠালাঠি করে।···মণির ঝি কামাই করে গিন্নীকে নাস্তানাবুদ করে, চাকর চুরি করে পালায়। আবার চাকর খুঁজতে বেরোতে হয়। আরো কত কী! নিরন্তর একটি কর্মপ্রবাহ আর চিন্তাপ্রবাহ চলতে থাকে মণির ওই কাঠের বাক্সটির ডালা খোলার সঙ্গে সঙ্গে। ইস্কুলের বালাই নেই, পড়া-লেখার ঝামেলা নেই, সেই সংসারলীলার ছেদ পড়ে খেতে

বসবার তাড়ায়।

অতএব—

'বাক্সবন্দী সব পুনরায়,
সাঙ্গ হলে খেলার জের।'

তা বাড়ি বদলাবার সময় মণির ওই বৃহৎ পরিবারটিকে অনায়াসেই ঘোড়ার গাড়িতে ওঠার সময় কোলে নিয়ে বসা যাবে। কিন্তু মণির বিশাল 'খেলাঘর' ছাতে ওঠার সিঁড়ির দুটো বড় বড় চাতাল ভরে যে খেলাঘরটি তিলে তিলে তিলোত্তমা হয়ে উঠেছে—সেই রান্নাঘর ভাঁড়ারঘর খাবারঘর পুজোরঘর গোয়ালঘর ইত্যাদিতে সমৃদ্ধি সাজানো খেলাঘরটিকে কী করে নিয়ে যাওয়া যাবে? এই চিন্তায় মণির কদিন ঘুম নেই।

সিঁড়ির রেলিং থেকে ঝোলানো মণির সব 'শিকে'য় ছোট্ট ছোট্ট হাঁড়ির মধ্যে আচার আমসত্ব থেকে কত জিনিস! মহরমের দিন দীপুদের বাড়ির সামনের রোয়াকে এসব খেলনাপাতির বাজার বসে, জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে পয়সা দিলেই মাল এসে যায় ওই জানলাপথেই। তা সব পালপার্বণেই রাস্তার ধারের ওই চওড়া রোয়াক দুটো ব্যাপারীরা কাজে লাগায়। রথে, চড়কে, জন্মাষ্টমীতে।

মণির খেলাঘরের এতো সমৃদ্ধি এই সুযোগেও।

মণি এসব কী ভাবে নিয়ে যাবে? রীতিমত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মণিকে দেখে ছোড়দা একদিন কোন একটা চেনা জুতোর দোকান থেকে গোটা চার পাঁচ নতুন জুতোর বাক্স এনে হাজির করলেন।

নে! নে! তোর সংসারের মালপত্তর গোছা!

কৃতজ্ঞতায় মণির চোখে জল এসে গেল।

ছোড়দা! তুমি কী ভাল!

চার বছরের বড় ছোড়দা বলে উঠলেন, তবে আমার পা পুজো কর্।

তারপর বেদম হাসি।

নতুন বাড়ি অবশ্য বেশীদূর নয়। ঠ্যালাগাড়ি করে মালপত্র পাঠানো হতে থাকলো। দীপুদের মা-বাবার সংসারেও তো এই পাঁচ বছরে তিলে তিলে কম তিলোত্তমা হয়ে ওঠেনি।

পাঁচ বছর বয়সে পরেশনাথ মন্দিরের কাছাকাছি এই সুন্দর বাড়িটায় এসেছিল, দশ বছর বয়েসে তাকে ছেড়ে চলে গেল। কিন্তু বাড়িটা কি খালি রেখে দিয়ে চলে গেল?

দীপুর পোশাকটাকে কি রেখে গেল না সেই বাড়িটার মধ্যে?

হয়তো দীপু, মণি, ফুলি, ছোট্ট ভাইটি, সবাই।

দীপুদের এ বাড়িটার রাস্তার নাম 'মনোমোহন বসু লেন'।

এ বাড়িটাও খুবই সুন্দর। তবে আর এক রকম সুন্দর! দোতলা বাড়ি, একদম নতুন। তখনো মিস্ত্রীর কাজের জের চলছে। রাস্তার ওপর টানা লম্বা বারান্দা। তবে রাস্তাটা তো 'লেন'। এ রাস্তা দিয়ে কি কোনোদিন মহরমের

মিছিল যাবে? ভারী ঘটার বিয়ের বর যাবে? ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হরেক সুরে হরেক স্বরে ফেরিওয়ালা যাবে? পালেপার্বণে বাড়ির সামনের রোয়াকে দোকান বসবে? রোয়াকই তো নেই সামনে।

তবু মনকে মানিয়ে নিতেই হয়।

এ বাড়ির সুবিধে ছাতটা ন্যাড়া নয়, রীতিমত উঁচু পাঁচিলে ঘেরা। কাজেই ছাতে দাদারা ব্যাটবল নিয়ে উঠে পড়তে পারেন। আর মস্ত সুবিধে অনেকগুলো ঘর। ওপর নীচেয় চারটে চারটে আটটা ঘর। এতো ঘর নিয়ে মা কী করবেন? অতএব মণি দোতলায় একখানা আস্ত ঘর পেয়ে গেল খেলাঘর পাতাতে।

কিন্তু আশ্চর্য, সেই মনটাকে আর তেমন করে খুঁজে পেল না মণি! খেলাঘর ভেঙে উঠিয়ে আনার সময় যে বালিকা মণির বুকটা ভেঙে যাচ্ছিল, নতুন খেলাঘর পাতাতে বসে সেই বালিকা মণি যেন কোথায় হারিয়ে হারিয়ে যেতে লাগল।

দীপু কিছু কাঠকুঠো আর হাতুড়ি পেরেক নিয়ে এসে বলল, মণিদি, তোমার গোয়াল বানিয়ে দেব?

মণি উদাসভাবে বলল, থাকগে। গোয়ালে আর দরকার নেই।

কেন মণিদি?

মন লাগছে না। দোতলার ঘরে গোয়াল মানায় না!

তাহলে সিঁড়িতে?

নাঃ। এ বাড়ির সিঁড়ি তো অন্যরকম রে। একতলার দালান থেকে উঠে এসেছে, কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগে, ভয় করে ওখানে সিঁড়িটা তো নিজস্বমত ছিল।

দীপু বুঝল।

এ সিঁড়িতে নিভৃতি নেই।

মন বোধ হয় সকলেরই উদাস-উদাস।

দীপুর বাবার সেই 'বৈঠকখানা' সাজানোর আবেগটাও যেন স্তিমিত হয়ে গেল। সেখানে পরের বাড়িতে ঘরের কড়ি খরচা করে ঘর রং করিয়েছেন, জানলা দরজা রং করিয়েছেন। এ বাড়িতে অবশ্য ওর প্রশ্ন নেই। নতুন বাড়ি।

আসল কথা হয়তো - প্রথম খাঁচা থেকে বেরিয়ে এসে মুক্তজীবনের স্বাদ পাওয়ার যে আবেগ-আনন্দ, সেই মুক্তি থেকে আর একটা জায়গায় নিজেকে উপস্থাপনা করায় তেমন আবেগ-আনন্দের স্বাদ কোথায়?

এ বাড়ির গেরস্থালী পাড়ার রাস্তার ওপারে যে সব বাড়ি, সেগুলোয় দূরের মহিমা বলে কিছু নেই। দীপু তো মনে হয়, বাবার মাছ ধরার ছিপটা বাড়ালে এ বাড়ির বারান্দা থেকে বাড়ির সামনের বারান্দায় ঠেকানো যায়।

হয়তো যায় না, তবু মনে হয়।

আর আগের বাড়িতে? চওড়া রাস্তার ওপারেই তো ছিল সেই অভাবিত ঐশ্বর্য। রেললাইন পাতা, তার উপর দিয়ে রেলগাড়ি যাচ্ছে আসছে দৈনিক দুবার চারবার।

সেই মন-উদাস-করা তীক্ষ্ণ 'কুউউ' ধ্বনি! যেটা হারানোর ক্ষতি কি কম ক্ষতি!

তবু ক্ষতির মধ্যেও একটা লাভের সন্ধান পাওয়া গেল। যেটা দীপুকে কেবলই বারান্দায় টেনে নিয়ে আসে আর 'হাঁ' করিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখে।

বারান্দার মুখোমুখি রাস্তা থেকে একটু ভিতরে ঢোকা সামনে বাগানওলা যে বাড়িটা, সেই বাড়িটাই নাকি স্বয়ং মনোমোহন বসুর ছেলের বাড়ি। যে মনোমোহনের নামে রাস্তা। এটাই তো একটা 'খবর'। আরো খবর-'বোসের সার্কাসে'র প্রিয়নাথ বোসই নাকি সেই পুত্র। যদিও প্রিয়নাথ তখন চন্দ্রবিন্দু হয়ে গেছেন, কিন্তু সেটা বেশীদিন নয়। তাঁর সংসারটা তো সামনেই বিদ্যমান।

অভিভুত হবার কারণ অবশ্য আরো এবং অন্য।

মার কাছে শুনতে পেল এরা, এই সেই মনোমোহন বসু, যাঁর লেখা পদ্য এদের মুখস্থ। যিনি বাড়ির ছেলেদের নাম ঢুকিয়ে দিয়ে দিয়ে পদ্য লিখতেন।

'রাতি পোহাইল উঠ প্রিয়ধন, কাক ডাকিতেছে কর রে শ্রবণ—'

ওই প্রিয়ই এই প্রিয় বোস!

'উঠেছে প্রবোধ, উঠেছে বিপিন, চারু চুনী মতি উঠেছে নবীন।'

এই উঠে-পড়ারা নাকি সত্যি সত্যিই বাড়ির ছেলেরা। কী অদ্ভুত!

ছেলেরা যে তখন আর ছেলে নেই, তা অবশ্য জানা, কিন্তু বাড়িটা তো তাদের। এ যেন একটা আশ্চর্য আবিষ্কার!

মা, আমরা যদি ওই পদ্যগুলো বারান্দায় বসে চেঁচিয়ে বলি, ওই যে মোটকা ছেলেটা আমাদের সামনে দিয়ে ইস্কুল যায়, সে শুনতে পেলে বুঝতে পারবে, তার ঠাকুর্দার লেখা পদ্য বলছি!

মা অবাক হয়ে বলেন, এ আবার কী প্রশ্ন? ওদের সঙ্গে ভাব করলেই তো হয়।

ভাব!

কিন্তু কে ভাব করবে? ওই ছেলেটা দাদাদের থেকে ছোট। মণি-দীপুর মতই হবে। কিন্তু মেয়েরা কি ছেলেদের ডেকে ডেকে ভাব করতে পারে?

হলেই বা দশ-এগারো বছর বয়েস। তবু সেটা কম নাকি? 'মেয়ে' বলে কথা!

দীপুর মধ্যে জন্ম নিচ্ছিল একটা গভীর শূন্যতা, একটা অকারণ বেদনাবোধ। বড় কিছু একটা হারিয়ে ফেললে যেমন সব কিছুর মধ্যেও সর্বদাই একটু মন-কেমনের দুঃখ-দুঃখ ভাব রয়েই যায় তেমনি এক অনাস্বাদিত বিষণ্ণতার স্বাদ দীপুকে কিছু-কিঞ্চিৎ দমিয়ে রাখে! যদিও বহিরঙ্গে যে খুব একটা পরিবর্তন ঘটেছে তা বলা যায় না।

এখনো দীপুর খেলার বস্তুর পরিবর্তন ঘটেনি। সেই হাতুড়ী, কাটারি, পেরেক, তার, উপরন্তু কী ভাবে হাতে এসে যাওয়া একটা ছোট মাপের মরচেপড়া করাত, এগুলো এখনো দীপুর অবসর বিনোদনের উপকরণ, তার সঙ্গে আবার

নতুন সংযোজন তাল তাল মাখা মাটি। তবু হঠাৎ হঠাৎ ছাতের কারখানা থেকে নেমে আসে দীপু, 'দূর ভাল লাগছে না' বলে।

অকারণ ভাল না লাগার রোগটা তো ছিল না দীপুর। কেন যে এমন হয়। দীপু বুঝতে পারে না শৈশবটাকে হারিয়ে ফেলেই দীপুর এই শূন্যতা, এই বিষণ্ণতা, এই হঠাৎ হঠাৎ 'ভাল না লাগা'।

সবাই কি এত তাড়াতাড়ি শৈশবকে হারিয়ে ফেলে? হয়তো ফেলে না। হয়তো দীপুও ফেলতো না, যদি না পরিচিত পরিবেশটাকে ফেলে চলে আসতে হতো! অভ্যস্ত ছন্দের মধ্যে থাকতে থাকতে তো হঠাৎ কোনো অভাব-বোধ দেখা দেয় না, তাই বোধ করি অজানা কোনো অনুভূতিও চট করে জন্ম নেয় না। জায়গা বদল যেন মনকে একটা নাড়া দেয়।

এ বাড়িতে এসে বইয়ের সাপ্লাইতেও তো কিছুকিঞ্চিৎ ঘাটতি ঘটেছে। দীপুদের মার যেসব লাইব্রেরী থেকে বই আসতো, সেসব কিছুটা দূরে পড়ে যাওয়ায় ছেলেমানুষ রামকে পাঠানো চলে না। লাইব্রেরীর মালিকরা যে সকালের দিকে ঝাঁপ খোলেন না। সবই সন্ধ্যেয়। অতএব দাদারা ছাড়া গতি নেই। যদিও তখন স্নেহময় ছোড়দা তাঁর কোন এক বন্ধুর বাড়ি থেকে 'রহস্যলহরী' সিরিজের বই সাপ্লাই দিতে শুরু করেছেন নিয়মিত।

তার মাধ্যমে 'মিস্টার ব্লেকে'র প্রেমে পড়ে যাওয়া হচ্ছে গভীরতর ভাবে। আর স্নেহে কৌতুকে উচ্ছ্বসিত হতে হচ্ছে 'স্মিথে'র বোকামির নমুনা দেখে দেখে। বোকা হলে কী হবে প্রভুভক্তিতে তো আদর্শ। যেই প্রভু 'মিস্টার ব্লেক' তাকে রহস্যের সূত্রটি বুঝিয়ে দিচ্ছেন, সেই তো বুঝে ফেলে সাহায্য করতে লেগে যাচ্ছে।

কিন্তু হায়, মিস্টার ব্লেক-এর নতুন অভিযান তো মাত্র মাসে একটিবার।

মণিও কিছুটা মনমরা।

কারণ ও-পাড়ায় তার কিছু বান্ধবী ছিল, তাদের সঙ্গে আর দেখা হবে কিনা কে জানে। খেলাঘরের সংসারে গিন্নী হয়ে, সারাক্ষণ একা একা সংসারলীলার সর্বভূমিকার যাবতীয় সংলাপ আউড়ে যাওয়ার মধ্যে যেন আর তেমন উৎসাহ নেই মণির।

সবাই যেন কেমন স্তিমিত স্তিমিত হয়ে গেছে।

পাড়া ছেড়ে চলে আসার দরুন আর একটা লোকসান দীপুর, ক্যারম খেলার আসর আর বসে না। দাদারাই চলে যান পুরনো পাড়ায় বন্ধুদের বাড়িতে। সেখানেও দীপুর এক পরম শূন্যতা। দীপুকে তো দাদারা কি দাদার বন্ধুরা ফ্রক পরা একটা মেয়ে বলে খেলার ব্যাপারে হেলাফেলা করতেন না। একটা 'মানুষ' বলেই গণ্য করতেন। এই গণ্য হওয়াটা কী কম সুখ? স্বীকৃতির থেকে মূল্যবান আর কী আছে মানুষের জীবনে?

ক্যারম মণি খেলতে ভালবাসে না, ফুলিও তেমন উৎসাহী নয়।

পাড়া ছেড়ে আসায় আরো লোকসান, 'বামুনদি' আর 'খোকার মা।' তারা তো ভিন পাড়ায় আসতে রাজী হয়নি। এখানে নতুন আর এক বামুনদি, আর

অন্য একজন নতুন বাসন-মাজুনি। ওদের সঙ্গে হৃদয়ের যোগ কোথায় ?

পাঁচ বছর বয়েসে ওদের সঙ্গে যতটা একাত্ম হওয়া গিয়েছিল, দশ বছরে তা হওয়া যায় না। তাদের মনে হতো 'বাড়ির লোক', এদের মনে হচ্ছে কাজের লোক। এদের আচার-আচরণও তেমনি। যার হাতে খাওয়ানোর ভার, খাওয়ার যত্ন করাও যে তার কাজের একটা অঙ্গ, সে জ্ঞান এই নতুন মহিলার নেই।

দীপুর বাবার অবশ্য বাড়িবদলে খুব বেশী লোকসান হলো না। তাঁর তো একটা নিজস্ব জীবন, সেটা তো পুরোমাত্রাই বজায় আছে। অফিস বাজার মাছ ধরা ইত্যাদি। বরং একটি নতুন আকর্ষণীয় বস্তুর সন্ধান পেলেন। একদম পাশের বাড়িতে একটি জমজমাটি পাশার আসর বসতো, দীপুর বাবা সে আসরের সদস্য হয়ে পড়লেন।

দীপুদের দোতলার ঘর থেকে, পাশের বাড়ির সেই একতলা ঘরটা সম্পূর্ণ দেখা যায়। যদিও হ্যারিকেনের আলো, তবু স্পষ্টই দেখতে পাওয়া যায় খেলার গতিপ্রতিটি। দেখা যায় কে কোথায় বসেছে। তখনো তো ওইসব নিতান্ত মধ্যবিত্ত পাড়ায় বিদ্যুতের আলোয় চোখ ঝলসায়নি, তাই দেখার অসুবিধে হতো না।

মণি এই দেখাদেখির মধ্যে নেই। মণি নিজমনে থাকে।

দীপু আর ফুলি জানলার গরাদে নাকমুখ চেপে খেলা দেখে। পাশা খেলা। এই পাশা খেলায় মত্ত হয়েই না রাজা যুধিষ্ঠির সেই সব ভয়ংকর কাণ্ড করে বসেছিলেন ! যার চরম ফল সভার মধ্যে দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা। সেই খেলা খেলবার কী দরকার বাবা এইসব লোকের।

দাবা খেলাটা দেখেছে দীপুরা। যখনই তাদের বাড়িতে বাবার সেই দূর সম্পর্কের কোন ভাগ্নে না কে আসতেন, দীপুদের দাদা হলেও, প্রায় বাবার বয়সী —তখনই দাবার ছক পড়তো। কিন্তু পাশা খেলাটা দেখেনি।

যদিও ছক দেখে মনে হচ্ছে লুডোর মত, নেহাৎ নিরীহ, কিন্তু ওর ভয়ংকর ইতিহাসটি যে ওদের জানা। তাই না এতো ভয়। বাবা যতক্ষণ ওই খেলার বাড়িতে থাকেন, এবং আসর থেকে ক্ষণে-ক্ষণেই 'রণহুংকার' শোনা যায়, ততক্ষণ স্বস্তি নেই দুই বোনের। বিশেষ করে ফুলির।

কী জানি বাবা যদি হঠাৎ কোনোদিন রাজা যুধিষ্ঠিরের মত হেরে হেরে তাদের সব্বাইকে 'পণ' ধরে বসেন ! কিন্তু সাহস করে তো আর বাবাকে এই ভয়ের কথা বলা যায় না। কাউকেই না। নিজেদের মধ্যেই বলাবলি।

সরস্বতী এক-একদিন খুব রেগে রেগে বলেন, আমার মা বলেন, 'তাস দাবা পাশা তিন কর্মনাশা'—তোমার ছোট জামাইটি তিনটিতেই আছেন।

কিন্তু মায়ের এই অভিযোগের সমর্থনে তাঁর ছেলেমেয়েরা নেই। বাবা তো ওই তিনটি, এবং আরো কতো-কতোতেই 'আছেন', তবু বাবার কর্মকাণ্ড তো কম নয়। বাদে বই পড়া। মার তো বাপু ওই তিনের একটাতেও নেশা নেই। অন্য কিছুতেও না। তবু মা তো আর 'কিছু'তেও নেই। নেহাৎ গোটা-আষ্টেক ছেলেমেয়ে সমেত সংসারটা আছে বলেই যতটুকু না করলে নয় ততটুকুই।

তবে অতিথি-অভ্যাগতদের আদরযত্ন আপ্যায়নে খুবই নিষ্ঠাসম্পন্ন। আত্মীয়-জনেরা এ বাড়িতে আসতে ভালবাসে সব্বাই। আর উৎসাহ বলতে, ঘর পরিষ্কার বাড়ি পরিষ্কার বিছানা পরিষ্কার, এইটি। বিছানা বালিশে দুগ্ধশুভ্রতার একটু অভাব ঘটলেই তাঁর মনের শান্তি বিঘ্নিত।

'কর্মনাশা খেলা'র নেশা বোধ করি দীপুদের ঠাকুমার সব ছেলেমেয়ের সকলের মধ্যেই। দীপুর জ্যাঠা-কাকারা তো বটেই, পিসিরাও তাস খেলায় নামে পাগল। তা একটি ঘটনায় তাতে দীপুদের মনের জগতে একটু সুরাহা হলো। ওদের নতুন পিসিমা, যিনি বরাবর বরের বদলীর চাকরির দায়ে বাইরে-বাইরেই থাকেন, তিনি এই সময় কী কারণে যেন শরীর সারাতে দীপুদের বাড়িতে থাকতে এলেন কিছুদিনের জন্যে। তাঁর মার কাছে থাকার অসুবিধে, জায়গার অকুলান। দীপুর ঠাকুমার আবার মেয়ে এলেও এ বাড়িতে থাকার অসুবিধে। আচার-বিচার পুজোপাঠ নিত্য গঙ্গাস্নানের অভ্যাসে বিচ্যুতির ভয়। তাই মাঝে-মাঝেই খাওয়ার পর দুপুরের দিকে পালকী করে চলে আসতেন মেয়ের সান্নিধ্যের আশায়। ফিরে যেতেন বেলা পড়লে সন্ধ্যের মুখে। চারটে বেহারাকে চারটে পয়সা ছুঁড়ে দিয়ে জোর গলায় বলতেন সাবধানে যাবি। ঝাঁকুনি দিবি না।

পিসিমার তাসের নেশা দুর্দান্ত। এখানে তাঁর কোনো কাজ নেই, দুই মেয়েকে ছেড়ে দিয়েছেন দীপু মণি ফুলিদের মহলে, আর শরীর সারতে আসার কারণে এখান-ওখান বেড়াতে যাওয়াও বারণ। তা নইলে অন্য সময় যখনি কল-কাতায় আসেন তিনি ঘোড়ারগাড়ি এবং পালকী উভয় যানেই কলকাতা চষে ফেলেন। ফেলবেন না? এইখানেই তাঁর সমস্ত আপনজনেরা নেই? তাদের সঙ্গে বছরে দু বছরে তো একবার আধবার দেখা।

তাছাড়া থিয়েটার দেখা? সেও তো রীতিমত জরুরী। যে বেচারীকে জীবনভোর যতসব পাণ্ডববর্জিত দেশে কাটাতে হয়, তার তো এটা অবশ্য প্রাপ্য!

যদিও থিয়েটার বলতে তো 'স্টার' আর 'মিনার্ভা'। এই দুটি। তবে শনি-রবির প্রোগ্রামের সঙ্গে সপ্তাহের মাঝখানের বৃহস্পতির প্রোগ্রামে তফাৎ থাকে এই যা। মাসখানেক থাকলে গোটাচারেক অন্তত নতুন নাটক দেখা যায়।

কিন্তু এবারে সে সুখ অনুপস্থিত। ওসব চালালে শরীর সারানোর বিপক্ষে চলে যাবে।

কাজেই নতুন পিসিমা সুযোগ পেলেই তাস খেলার জন্যে সেধে বেড়াচ্ছেন তাঁর দাদাকে-বৌদিকে, ভাইপো-ভাইঝিদের। ভাইপোরা অবশ্য ঘাড় পাতেন না, তবে ভাইঝিরা এই পদমর্যাদা প্রাপ্তিতে বিগলিত। কিন্তু তাদের বিদ্যের দৌড় তো 'পেটাপিটি' 'গোলাম চোর' 'দেখা বিন্তি'। তা তাই সই। নেই মামার থেকে কানা মামা ভাল। পিসিমা তাও খেলেন।

তবে ছোট বোনের আকুলতায় দীপুদের বাবাকে তখনকার মতো পাশার আসর ছাড়তে হলো। হাড়ে বাতাস লাগলো এদের।

বাবা বাড়িতে রয়েছেন, নিজেদের ঘরে বসে খেলছেন—এর থেকে আহ্লাদের

বিষয় আর কী আছে ?

নতুন পিসিমার খেলার একমাত্র নাম 'গ্রাবু'। তা এই গ্রাবু খেলাই তো মেয়েপুরুষ যুবো বুড়ো সকলের প্রধান খেলা। যাকে বলে গেরস্থালী খেলা। তা এতে তো চারজন খেলোয়াড়ের দরকার। পিসিমা বৌদির আর তখন খেলতে না এসে উপায় থাকে না। ননদ বলে কথা। তায় আবার তাঁরই অতিথি। একটু এদিক-ওদিকেই তো অভিমানে খান খান হবেন।

চারজনের দরকার। অথচ দাদা বৌদি এবং তিনি। অতএব আপ্রাণ চেষ্টায় তিনি দুই ভাইঝিকে তালিম দিয়ে দিয়ে খেলতে নিয়ে বসবার যোগ্য করে তুলে ছাড়লেন। মণি দীপু এক 'জন' হয়ে গেল।

ছুটির দিনে অবশ্য এদের আর কেউ পোঁছে না, ও বাড়ি থেকে কেউ না কেউ এসেই যান পিসিমার অনারে। দুজন এসে পড়লে মারও ছুটি। যেটা মার পক্ষে আশীর্বাদ।

'গ্রাবু' খেলা নিয়ে আবেগ উদ্দীপনা! এমন আবেগ উদ্দীপনা। এটা এখন শুনতে হাস্যকর।

এখন হয়তো অনেকে 'গ্রাবু' খেলার নামই শোনেনি। যদিও বা কেউ শুনেই থাকে, পদ্ধতিটা জানে না, অবজ্ঞায় ঠোঁট ওলটায়।

কিন্তু দীপুদের সেই ছেলেবেলায়, উ'চুতলা থেকে নীচুতলা অবধি পরম সমাদরে চালু ছিল এই গ্রাবুখেলা। যার আর এক নাম ছিল 'দুকুড়ি-সাতের খেলা'। ওইটুকু দেখাতে পারলেই কোনোমতে উৎরে যাওয়া আর কি।

এই খেলা বাঙালীর সমাজজীবনে কতটা বিস্তৃত ছিল, তা বোঝা যায় খেলার বিশেষ বিশেষ শব্দগুলি ভাব প্রকাশের মাধ্যম হয়ে ওঠায়। যেগুলি চিরকালের মতো বাঙালীর চালু কথা ভাষায় রয়েই গেছে।

'হাতের পাঁচ' 'ছক্কাপাঞ্জা' 'টেক্কা দিয়ে চলে যাওয়া' 'তুরুপ মেরে জিতে যাওয়া' এ সবই গ্রাবুর অবদান।

জীবনটা যেমন তেমন ভাবে কেটে গেলে এখনো মধ্যবিত্ত মধ্যবয়সী বাঙালী বলে, আর ভাই কোনোমতে 'দুকুড়ি সাতের খেলা' চালিয়ে যাচ্ছি।

কারো সৌভাগ্যের খবর শুনলে বলা হয়, 'ওর তো ভায়া এখন 'গোলাম চোদ্দর হাত চলছে।'

এমন কি অতি উচ্চস্তরের 'ঠাকুরবাড়িতে'ও যে এর প্রবেশ-অধিকার ঘটেছিল তা কবির সেই বঙ্গবীর-এর কাহিনীতেই উল্লেখিত। বীর বঙ্গসন্তান দেশ নিয়ে সমাজ নিয়ে অধম দেশের দুর্দশা নিয়ে লম্ফঝম্পের পর ক্লান্ত গলায় বলে উঠলেন, 'ঝি কোথায় গেল ? নিয়ে আয় সাবু। আরে আরে কে ও ? এসো ননীবাবু, তাস পেড়ে আনো খেলা যাক 'গ্রাবু' কালকের দেব শোধ।'

নতুন পিসিমার দৌলতে যেমন আর একটু মনুষ্যপদবাচ্য হওয়া তেমনি আর একদিকেও এলো উৎসাহের জোয়ার। পিসিমার দুই মেয়ে বিভা আর আভা। যাদের একজন মণির কাছাকাছি বয়সের এবং অপর একজন ফুলির কাছাকাছি।

পরোক্ষে দুজনেই দীপুর কাছাকাছি। তারা আসায় জমজমাটি কারবার।

তিনজনের সঙ্গে জুটল আর দুজন। এ একটা রীতিমত গণশক্তি। মণির ভাঁটা পড়া পুতুলের সংসারে আবার নতুন জোয়ার দেখা দেয়। এ জোয়ারের উৎস মণির মেয়ের সঙ্গে বিভার ছেলের বিয়ে!

হ্যাঁ, সেযুগে 'পুতুলের বিয়ে' বালিকা-জীবনে ছিল একটা রীতিমত রোমাঞ্চকর ব্যাপার। এবং এতে শুধুই যে বালিকাদেরই একমাত্র ভূমিকা ছিল তা নয়, বালকরাও যথেষ্ট অংশগ্রহণকারী ছিল। আর এক্ষেত্রে তো মণি-দীপুর মা সরস্বতী হলেন রীতিমত অংশগ্রহণকারিণী। তাঁর উৎসাহ মণির থেকে কিছু কম নয়। আর মার উৎসাহ পেয়ে মণির বুকে অসীম বল।

কন্যাদায় বলে কথা! বল-শক্তির দরকার নেই?

চলতে থাকে তোড়জোড়।

দু'পক্ষেরই অবশ্য।

তবে গোপনে গোপনে। কেউ যেন আগে থেকে না জানতে পারে ও পক্ষের তত্ত্বতাবাসের বহরটি কেমন হবে। পরস্পরকে তাক লাগিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনায় উত্তেজনা প্রবল।

নতুন পিসিমার সূচিশিল্পে নামডাক আছে। যার যখন মেয়ের বিয়ে হয়, নতুন পিসিমা জামাইয়ের জন্য মখমলের ওপর শল্মাচুমকির কাজ করে জুতো বানিয়ে পাঠান, কার্পেটের আসন বুনে দেন। আবার ছেলের বিয়ের অধিবাসের তত্ত্ব সাজাতে কনের জন্যে মখমলের জ্যাকেট বানিয়ে তাতেও জরির কাজ করে পাঠান। জুতো-জামা মাপে এমন বৃহৎ রাখেন, যাতে কোনমতেই ছোট হওয়ার দোষে বাতিল হয়ে না যায়!

আর কোনো বিয়েতে কলকাতায় থাকলে তো কথাই নেই। তত্ত্ব সাজাবার পুরো দায়িত্ব নতুন পিসিমার। 'শ্রী' গড়া, পিঁড়ি আলপনা সবেতেই ওস্তাদ।

তা পুতুলের বিয়েতে তো সবই লাগবে, শুধু যা মাপে ছোট ছোট। সে রকম পিঁড়ির অভাব হল না, দীপুর কারখানায় নানা মাপের কাঠকাটরার সংগ্রহ।

নতুন পিসিমা যে ইত্যবসরে কখন চুপি চুপি তাঁর নাতির বিয়ের জন্যে তাঁর মেজদার কাছে গহনার অর্ডার দিয়ে রেখেছিলেন কে জানে। দেখা গেল মেজদা তাঁর প্রিয় জায়গা 'মুর্গিহাটা' থেকে নানা বিচিত্র রঙের এবং মাপের পুঁতির হালি এনে দিয়েছেন। তার সঙ্গে সাদা আর সোনালী রাঙতার পাতা অনেকগুলো!

যদিও 'গোপন' ব্যাপার, তবু স্বয়ং বরের মা-ই এসে ফাঁস করে দিল, জানিস, মেজমামা না আমার ছেলের বিয়ের জন্যে না, অ্যাতো আত্যো পুঁতি—তারপর গিয়ে রাংতা জরি কত কী এনে দিয়েছেন।

এরপরও যে মণি তার বাবার কাছে হাপসে পড়বে না, তা তো হয় না।

বাবা, তুমি বিভাদির ছেলের বিয়ের জন্যে অ্যাতো আত্যো পুঁতিটুঁতি কতসব এনে দিয়েছ, আমার মেয়ে বুঝি ফ্যালনা? সে তোমার নাতনী নয়?

বাবা তো হেসেই অস্থির!

ওরে বাবা, এক্ষুনি নাতনীর বিয়ের দায়িত্ব নিতে হবে?

তারপর চুপি চুপি হেসে হেসে বললেন, আছে আছে, তোরও আছে।

অতঃপর? অতঃপর মণি আহ্লাদে দিশেহারা। শুধুই কি নানারঙা পুঁতির হালি? বাজারে সদ্য ওঠা, সমাজজীবনে আনকোরো নাম 'বোম্বাই মুক্তো'—তারই মালা!

আহা সেকালের সেই বর-কনেদের মায়েরা কি স্বপ্নেও ভাবতে পারতো, 'প্ল্যাস্টিক' নামের এক পরম আশ্চর্য বস্তুর আবির্ভাবে 'খেলাঘরে' কী বিপ্লব ঘটাবে! কী ঐশ্বর্যের যোগান দেবে!

মানুষের সংসারে যা কিছু লাগে, সবই বানাতে থাকবে প্ল্যাস্টিক কারখানা! হাঁড়ি কড়া বালতি বাসন, চায়ের সেট থেকে শুরু করে খাট বিছানা আরশি আলমারি কী নয়? যা আছে সংসারে, তা এসে গেছে খেলাঘরে।

কিন্তু আশ্চর্য এই, যখন এতোর আবির্ভাব, তখন মেয়েরা পুতুল খেলা ছেড়ে দিয়েছে। উঠে গেছে 'পুতুলের বিয়ে'র উদ্দীপনা।

'অ্যালুমিনিয়মে'র বস্তুসম্ভারও তখন অনুপস্থিত। ঘরে-সংসারেই এসে ঢোকেনি তো খেলাঘরে ঢুকবে কী করে?

কতোদিন পরে মণিমালা একদিন তার সত্যি মেয়ের ঘরে কাঁচের আলমারিতে সাজিয়ে রাখা নাতনীর খেলনার সম্ভার দেখে হতাশ গলায় বলেছিল, ইস! কী কালেই জন্মেছিলাম রে আমরা!…এখন এতো সব হয়েছে! জগৎ সংসারে হেন জিনিস নেই, যা এই অ্যালুমিনিয়ামের আর প্ল্যাস্টিকে হয়েছে। আর আমি বেচারী বিভাদির 'ছেলের' সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবার সময় পেতলের খেলনাগুলো তেঁতুল মাটি দিয়ে মেজে চকচকে করে মরেছি 'দানের বাসন' সাজাতে।

কিন্তু তখন সেই কন্যাদায়ের কালে কি মণিমালার মনে হয়েছিল, কী অভাগা কালেই জন্মেছি আমরা! মোটেই তা নয়। বরং 'মুর্গীহাটার' অবদানে তাদের খেলাঘরে যে ঐশ্বর্যের যোগান ছিল, তেমন তার আর কোনো সমবয়সিনী সখীদেরই ছিল না বলে গৌরব-বোধই ছিল তার মধ্যে। পরবর্তীকালের অজস্র উপচার উপাদান দেখতে দেখতে প্রতি পদেই মনে হয়েছে কী অভাগা কালেই জন্মেছিলাম আমরা। কী বঞ্চিত ছিলাম আমরা।

মণিমালা দীপমালারাই শুধু নয়, সেই অভাগা কালে অনেক 'মালা'রাই জানতো না তাদের কিছু প্রাপ্য আছে। তাদের কোনো কিছুতে অধিকার আছে।

জানতো না তাই অভাব-বোধ ছিল না, ছিল না সুখের ঘাটতি।

যখন দেখতে পেলো, তাদেরও প্রাপ্য ছিল, অধিকার ছিল, তখনই যন্ত্রণা-বোধের শুরু।

তা যাক ওসব তত্ত্বকথা।

মণিমালাদের কালে তার 'মেয়ে'র বিয়ে হয়েছিল একটি ঐতিহাসিক সমারোহময় বিয়ে।

বরের বাড়ি থেকে যা তত্ত্ব গেল, সে তো নেহাৎ ফ্যালনা নয়। নতুন পিসি তাঁর সর্ব শিল্পশক্তি প্রয়োগ করে ভাবী পুত্রবধূর শাড়িতে (ছেঁড়া কাপড়েরই

অবশ্য) রঙিন ফুল তুলেছেন, ক্ষুদে ক্ষুদে জামা বানিয়েছেন, সানলাইট সাবানকে কেটে ছোট্ট ছোট্ট সাবান বানিয়েছেন, হোমিওপ্যাথি শিশিতে নিজের মাথবার 'কেশরঞ্জন তৈল' দিয়ে ভরাট করে শিশিকে রাঙতা মুড়ে শৌখিন করেছেন, করেছেন এমন অনেক কিছুই। অধিবাসের ডালায় যা সব দিতে-টিতে হয়, ছোট্ট চুপড়িতে তাও দিয়েছেন, অনুষ্ঠানের ত্রুটি নেই। তখন তো আর বৌকে ছাতা জুতো দেওয়া রেওয়াজ ছিল না, কাজেই সেটা বাদ।

এদিকে মণির ঘরের আধখানা ভরে গেছে দানসামগ্রী আর ফুলশয্যার তত্ত্বয়। দীপু তার কারখানা থেকে খালি দেশলাইয়ের খোল, সিগারেটের খালি বাক্স, খালি সাবানের বাক্স, আরশি ভাঙা কাঁচের টুকরো ইত্যাদি দিয়ে মণিমালার বানিয়ে দিয়েছে খাট, আলমারি, আয়না, টেবিল 'দানের' জন্যে জলচৌকি ইত্যাদি। সব কিছুর ওপর রাংতার মোড়ক, কাজেই কী দিয়ে কী বোঝবার উপায় নেই। বরের জন্যে অবশ্যই ছাতা জুতো আবশ্যক, তাও বানানো হয়ে গেছে।

জামাইয়ের ধুতি পাঞ্জাবি উড়ুনি ?

সে ভার মণি-দীপুর মার।

আসলে মণি আর বিভাকে হাতের পুতুল করে ফেলে এই দুটি পাঁচ সাত বছর আগে তিরিশ পার করে ফেলা প্রায় সমবয়সী ননদ-ভাজ উল্লসিত আগ্রহে নিজেরাই পুতুল খেলা খেলছেন।

হয়তো অতৃপ্ত বাসনার প্রকাশ এইভাবেই হয়। সময়ে না ঘটলে অসময়েই হোক।

কোনকালে, নিতান্ত বাল্যে পুতুলের বাক্সটিকে পিতৃগৃহে রেখে দিয়ে চলে যেতে হয়েছে পতিগৃহে। সেখানে গুরুভার কর্তব্যের বোঝা। 'বৌ ছেলেমানুষ' একথা সেকালের অভিধানে ছিল না। বৌয়ের কর্তব্যের ত্রুটি দেখলেই রসাতল তলাতল। হোক না সে বৌ দশ বারো তেরো বছরের।

তারপর তো বছরে বছরে হাতে এসে যাচ্ছে জ্যান্ত পুতুলের সারি !

কিন্তু তাদের নিয়ে কী খেলা যায় ? সে তো সংগ্রাম।

অথচ মনের মধ্যে রয়ে গেছে সেই ফেলে আসা পুতুলের বাক্সটি।

নতুন পিসির তো আবার দশ বছর বয়সেই বিয়ে হয়ে গিয়েছিল।

দু বাড়ির পিঁড়ি আলপনাটি নতুন পিসিমাই দিয়ে দিলেন। কনের কপালে চন্দন পরানোর মত খড়কেকাঠি দিয়ে অত সূক্ষ্ম করে কাঠের গায়ে ফুললতা আর কে আঁকতে পারবে ? টাইট করে ময়দা মেখে তা দিয়ে অত সুন্দর 'ছিরি'ই বা কে করতে পারবে ? কে পারবে তাতে অত রঙের খেলা খেলিয়ে ফুল পাখি 'অস্তি-স্বস্তি' সাজাতে ?

রং ? না, তার জন্যে দোকানে ছোটার দরকার ছিল না। বাড়িতে হলুদ নেই ? সিঁদুর ? আলতা ? রান্নাঘরের দেয়ালে ভুষো ? নীল বড়ি ? শিউলী-পাতার রস ?

মাটির খেলনার সেট থেকে শিলটা নিয়ে কলাতলা বানানো হলো, চারপাশে চারটে কলাপাতার কোণ কেটে পোঁতা হলো, এক কথায় যা কিছু সত্যি বিয়ের

দেখা যায় তার অনুকরণে যথাসাধ্য নিষ্ঠার সাধনা চলতে লাগল।

পাকা দেখা, আইবুড়ো ভাত, গায়েহলুদ, বরানুগমন, শুভদৃষ্টি, বাসর, কড়িখেলা, ফুলশয্যা, বৌভাত—কী নয় ?

ফুলি এ বিয়ের একটি বৃহৎ কাজের ভার নিল, নেমন্তন্ন পত্তর ছাপানো। অর্থাৎ মার লিখে দেওয়া বয়ানে খান দশেক ছোট ছোট কাগজে কপি করল বসে বসে, তার পাশে পাশে ফুললতাও কাটল।

এ চিঠির একখানি ছোড়দা দিয়ে এলেন ঠাকুমার নামে। বরের মা কনের মা দু-ই তাঁর নিকটজন, কাজেই তাঁকে বাদ দেওয়া উচিত নয়,—তাঁকে 'সপরিবারে সবান্ধবে শুভাগমন করিয়া, শুভকার্য সুসম্পন্ন করাইবার' অনুরোধ জানানো হল।

তা খুবই খুশী হলেন তিনি (তাঁর অভিধানে সেটা প্রায় বিরল শব্দ), তবে আসবেন কি, সেদিনই যে তাঁর তারকেশ্বর যাত্রার দিন। রাত্রে পাড়ার কার জন্যে যেন হত্যে দেবেন।

তবে নেমন্তন্ন রক্ষার ব্যবস্থা করে গেলেন।

বিয়ের দিন বিকেলের দিকে গোবিন্দদা একটি ঘোড়ার গাড়িতে চাপিয়ে মণিদের সমবয়সী কটি 'তুতো' ভাইবোনকে নিয়ে এলেন।

বিয়েবাড়িতে তত্ত্বর সন্দেশ মিষ্টির সাইজ পুতুলের সাইজের হলেও, নিমন্ত্রিতদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে প্রমাণ সাইজে ঢালাও কারবারই ছিল।

এইটিই তো সরস্বতীর সর্বাপেক্ষা প্রিয় আহ্লাদের ব্যাপার। লোককে পরিতুষ্ট করে খাওয়ানো।

গোবিন্দ খাবার সময় যথেষ্ট পরিতুষ্ট হতে দ্বিধা করল না, তবে হ্যা-হ্যা করে বলতেও ছাড়ল না, সেই যে বলে না, পয়সা কামড়ালে লোকে বেয়াইয়ের বাপের ছেরাদ্দোয় দানসাগর করে, মেজ মামীর হচ্ছে তাই। মেয়ের পুতুলের বিয়ের এতো ঘটা!

সরস্বতী যদিও এ হেন অমার্জিত কথাবার্তা দু'চক্ষের বিষ দেখেন, তবু ভাগ্নে বলে কথা। বলতে তো পারা যায় না কিছু। তাই হেসেই বলেন, ওটা একটা উপলক্ষ মাত্র। একদিন তোরা সবাই এলি, এই আর কি!

মণি-দীপুর 'তুতো' বোনেরা বিস্ময়ে আনন্দে মোহিত হতবাক। আবার অলক্ষ্যে একটি ঈর্ষার নিঃশ্বাসও কি না ফেলল ?

তোরা কি ভাগ্যিমানী বাবা! তোদের মা বাবা পর্যন্ত খেলার সাহায্য করেন। আর আমাদের ? কেবল সর বাবা। যা বাবা! ঝঞ্ঝাট বাড়াসনে বাবা! একটু কিছু চাইলে একেবারে মার-মার! এই যে কনে সাজিয়েছিস, কোথায় পেতিস শুনি, যদি মেজকা মেজখুড়ি তোদের এতো সাহায্যকারী না হতেন ?

তা কনে সাজিয়েছিল বটে মণি। একেবারে মহারানীর মত! জড়ির পাড় বসানো লাল শাড়ি কায়দা করে পরানো সেই বড়সড় কাঁচের পুতুলটির গলায় সত্যি সোনাকে হার মানানো জেল্লাদার সোনালী ফুঁকো মালার সাতনলী হার, তার ওপর সেই বোম্বাই মুক্তোর সাদা ধবধবে মালা। সরু তারে পুঁতি গেঁথে

গাঁথে তৈরী মুকুট মাথায় !

দেখে আর চোখ ফেরে না ওদের।

ভামি চুপিচুপি বলে, বারানসী শাড়ি মণিদি কোথায় পেল রে দীপু ?

দীপু হেসে ওঠে, বারানসী শাড়ি কী রে ? লাল শালুর ওপর মাথায় দেবার জরির ফিতের পাড় বসিয়ে আর গায়ে তাই কেটে কেটে ফুল করে সেলাই করে তৈরী করে দিয়েছেন মা।

হঠাৎ ভামি কেমন একটা বিদ্রোহের গলায় বলে ওঠে, বেশ করেছেন সেজজেঠি 'ভেন্ন' হয়ে। খুব করেছেন !

ওরা চলে যাবে বলে ফুলশয্যের তত্বটা বিয়ের কিছু পরেই পাঠানো হলো। এ ঘর থেকে ও ঘর তত্ব বাহক-বাহিকারা চললো হাতে এক-একটি রেকাবি নিয়ে।

পয়সায় চারটে রসমুণ্ডি তাই দুআনা, পয়সায় দুটো করে 'কালোজাম' চারআনা, দুপয়সা করে বরফিসন্দেশ আটআনা এনে ছুরি দিয়ে কেটে কেটে গুণতি এবং সাইজে সামঞ্জস্য বিধান। এক পয়সা করে দইয়ের ভাঁড় চারটে এবং তৎসহ একজোড়া মাটির মাছ। এ শিল্পকলা দীপুর। সেই মাটির মাছের কপালেও সিঁদুর উঠল।

শাঁখ হাতে নিয়েছেন নতুন পিসি। বাদ্যির শব্দে পাড়ার মহিলারা সবাই জানলায় বারান্দায়। কী রে বাবা ! নতুন ভাড়াটেদের বাড়িতে কী ঘটছে ? কার্তিক মাসে বিয়ে নাকি ?

সারারাত বাসরের শেষে—

পরদিন বরকনে বিদায়।

যথারীতি কনের মার অশ্রু বিসর্জন।

সেই সঙ্গে দীপুর ভাগ্যে ধিক্কার জুটল, তোরা কী কাঠপ্রাণ রে ? মাসি হোস, মেয়ে বিদেয়ের সময় চোখে একফোঁটা জল নেই ?

দীপু তার উত্তরে বলে উঠল, আর মেয়ে বিদেয় বলছো যে মণিদি ? তাতে কষ্ট হচ্ছে না ?

মণি অবাক হয়ে বলল, ওমা ! আমি কি কথাটা বানিয়েছি নাকি রে ? বিশ্বসুদ্ধ তো সবাই ওই কথাই বলে। কনকাঞ্জলি দিয়ে মেয়ে বাপের সব খাওয়া-পরার খরচ শোধ করে দিয়ে 'বিদেয়' হয়ে যায় না ?

বেশ সহজ ভাবেই 'মেয়ে বিদেয়' সংক্রান্ত তত্বজ্ঞানের কথাটি বলছিল মণি, হঠাৎ কী হল কে জানে ডুকরে কেঁদে উঠল।

দীপু বুঝতে পারল না তারই কোনো অপরাধে এমন হল কিনা। তা বেশীক্ষণ এই সন্দেহ দোলায় দুলতে হল না, মণি কান্না জড়ানো গলায় বলে উঠল, আমাদেরও একদিন নিজেদের বাড়ি থেকে বিদেয় হয়ে যেতে হবে। কে জানে কাদের বাড়িতে গিয়ে—

আবার বাষ্পোচ্ছ্বাস!

দীপুর মধ্যেও একটা আলোড়ন উঠল। সত্যি, কী আশ্চর্য এই নিয়ম। মেয়ে হয়ে জন্মানোর কী কষ্ট! নিজেদের জন্মস্থানের বাড়িতে নিজেদের মা বাপ ভাই বোনেদের সঙ্গে থাকতে পায় না!

অথচ ছেলেরা দিব্যি নিজের বাড়িতে গ্যাঁট হয়ে বসে থেকেই—

দুই বোনে বিষণ্ণ চিত্তে বসে থাকে, আর কোনো কথা নেই মুখে। তবু একথা ভাবেনি বেচারী মণি পুতুলের ক্ষেত্রেও এই অমোঘ আইনটিই বলবৎ হবে। সেই অভাবিত কথাটাই বিভা এসে শুনিয়ে দিল।

বাবার চিঠি এসে গেল রে 'বেয়ান,' আমাদের কলকাতায় থাকার দিন শেষ হয়ে গেল! এই সামনের রবিবারেই চলে যেতে হবে।

ওমা সে কি! তবে যে কথা হচ্ছিল ও মাস অবধি থাকবি তোরা!

কথা তো হচ্ছিল, কিন্তু রইল আর কই? যাক গে যেতেই যখন হবে, তখন তোর মেয়ের ধুলো-পায়ে ঘরবসতটা করিয়ে নে এর মধ্যে। অষ্ট মঙ্গলার সময় তো আর পাওয়া যাচ্ছে না। ওখানে গিয়েও হয়তো একটা বৌভাতের যজ্ঞি করতে হবে। ওখানে অবিশ্যি আমার বেশীর ভাগ বন্ধুই হিন্দুস্থানী তবে বাঙালীও আছে তিন-চারজন। ওভারসিয়ারবাবুর মেয়ে ননী, ডাক্তারবাবুর নাতনী লীলা, দালালবাবুর ভাইঝি কল্যাণী। তা যজ্ঞি একটা না করলে, শুধু বৌ দেখাবো কোন্ মুখে? তো বৌ দেখে একেবারে ট্যারা হয়ে যাবে তারা!

মণি চমকে উঠে বলল, আমার স্বর্ণকেও নিয়ে যাবি না কি?

ওমা! নিয়ে যাব না?

বিভা গালে হাত দেয়, ছেলের বিয়ে দিয়ে বৌকে বাপের বাড়ি ফেলে রেখে যাব?

মণির চোখের সামনে একটা ধূসর শূন্যতা নেমে আসে। কণ্ঠে কান্না চেপে বলে, তা এ তো আর সত্যি নয় বেয়ান।

সত্যি নয় মানে?

মানে এ তো পুতুলের—

স্বর্ণকে ছেড়ে আমি থাকতে পারবো না রে!

বিভা আরও গিন্নীর মত বলে, শোনো কথা। পুতুলের বলে কোন্ নিয়মটা বাদ গেল রে? নে বাবা, মেয়ের বাক্স তোরঙ্গ গুছিয়ে ফেল্। আমারও ছিষ্টি গোছাতে হবে। একটা মুখ-চওড়া কাঁচের শিশি খুঁজে দিতে পারিস? মেজ-মামা বর কনে আশীর্বাদে যে পাঁচ পাঁচটা 'গিনি' দিয়েছে, তার মধ্যে ভরে নেব। লোককে দেখাতে সুবিধে হবে। হাতে হাতে ময়লা হয়ে যাবে না!

'গিনি' মানে হচ্ছে একদম ঝকঝকে নতুন পাই পয়সা।

এসব দীপুদের বাবা অবলীলায় যোগাড় করে ফেলেন। পাল-পার্বণে যে আনি দুয়ানি বিতরিত হয়, সেও তো একেবারে তাদের সূতিকাগার থেকে সদ্য বেরিয়ে আসা।

কিন্তু সেকথা যাক। আসল কথা হচ্ছে, বোঝা যাচ্ছে বিভা তার ছেলের

বিয়ে দিয়ে পাওয়া সমস্ত ঐশ্বর্যসম্ভার সহ ছেলে বৌ নিয়ে ঘরে ফিরবার তোড়-জোড় করছে।

বোকা মণি একথা তো ভাবেনি! সে যে তত্ত্ব সাজাবার জন্যে তার পুতুলের সংসারের সর্বস্ব উজাড় করে দিয়েছিল।

মার কাছে গিয়ে কেঁদে পড়ল, মা বিভাটা বলছে সব জিনিসপত্তরসুদ্ধ স্বর্ণকেও নিয়ে চলে যাবে! ও মাঁ-আঁ—

সরস্বতী আস্তে বললেন, তা তুই-ই তো বলেছিলি তোর মেয়ে ওর ছেলেতে বিয়ে হোক।

মণি কেঁদে ফেলে বলে, সে তো আমি মেয়েকে রাণীর মতন করে সাজাতে পাবো বলে। আমি কি জানতাম যে—

সরস্বতী একটু নিঃশ্বাস ফেলে বলেন, মানুষও তাই ভাবে রে! মেয়েকে রাণীর মত সাজিয়ে খুব ঘটাপটা করে একটা বিয়ে দিতে পারলেই মহা আহ্লাদ! তারপর যে কী হয়! নদার মেয়েটা—

মণি ও কথায় কান দেয় না। অবুঝ গলায় বলে, তুমি নতুন পিসিকে বল, এ তো খেলার বিয়ে। এরপর যার মেয়ে যার ছেলে নিজের নিজের মার কাছে থাকবে।

সরস্বতী বলেন, আমি বলতে পারবো না বাবা। তোর ইচ্ছে হয় বলগে যা।

কিন্তু বলতে যেতে আর হল না। নতুন পিসি নিজেই এসে খরখরিয়ে উঠলেন, হ্যাঁরে মণি, তুই নাকি বিভাকে বলেছিস, মেয়ে ছেড়ে থাকতে পারবি না! মেয়েকে পাঠাবি না! এ আবার কী আহ্লাদে কথা! মেয়ের বিয়ে দিয়ে ছেড়ে থাকতে পারবো না বললেই হল? মেয়ে আর তোর নিজস্ব বলে রইল নাকি? এখন তার শাশুড়ী তাকে মারুক, কাটুক, খাটাক, যন্ত্রনা দিক তোর কিচ্ছুটি বলার এক্তিয়ার রইল না। তা বিভা তেমন বৌকাঁটকী শাউড়ী হবে না। তবে তোমার মেয়েটিকেও গুণ দেখাতে হবে।

বলে চলে যেতে যেতে বলেন, দেখলে তো মেজবৌ, তোমার ননদাইয়ের কাণ্ড! আর তর সইল না। তলব এসে গেল। বলতে পারা যাবে না আর দুদিন থাকি। মেয়েমানুষের জীবনই এই বুঝলি রে মণি! 'অযোধ্যার বেগম'টা আর দেখা হল না।

মেজদা বলেছেন, শনিবারের জন্যে 'জনা'র পাস পাওয়া যাবে। সেইটুকুই যা ভাগ্যি।…তা কালই তাহলে একবার ওবাড়ি চলে যাই মেজবৌ? কী বল? মার কাছে একটা দিনও থাকা হবে। মা বলে রেখেছেন যাবার আগে দু-চারদিন ওখানে থাকতে।

সরস্বতি আস্তে বলেন, ঠাকুরজামাই এক্ষুণি তলব করলেন? তোমার তো এখনো তেমন ভাল করে শরীর সারেনি।

আর 'তেমন করে'! যা হয়েছে তাই যথেষ্ট! ওখানে না কি পাঁড়ের বাপ মরে গেছে, ছাই সে তার ছাপড়া জিলায় চলে গেছে। যত সব বানানো কথা। বাপ মরেছে না কচু! এখন চাষ বাসের সময় পড়েছে—যত সব বানানো কথা।

দীপু এতক্ষণ মলিন মুখে চুপচাপ বসে ছিল, পিসির কথাটায় যেন তার ঝিমোনোর স্নায়ুর ওপর একটা পাথরের চাই এসে ধাক্কা মারলো।

বানানো কথা! নতুন পিসি! ও বানিয়ে বানিয়ে বলেছে ওর বাবা মারা গেছে?

নতুন পিসি হি হি করে হেসে বলে ওঠেন, ওরা অমন বলে।

বানিয়ে বানিয়ে বাবা মারা যাওয়ার কথা বলে? ওরা গরীব বলে মানুষ নয়? তাই ওদের এইভাবে বলছ?

নতুন পিসি অবাক হয়ে বলে ওঠেন, ওমা! এতে আবার গরীব বড়লোক কী? ও মেজবৌ, তোমার এই মেয়ে হঠাৎ এমন সিংহবাহিনী হয়ে উঠল কেন গো? বোঝাও না বাবা মেয়েকে ওরা এ রকম বলে। মা-বাপ মরাটা হচ্ছে ওদের তুরুপের তাস! হাতে রেখে দেয়, দরকার মতন বসিয়ে দিয়ে পিট তুলে নেয়।

দীপু মার দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে, মা! একথা সত্যি?

পিসির কথায় অবিশ্বাস! মাকে সালিশ মানা! নতুন পিসির মুখ লাল হয়ে ওঠে। সরস্বতী না তাকালেও সেটা অনুধাবন করতে পারেন। সাবধানে বলেন, সত্যি মিথ্যে জানি না বাবা, তবে সবাই তো বলে তাই! আসলে হয়তো বাবা অনেকদিন আগেই মারা গেছে! তাই দোষ ভাবে না। সহজে তো ছুটি পায় না, তাই ওই কথা বলে।

নতুন পিসি ব্যঙ্গের গলায় বলেন, তোদের পাদ্রী সাহেব মা তো কারুর নিন্দে করতে জানে না, তাই দোষ ঢাকছে। আমি ওদের হাড়হদ্দ জানি বাবা। 'বাবা' মারা যায় ওদের অবশ্য একবারই। তবে তারপর থেকে 'বাপ' মরে যখন-তখন! ছুটির দরকার হলেই—

সরস্বতী বলেন, যাক, জ্ঞানবৃক্ষের ফলটা আর বেশী খেয়ে কাজ নেই।

নতুন পিসি অবশ্যই ছেড়ে কথা কইবার মেয়ে নয়। বেশ কড়া গলাতেই বলেন, তা তোমার মেয়েদের সে ফল খেতে কিছু বাকি আছে না কি মেজবৌ? রাতদিন তো নাটক নভেল পড়ছে। 'বিষবৃক্ষ' পর্যন্ত তো গুলে খেয়ে রেখেছে।

পরদিন নতুন পিসি পালকি চেপে তাঁর মার বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। অভিভাবক রাম। পালকি ডেকে আনা এবং নিয়ে যাওয়া সব ভার তার ওপর। তা সেও তো ক্রমে বড় হচ্ছে।

'জনা'টা দেখতেই আবার শনিবারদিনকে ফিরে আসতে হবে, বললেন নতুন পিসি, তা নইলে ওখান থেকেই চলে গেলে হতো। নিয়ে তো যাবে গোবিন্দ। তোমার ননদাই তো বলে দিয়েছে গোবিন্দকে বলো পৌঁছে দিয়ে যেত। ইচ্ছে করলে গোবিন্দ দু-দশদিন থাকতেও পারে ওখানে।

কথার মাঝখানে দীপুর বাবা এলেন। বললেন, ওরে রঙের টেক্কা, তোর অযোধ্যার বেগমের ব্যবস্থা হয়ে গেল। একটা পুরো 'বক্স'-এর 'পাস' সেধে গছিয়ে দিল স্টারের অনঙ্গ।

তাসখেলা-পাগল এই বোনকে দীপুর বাবা মাঝে মাঝে আদর করে বলেন

'রঙের টেক্কা'।

তা রঙের টেক্কা মুখটা বেরঙা করে বলে ওঠেন, আমার তো রবিবারেই যাবার কথা।

জানি জানি। রবিবারে না গিয়ে না হয় সোমবারেই যাবি। তাতে আর মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না।

যদি রেগে যায় তোমাদের ভগ্নিপতি!

রঙের টেক্কার মুখ এখনও বেরঙা।

কিন্তু তাঁর মেজদার মুখ নির্ভীক। বলেন, রেগে গেলে চারটি বেশী করে ভাত খাবে। ও নিয়ে ভাবিস নে। আমি গোবিন্দকে বলে দেব, আমার কথা বলতে। আমি যেতে দিইনি বললে বোনাই কিছু বলতে পারবে না। তুই নির্ভয়ে থাক!

রঙের টেক্কার মুখ আবার রঙিন হয়ে যায়।

তাহলে অযোধ্যার বেগমটাও হচ্ছে!

বলে আহ্লাদে ভাসতে ভাসতে পালকিতে গিয়ে ওঠেন নতুন পিসি।

সরস্বতী তার সঙ্গে মিষ্টি দেন এক চ্যাঙারি। এটাই তাঁর নিয়ম। ভালবেসেই দেন। তবু এও কি জানেন না, ও বাড়িতে গিয়ে যে দুদিন থাকবে তাঁর ননদিনী, অনর্গল সরস্বতীর সমালোচনা করবে। আর সবাই মিলে হাসাহাসি করবে। সরস্বতীর 'দরাজ হাত,' 'এলাহি মেজাজ', 'আরাম আয়েস-প্রিয়তা' আর অজ্ঞান হয়ে বই পড়া নিয়ে হাসাহাসি তো সকলেরই একটি উপভোগ্য প্রসঙ্গ।

একটা সংসার দেখে গিয়ে অন্য সংসারের লোকেদের কাছে নিন্দেমন্দ করা মেয়েদের একটি প্রধান গুণ। এটা সরস্বতীর অজানা নয়। তবু তিনি তাঁর কর্তব্য করে যান। ভালই জানেন, এতে সবাই তাঁকে বোকা ভাবে, অবোধ ভাবে, আবার কেউ কেউ হয়তো বা অহংকারীও ভাবে। কী আর করা যাবে—সংসার তো এই রকমই। জানেন, মানুষ যেখানে অনেক পায়, অথচ তার উপযুক্ত শোধ দিতে পারে না (অভাবে না হোক স্বভাবে), সেখানেই হীনমন্যতাবোধে ভোগে, আর সেই রোগের দাওয়াই খোঁজে সেই পাওয়ার জায়গাটাতেই ছোবল হেনে।

স্বর্ণকে নিয়ে চলে গেল তার শাশুড়ী। হাসতে হাসতে আহ্লাদে ভাসতে ভাসতে, বাক্স বোঝাই বস্ত্র অলংকার নিয়ে। নতুন পিসিও নতুন শাড়ি পরে পায়ে আলতা ছুঁইয়ে পান্তুয়ার হাঁড়ি সঙ্গে নিয়ে গাড়িতে উঠলেন। 'যদিও তোমার কাছে এই ক'দিন কী সুখেই কাটিয়ে গেলাম মেজবৌ', বলে একটু কাঁদলেনও।

হয়তো এটাও মিথ্যে নয়।

সুখের অনুভূতিটিও আছে। আবার মেজবৌয়ের অবাধ স্বাধীনতা, অপ্রতিহত প্রতাপ, ভবিষ্যৎ চিন্তাহীন সচ্ছলতার সংসারের সর্বময়ী কর্তৃত্ব, এও যে পরম ঈর্ষাদায়ক। ওর হাত থেকে অব্যাহতি পেতে খুব কষে নিন্দে করা ছাড়া আর কী উপায়?

কন্যাবিরহে কাতর মণিকে দেখেই বুঝি সরস্বতীর নিজের মধ্যেও হঠাৎ সেই বিরহের অনুভূতি জেগে উঠল।

বড় মেয়েটা কত—কতকাল একনাগাড়ে শ্বশুরবাড়ি পড়ে আছে। সেই বরফ-পড়া দেশে শ্বশুরবাড়ি পড়ে থাকা কী কষ্ট! বৌ তো আর বাড়ির মেয়েদের মত জুতো মোজা পরে বসে থাকবে না? রুগ্ন শাশুড়ীর মতও না। সেই মহিলার কী অসুখ তা জানা নেই সরস্বতীর, তবে বারো মাসই শুনতে পাওয়া যায় শাশুড়ীর শরীর খারাপ তাই বৌয়ের বাপের বাড়ি আসা চলে না। আর স্বামীর সঙ্গে স্বামীর কর্মক্ষেত্রে এসে 'বাসা' করে থাকার প্রশ্নও ওঠে না।

বৌকে পারিবারিক প্রয়োজনে শ্বশুরবাড়িতেই থাকতে হয়। তাকে তো আর শীত বলে বসে থাকলে চলে না, রান্নাবান্না সবই করতে হয়। পাহাড়ী ভৃত্যের হাতে তো আর খাবেন না ও'রা? মেয়ের শাশুড়ীর আবার ওই দেশে বরাবর থেকেও বিচার-আচারের বাতিক।

মেয়ের বিয়ের সময় সম্বন্ধ করতে কেউ একবার সরস্বতীর মতামতের প্রশ্নও তোলে নি। সম্বন্ধ দিয়েছিলেন বড় ননদের সিমলাবাসিনী এক ভাসুরঝি। সরস্বতী যখন 'অতদূরে'? বলে কাতর প্রশ্ন করেছিল, তখন তাঁর দ্যাওর ভাসুর ননদ ননদাই এবং সর্বোপরি শাশুড়ীই বলেছিলেন, তা সিমলেয় মানুষ থাকে না? পটাইয়ের ভাসুরঝি থাকছে না। অমন পয়সাওলা শ্বশুর, অমন ঘর বর! তাছাড়া জামাই তো আর চিরকাল পড়ুয়া থাকবে না? বি এ পাস করে বেরোলেই চাকরি-বাকরি পাবে অন্য কোথাও।

তা বেচারী সরস্বতীর ভাগ্যে যদি জামাই চাকরি-বাকরি পেয়েও কলকাতায় মেসে পড়ে থাকে, আর মেয়ে পাহাড়চুড়োয় 'শ্বশুরঘর' করতে করতেই ক্ষইতে থাকে, সেটা সরস্বতীরই ভাগ্যদোষ। লোকে কী করবে?

সরস্বতী হিসেব করলেন সেই সেবার সাত বছর আগে প্রথম সন্তান হতে তাঁর কাছে এসেছিল শান্ত। মাঝখানে একবার ওদেরই কোন নিকট আত্মীয়ের বিয়েতে কলকাতায় এসেছিল, মা বাপের সঙ্গে একটা দিনের জন্যে দেখা করে গিয়েছিল।

ভাবতে ভাবতে মনটা বড্ড হু-হু করে উঠল সরস্বতীর। অনেক কাকুতি-মিনতি করে মেয়ের শাশুড়ীকে একখানি চিঠি লিখলেন, একবার যদি মাস দুইয়ের জন্যে তাকে পাঠান। অনুমতি পেলে কেউ গিয়ে নিয়ে আসবে।

যদিও চিঠি বেয়ানকেই দেন, কিন্তু উত্তর আসে বেয়াই মারফত কর্তার কাছে, কারণ বেয়ান লিখনপঠনক্ষম নয়। তা যাক, এতো মিনতির ফল কি আর ফলবে না?

কিন্তু ফললো কী?

প্রত্যাশিত সময়ের আগেই চিঠি এসে গেল কয়েক ছত্রে। পোস্টকার্ডে—

'মাননীয় বেহাই মহাশয়, বিশেষ দুঃখের সহিত জানাইতেছি গতকাল রাত্রে আমাদের ঘরের লক্ষ্মী বৌমা মাত্র একদিনের জ্বরে আমাদের শোকসাগরে ভাসাইয়া দিয়া অমরধামে যাত্রা করিয়াছেন। আপনাদের আর কী সান্ত্বনা দিব

আমার সংসার অচল হইয়া গেল। ইতি—'

চিঠিটা এল দুপুরে।

সরস্বতী কি এ চিঠি পেয়ে আকাশ ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন? সরস্বতী কি পাড়া তোলপাড় করে আছড়াআছড়ি করতে লাগলেন? না কি এই আকস্মিক দুঃসংবাদে সরস্বতী সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললেন?

নাঃ, এ সবের কিছুই হল না।

দীপুরা শুধু দেখল, বড়দির শ্বশুরবাড়ি থেকে আসা চিঠিটা পড়েই, মা চিঠিটা মুঠোয় চেপে ধরে, কাঠের পুতুলের মত হয়ে গেলেন। নড়াচড়া নেই, সাধারণ নিয়মে চিঠিটা আর একবার পড়লেনও না—যেটা ওরা দেখতে পায়। বড়দির চিঠিই আসুক আর মামাদের কারো কাছ থেকেই আসুক, চিঠিটা মা একবার তাড়াতাড়ি পড়ে নিয়ে, আবার একবার ধীরেসুস্থে পড়েন। এটা তো মা'র হাতের মুঠোর মধ্যেই রয়ে গেল। এক পয়সা দামের ছোট মাপের সেই পোস্টকার্ড মুঠোয় চেপে রাখা কিছুই নয়।

তবে চেপে রাখার অসুবিধে এই, দীপুরা তো দেখতে পাচ্ছে না, কী লেখা আছে চিঠিতে। নির্ঘাৎই বড়দির সেই নিষ্ঠুর শ্বশুর-বুড়ো বড়দিকে পাঠাতে রাজী হয়নি। তাই রাগে দুঃখে মা এমন কাঠ হয়ে বসে আছেন। বাবা ফিরলে তখন রাগের কথাগুলো বলবেন।

কিন্তু সে তো অনেক দেরি! ততক্ষণ মা এইভাবে নিথর পাথর হয়ে বসে থাকবেন? একটা কথাও তো জিগ্যেস করতে সাহস হচ্ছে না!

এখন ভরসা এই, দাদাদের ইস্কুল থেকে আসা। তখন তো ওঁদের খাবার-টাবার দিতে উঠতেই হবে। তখন হয়তো মা ফেটে পড়ে বলবেন, দ্যাখ রাজু-তাজু, তোদের বড়দির শ্বশুরের আক্কেলটা দ্যাখ! এতো করে খোসামোদ করে লিখলাম!

মা'র ওই পাথর মূর্তি'র সামনে থেকে উঠে অন্য ঘরে চলে যেতেও পারা যাচ্ছে না, এ এক অদ্ভুত অবস্থা।

ক্রমেই দেখতে পাচ্ছিলুম মা'র কপালের শিরা দুটো শক্ত হয়ে উঠেছে, মা'র মুঠো বন্ধ হাতের ওপরকার শিরাগুলোও তাই হয়ে পড়েছে।

ওরা ভয়ে কেবলই দেওয়ালে টাঙানো ঘড়িটা দেখতে থাকে।

কেউ একজন এসে পড়লে বাঁচা যায়। দাদারা কিংবা বাসন মাজতে আসা ঝি। কেল একজন এলেই, দরজার কড়ানাড়ার শব্দ হবে, রাম যা-ই বলে চেঁচিয়ে উঠবে, যে আসবে সে কথা কইবে। তাহলেই হয়তো এই নিথর পাথর অবস্থার অবসান ঘটবে।

তা অবসান ঘটলো একসময়।

ঝি আসবার আগেই রাজু-তাজু স্কুল থেকে ফিরলো। দুই ভাইয়ে দুমদাম করে সিঁড়ি দিয়ে আসছে জোরে কথা বলতে বলতে, মণি আর ফুলি তাড়াতাড়ি এগিয়ে ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে ইসারা করল কথা না বলতে।

রাজুরা থমকে ইসারায় বলল, কী হয়েছে?

ফুলি ফিসফিস করে বলল, বড়দির শ্বশুর-বুড়োটা বড়দিকে পাঠাবে না লিখেছে।

তাজু বলল, শ্বশুর-বুড়ো মানে? অসভ্যর মতো কথা বলছিস যে?

আর রাজু বলল, তার জন্যে কথা না বলবার কী আছে?

চলে এলো মা'র ঘরে। সোচ্চারে বলতে বলতে এলো, মা, বড়দির শ্বশুর নাকি—

দরজার কাছে এসে থমকে দাঁড়াল।

অস্ফুটে বলল, কী হয়েছে?

সরস্বতী একবার চোখ তুলে তাঁর বড় ছেলের দিকে তাকালেন। 'বড় ছেলে' —যে ছেলে মাত্র এণ্ট্রান্স পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে।

সরস্বতী এতক্ষণে একটু নড়লেন।

হাতের মুঠো থেকে পোস্টকার্ডখানা মাটিতে ফেলে দিলেন।

রাজুর মনে হলো, মা'র সবেতেই বাড়াবাড়ি। বড়দিদির শ্বশুর তো ওইরকমই। কবে আবার পাঠাতে চান! তা তাতে হঠাৎ এমন হবার মানে কী? মনে হচ্ছে যেন—

মোচড়ানো দোমড়ানো পোস্টকার্ডটা কুড়িয়ে নিল। হাত দিয়ে ঘষে সোজা করে নিয়ে চোখের সামনে মেলে ধরল। আর তারপর ছোট ভাই-বোনেদের হতভম্ব করে দিয়ে, 'মা' বলেই হাউ হাউ করে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল।

তাজু এসে চিঠিটা ওর হাত থেকে টেনে নিল। তাজুও চেঁচিয়ে উঠল, এর মানে?

কিন্তু এর আর 'মানে' খোঁজবার কী আছে? একটা মানুষ ছিল, সে আর নেই—এমন খবর তো অহরহই সরবরাহ করছে ডাকপিয়নরা!

মায়ের মতই কাঠ হয়ে যাওয়া দীপু মণি আর অন্য দুটো ছোট ছেলেমেয়ে জানল, তাদের বড়দি মারা গেছেন।

কিন্তু ওদের মধ্যে বড়দির স্মৃতি কোথায়?

ওরা তো প্রায় দেখেইনি সেই বড়দিকে!

দেখেনি, তবু তাদের শিশুমন দিয়ে অনুভব করল, ভয়ানক একটা ঘটনা ঘটে গেছে। তাদের মা'র একটা খুব দামী আর ভাল জিনিস কোথায় যেন রাখা ছিল, সে জিনিসটা চিরতরে খোওয়া গেছে।

'মৃত্যু' জিনিসটা তো ওরা কখনো চোখে দেখেনি। তবু বুঝতে পারে, মারা যাওয়া মানে চিরতরে হারিয়ে যাওয়া। আর বুঝতে পারে, মা এখন আর ঠিক মায়ের মত রইলেন না। মা অন্যরকম হয়ে গেলেন। মাকে সহজে গিয়ে ডাকতে পারা যাবে না, মা'র কাছে কোনো কিছু চাওয়া যাবে না, মাকে ভয় করতে হবে —মা অন্যরকম হয়ে যাবেন।

অন্যরকম হয়ে যাওয়া মায়ের সেই ভবিষ্যৎ ভীতিকর মূর্তি কল্পনা করে ফুলি আর গোপাল ছুটে ছাতের সিঁড়িতে চলে গিয়ে কাঁদতে শুরু করে দিল।

আর দীপু আর মণি?

যারা সেই ছোটখাটো মাপের হাসিখুশী বড়দিকে দেখেছে ? তারা তো মায়ের মতই হয়ে গেল। কিন্তু একটু পরে মণি এঘরে এসে কান্না চেপে উথলে বলে উঠল, আমাকেও হঠাৎ কোনো সময় একদিন শুনতে হবে, আমার 'স্বর্ণ' আর নেই! একখানা পোস্টকার্ড আসবে—

রাজু বলেছিল, আমি ট্রামে করে বাবার অফিসে চলে যাই—

হ্যাঁ, ট্রাম ছাড়া আর কী ?

বাস তো আর ছিল না তখন, ট্যাক্সিও না। 'টেলিফোনে'র তো প্রশ্নই নেই। চট করে কোথাও কোনো খবর দিতে দরকার হলে লোক পাঠানো ছাড়া আর কিছু ভাবতে জানতো না গেরস্ত লোকেরা। সেই লোককেও যেতে হবে হয় ট্রামে, নয় ঘোরারগাড়িতে।

তো অফিস পাড়ায় যেতে ঘোড়ারগাড়ির কথাও ওঠে না।

সরস্বতী এখন মৃদু অথচ কঠিন গলায় বললেন, গিয়ে কী হবে ?

বাঃ, বাবাকে খবর দিতে হবে না ?

সরস্বতী বললেন, তুমি যেতে যেতে তো এসেই পড়বেন।

মায়ের এই আকুলতা-ব্যাকুলতাহীন কাটাছাঁটা কথা রাজুর ভাল লাগছিল না। রাজু বলল, বাবা যদি বলেন, আমায় একবার কেউ খবরটা দিলি না—

আবার হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল রাজু, বাবা তো অফিস থেকে হগ মার্কেটও ঘুরতে যান।

যান যাবেন। অন্ততঃ একটা সুখ-আহ্লাদের দিন তো বাড়তি পাবেন।

কিন্তু দীপুদের বাবা কি সহানুভূতির মর্মটুকু বুঝেছিলেন ? তিনি এসে মাথা চাপড়ে সুখ-আহ্লাদে কেনা সওদাগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলেছিলেন, আমি পাড়ার লোক ? আমাকে এতো রাত্তিরে বেড়িয়ে ফিরে বাড়িতে এসে এই খবর জানতে হলো ?

তারপর খুব রাগারাগি করতে লাগলেন, 'ও বাড়িতে' অর্থাৎ তাঁর মা-ভাইয়ের বাড়িতে খবরটা পাঠানো হয়নি বলে। রাগারাগি করতে লাগলেন, জামাইয়ের মেসে গিয়ে খোঁজ নেওয়া উচিত ছিল বলে।

ও বাড়িতে খবর পাঠালে, সবই হতে পারতো। গোবিন্দই দিকে দিকে ছুটতে পারতো।

রোষ ক্ষোভ শোক দুঃখ সবটা মিলিয়ে ফেটে পড়া মানুষটার সামনে সরস্বতী খুব আস্তে অথচ কঠিন স্বরে বললেন, ছুটে গিয়ে আমার শান্তকে এনে দিতে পারতো ?

সরস্বতীর এই স্থির অবিচলিত ভাবটা তাঁর স্বামী-সন্তান সকলকেই যেন শোকের থেকে বেশী পীড়িত করেছিল। মেয়েমানুষ এত বড় একটা শোক-সংবাদে কাঁদবে না, বুক চাপড়াবে না, আছড়াআছড়ি করবে না—এ আবার কেমন কথা! এমন কি ঝি-রাঁধুনী বালকভৃত্য রাম মারফৎ বার্তাটি পেয়ে আড়লে বলল, ধন্যি কাটুপ্রাণ বাবা!

রাম পর্যন্ত বলল, তাই তো কর্তা! আমার একটা বুন মরে গেচলো, মা

দশদিন ধরে আকাশ ফাইটে চিল্লেছিলো!

দীপু দেখলো বাবা প্রায় কাঁদতে কাঁদতে 'ও বাড়ি' যাচ্ছেন। শুনতে পেলে, বাবা বলছেন, শান্ত শুধু আমাদের একলার নয়, সে তার ঠাকুমা পিসি কাকা জ্যাঠা সকলের।

দীপু শুনতে পেলো, তা জানি। সেই অধিকারেই তো সবাই তাকে নিয়ে জলাঞ্জলি দিতে ভয় পাননি!

দীপু জানে না, তারপর সে রাত্তিরে কী হয়েছিল। রান্না হয়েছিল কিনা, কেউ খেয়েছিল কিনা। বাবা ও-বাড়ি চলে যাবার পরই ঘরে এসে গুটি-শুটি হয়ে শুয়ে পড়েছিল। এবং অপরিসীম সেই শান্তির রাজ্যটিতে চলে গিয়েছিল, যেখানে তলিয়ে গেলে দুঃখকষ্ট, শোকতাপ সব চলে যায় অনুভূতির বাইরে।

সে ঘুম ভাঙালো দীপুর একেবারে সকালবেলা। আস্তে উঁকি দিয়ে দেখল, মা ওঠেনি। মা'র কপালে জলপটি, ছোড়দা মাথায় বাতাস করছে।

বাবা ঘরের মধ্যে নিঃশব্দে পায়চারি করছেন। আর এদিকে দালানে জ্যেঠিমা কুটনো কুটছেন, আর গলা নামিয়ে বামুনদির সঙ্গে কথা বলছেন।

দীপুর স্মৃতির জগতে সেই এক দুঃসহ যন্ত্রণার অধ্যায়। প্রতিদিন প্রতিক্ষণ বাড়িতে লোক আসছে শোকে সান্ত্বনা দিতে। মেয়ে-পুরুষ। বাবার আত্মীয়কুল, মায়ের আত্মীয়কুল। সবাই একবার করে জ্বরে পড়ে থাকা সরস্বতীকে দেখে আসছেন। বলছেন, 'বাবাঃ, ধুম জ্বর! মনে হচ্ছে যেন ভুলও বকছে। কী বলছে না বলছে, মানে বোঝা যাচ্ছে না!'

আবার রোগীর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তার সমালোচনায় মুখর হচ্ছেন।

অসুখ তো করবেই। কথায় বলে, সন্তান-শোক! সেই শোককে অমনভাবে গিলে ফেলবার চেষ্টা করলে, বিপরীত ফল তো ঘটবেই। যা স্বাভাবিক তাই ভালো।

আবার কোনো পক্ষ এমন কথাও বলছেন, ঘরে একঘর ছেলেমেয়ে, কচিকাঁচা অতো—অমন হাত-পা ছেড়ে পড়ে থাকলে চলে? রোগ তো আরো পেয়ে বসবে। তা কষ্টটা কী আর বুঝছি না? কথায় বলে শোকতাপ! তা শোকে শুধু মনেই নয়, শরীরেও তাপবৃদ্ধি হয়। তাই বলে কি আর তাকে আস্কারা দেওয়া নেয্য? কাঁদো-কাটো—ভেতরের জ্বালা খানিক বেরিয়ে যাক, ঝেড়ে উঠে ছেলেপুলে দ্যাখো।

এই কথাগুলি দীপুদের মায়ের কর্ণগোচরে না পৌঁছুলেও বাবার কানে পৌঁছেছে। তা তাঁকে উদ্দেশ করেই তো বলা। তিনি এই কথাগুলিকে অন্যায্য বলে মনে করছেন না এই আশ্চর্য! ভাবছেন, সত্যিই তো, মেয়েমানুষ তো শোকেতাপে কান্নাকাটি করে!

যাঁরা এসব বলছেন, তাঁরা যে কেবলমাত্র দীপুদের পিতৃকুলের লোকেরা তা নয়, মাতৃকুলেরও। দীপুদের মামীরাও তো প্রথম সারিতে। যাঁরা 'ছোট ঠাকুর-জামাইয়ে'র দুঃখেই বিগলিত।

আহা, ওরও তো একই জ্বালা ! পুরুষ বলেই খেতে-নাইতে হচ্ছে, আপিস যেতে হচ্ছে। উপায় কী ?

দীপু চিরদিনই উদোমাদা, আকাশচোখো, কিন্তু এখন দীপু যেন মাটির দিকে তাকিয়ে দেখছে।

'দেখছে' বললে বোধ হয় ভুল হবে, বলা চলে, 'দেখতে পাচ্ছে'।

দীপু নিজেই অবাক হয়ে দেখছে, তার চোখের সামনে থেকে যেন একটা মোটা কালো পর্দা সরে যায়। দীপু যেন ওই মানুষগুলোর মধ্যেটা দেখতে পায়। দীপু অবাক হয়ে দেখে প্রতিটি মানুষই যেন ছদ্মবেশী। তারা যা বলে তাতে বিশ্বাসী নয়। আর দীপুর মনে হয়, দীপুদের মাকে যেন সবাই হিংসে করে। অতএব তাঁকে 'ছোট' করতে পারার সুযোগ পেলেই বাঁচে।

কিন্তু কেন ? কিসের হিংসে ?

সরস্বতী কি তাঁদের থেকে বড়লোক, তাঁদের থেকে সুন্দরী ? তাঁদের থেকে বেশী কাজের ? কিছুই তো না।

কারণটা বোধগম্য না হোক কার্যটা বোধগম্য হয়। এবং আপন প্রশ্নের উত্তর আপনিই খুঁজে বার করবার চেষ্টা করতে করতে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছয়, আসলে সবাই চায়—আর সবাই ঠিক তাদের মতই হোক। তাহলেই যেন শান্তি। কেউ যে অন্য রকম হবে, ঠিক সব্বাইয়ের মত না হয়ে "নিজে"র মত হবে, এটা কারো পছন্দ নয়।

কিন্তু শুধু এইটুকুতেই তো অতো যন্ত্রণা নয়, যন্ত্রণা আর এক কারণে। দীপুর মনে হয়, যারা তাদের বড়দি মারা যাওয়ায় যে যতই হা-হুতাশ করুক আর বড়দিকে ভালবাসুক, অনেকের মধ্যেই যেন ভেতরে ভেতরে একটু উল্লাস-উল্লাস ভাব।

কথাটা ভেবে মনে মনে ভারী লজ্জা পেল দীপু, তবু মনের অগোচর তো ভাবনা নেই। ভাবনাটা মনের মধ্যে রয়েই গেল। অথবা শুধু রয়েই গেল না, যেন যখন-তখনই বিদ্যুতের ঝলকের মতো এক এক ঝলক প্রমাণই পেতে লাগল আপন ধারণার।

মেয়েটা গেছে কী আর করা যাবে ! ভগবানের মার, মানুষের বার ! তবে স্বরস্বতী নামের উল্টোপাল্টা আর পাঁচজনের থেকে আলাদা, আত্মস্থ একটি মেয়েমানুষকে একটু পেড়ে ফেলবার সুযোগ তো পাওয়া গেল। 'আহা' করতে তো পাওয়া গেল।

যদিও শোকে সান্ত্বনা দেবার যা রীতি, গায়ে-মাথায় হাত বুলোনো এবং 'অধৈর্য হোয়ো না, আর ছেলেমেয়েদের মুখ চাও, ওদের মুখ দেখে বুক বাঁধো', ইত্যাদি সান্ত্বনাবাক্য প্রয়োগ—এ দুটোর একটারও সুবিধে হচ্ছে না।

জ্বরে পড়ে থাকা মানুষটাকে ঠিক ওই সান্ত্বনাবাক্যগুলো বলার জুত পাওয়া যাচ্ছে না, কারণ অধৈর্য তো সে হচ্ছেই না। শুনতে অবিশ্বাস্য যে, একবার ডাক ছেড়ে কাঁদেনি,—কাঁদছে না। কাউকে দেখেও না। অথচ চিরাচরিত

সমাজরীতি একটা শোকতাপের ঘটনার পর ছ মাস এক বছর বাদেও যদি কোনো আপনজনের সঙ্গে দেখা হয় তো প্রথম দর্শনে একবার ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠতে হয় তার গলা ধরে কি বুকে মাথা রেখে।

তা এর কাছে তো সেসব প্রশ্নই আসে না। আর গায়ে মাথায় হাত বুলোনো? যেটা রোগেরও সেবার অন্তর্গত, তাতেও এ মেয়েমানুষ নারাজ! একটু চেষ্টা করতে গেলেই চোখ বুঝে থেকেই বলে, 'ভাল লাগছে না। অস্বস্তি হচ্ছে।'

এ একপ্রকার অপমানই। তবু যে আত্মীয়জনেরা আসছেন, সে তাঁদের অপার মহানুভবতা তো বটেই, অগাধ স্নেহেরও পরিচয়। ছেলেপুলে কটার মুখ না চেয়ে থাকতে পারছেন না যে। আর বেচারী বেটাছেলেটা! সে তো আর এরকম কাঠগোঁয়ার নয়? সে তো একটু গায়ে মাথায় সান্ত্বনার স্পর্শ পেলে বর্তে যাচ্ছে। কৃতকৃতার্থ হচ্ছে এঁরা অসময়ে তাঁর বাড়িতে এসে সংসার দেখাশোনা করছেন বলে।

তবে সংসারে বিরোধীপক্ষও আছে বৈকি! থাকেই!

বামুনদি নাম্নী মহিলাটি (মানে নতুন বামুনদি) আড়ালে ছেলেমানুষ মেয়ে দুটোর কাছেই মনের বিরাগ ব্যক্ত করছেন, বাবাঃ বাড়িতে একটা শোক হয়েছে না, যেন রথ দোল লেগেছে। চব্বিশ ঘণ্টা চা জলখাবারের র‍্যালা, দু বেলায় কাঁড়ি কাঁড়ি রান্না। মনে করছে—গুচ্ছির কুটনো কুটে দিলেই গেরস্থর খুব উপগার করা হলো। বৌদিদিকেও আর জ্বরে ধরবার সময় পেল না। ওতেই আরো সবাই মেলা বসাবার জো পেয়েছে।

অতএব একা দীপুই মনে মনে পাপী নয়। সে তো মনের পাপ ব্যক্ত করতে লজ্জা পাচ্ছে, কিন্তু মণিমালা অক্লেশে চুপি চুপি বলতে ছাড়ছে না, বড়দি গিয়ে আমাদের বাড়িটা যেন একটা বেড়াতে আসবার জায়গা হয়েছে। দেখগে যা সবাই অনেকদিন পরে দেখা হওয়ায়, কী প্রাণ খুলে গপ্পো জুড়ে দেন। কার মেয়ের বিয়ের কথা, কার ছেলের বৌয়ের নিন্দে, কার কত সংসারজ্বালা, এই নিয়ে গাল গপ্পো। মার সাবুটা তৈরী করবো, তা তখন থেকে উনুনই খালি পাচ্ছি না, ন-পিসিমার নাতির শার্টি সেদ্ধ হচ্ছে তো হচ্ছেই!

এই সবের মধ্যেই কতগুলো যেন দিন চলে গেল। সেদিন সরস্বতীর জ্বর ছেড়েছে, হঠাৎ কোথায় যেন একটা গুঞ্জন উঠল, জামাই এসেছেন! জামাই এসেছেন!

জামাই!

মানে বড়দির বর!

শুনে সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল দীপুর। গায়ে কাঁটা দিল।

আর মণি দীপুর হাতটা শক্ত করে চেপে ধরে রুদ্ধগলায় বলে উঠল, দীপু! কী হবে?

দীপুর মধ্যেও তেমনি এক আতঙ্কিত প্রশ্ন।

ওদের মনে হচ্ছে যেন ভয়ানক একটা কিছু ঘটে যাবে। বুঝি বাবা বলে উঠবেন, তুমি আবার কেন? কে তোমায় আসতে বলেছিল। কই কেউ তো নেমন্তন্ন করতে যায়নি।

মাসে অন্ততঃ একবারও পাল পার্বণ থাকলে একাধিকবার দাদাকে ছুটতে হতো সাধনবাবুর মেসে, নেমন্তন্ন করে আসতে। অবশ্য দাদা এতে অখুশী ছিলেন না। বাড়িতে জামাই নেমন্তন্ন মানেই তো রান্নাঘরে সমারোহ। সেই দিনটি মাকে বেশ রীতিমত ভাবেই রান্নাঘরে দেখতে পাওয়া যেতো।

কিন্তু এবারে তো সে প্রশ্ন ছিল না।

মণি ভয়ে ভয়ে বলল, মার জ্বর ছাড়ার দিনই সাধনবাবু এলেন। মা যদি হঠাৎ খুব চেঁচিয়ে ওঠেন! যদি বলেন, আসতে লজ্জা করল না।

আর ফুলি কেঁদে ফেলে, কোন মতে কান্নাটা গিলে ফেলে বলল, আমি যাব না! আমি যাব না। আমার দেখতে ভয় করছে।

যদিও অন্য অন্যদিন 'সাধনবাবু' এসেছেন শুনলেই তিন লাফে ছুটে চলে যায় ফুলি। বামুনদি হেসে হেসে বলেন, মেয়ের রকম দেখো। যেন ওনারই বর এসেছে।

যদিও বড়দির মেয়ের সঙ্গে বয়েসে ফুলির মাত্র মাস ছয়েকের তফাৎ, তবু ঠাট্টার সম্পর্কে ঠাট্টা করবেই বৈকি? এই কিছুদিন আগেও তো ফুলি 'থাদনববু' বলেছে।

না সাধনদা নয়। তখন দিদির বরকে দাদা বলা রেওয়াজ ছিল না। দীপুদের বাড়িতে 'জামাইবাবু' বলারও চলন ছিল না। কিন্তু সে যাক। এখন যে ফুলি সাধনবাবু এসেছেন শুনে ভয়ে আলমারীর পিছনে লুকিয়ে বসে আছে তার কী!

কী আশ্চর্য!

কোন কিছুই হল না।

কোথাও কেউ আকাশ ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল না। কেউ সাধনবাবুকে অপমান করে তাড়িয়েও দিল না।

এমন কি রাম যথারীতি খাবারের ঠোঙা আর রসগোল্লার ভাঁড় নিয়ে চুপিচুপি পাশের দরজা দিয়ে ঢুকে এল। তাই শেখানো আছে রামকে। যার জন্যে খাবার আনা, তার সামনে দিয়ে খাবার আনাটা লজ্জার। অবশ্য গোবিন্দার কথা হলে হলে আলাদা।

ওনারা তো নিজেরাই এসে হাঁক পাড়েন—কইগো মামী কোথায়? তোমার পাড়ার ময়রার দোকানগুলো বেঁচে বর্তে আছে তো? অভাগা গোবিন্দর কপালে উঠে যায়নি তো?

তবে বড়দির ঘটনার পর যে কদিনই এসেছেন গোবিন্দদা, ওঁর 'পেটের অবস্থা খারাপ।' এক কাপ চা পর্যন্ত খাননি।

এই সূত্রেই দীপুর হঠাৎ গোবিন্দদার ওপর একটু ভক্তি এসেছিল। ওর মনে

হয়েছিল, ওই 'পেটের অবস্থা খারাপ'টা বোধ হয় সত্যি নয়। বানানো।

কী জানি সাধনবাবুর জন্যে আনানো খাবারটার কী হবে! ফেলা যাবে?

সেই ছেলেবেলা থেকে দীপু এই জিনিসটা অনুভব করেছে রোগ শোক দুঃখ যন্ত্রণা কান্না, এগুলোকে লোকে ইচ্ছে করলেই থামিয়ে রাখতে পারে, আবার ইচ্ছে হলে সেটাকে নিয়ে রসাতল করতে পারে, সমুদ্র বহাতে পারে।

অনেকক্ষণ করে, বাড়িটা অদ্ভুত রকমের চুপচাপ দেখে দীপুর মনে হল, কী রে বাবা! সাধনবাবু কি ভয়ে ভয়ে মা বাবা কারুর সঙ্গে দেখা না করেই চলে গেলেন! আহা বেচারা! এই বাড়িতেই কত আদর খেয়েছেন।

এক সময় আস্তে পা টিপে টিপে মার ঘরের দালানের দিকের জানলার সামনে গিয়ে উঁকি দিল। দেখতে পেল মা বসে আছেন বিছানায় গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে। জামাইয়ের সামনে যেমন মাথায় কাপড় দেন তেমনিই দেওয়া, সাধনবাবু খাটের সামনে একটা চেয়ারে বসে আছেন, মাথা নীচু! চোখ দিয়ে জল পড়ছে টপটপ করে।

দীপু কেমন অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

দীপু তার জীবনে বড়দিকে কবারই বা দেখেছে, তবু দীপু জানতো তাদের এই ভাইবোনের মধ্যে আর একজন আছেন, যাঁর জন্যে মায়ের মনের মধ্যে আছে অনেকখানি ভালবাসা, আর অনেকটা দুঃখ। একথা কোনোদিন ভেবে দেখেনি দূরবর্তিনী সেই মানুষটার জন্যে মায়েরই মতন ছিল অনেকখানি ভালবাসা, আর বুঝি অনেকটা দুঃখও।

একটুক্ষণ পরে দীপুকে প্রায় চমকে দিয়ে ঘরের মধ্যে একটি কথা উচ্চারিত হল। মার গলা। একদম সাধারণ কথা, সাধারণ কণ্ঠস্বর। জামাইয়ের সঙ্গে যেমন মৃদু শান্ত ভাবে কথা বলার অভ্যাস, সেই ভাবেই।

খাও বাবা! অফিস ফেরত এসেছ, তেষ্টা তো পেয়েছে।

মাথার উপর একটা খাঁড়া উঁচোনো ছিল।

ভয়ংকর ভয়ে সমস্ত চেতনা আড়ষ্ট হয়ে উঠেছিল, যে কোনো মুহূর্তে সেই খাঁড়াখানা মাথার উপর এসে পড়বে বলে। ভয়ে কাঁটা হয়ে চোখ বুজে থাকতে থাকতে, হঠাৎ একসময় দেখা গেল খাঁড়াটা বাতাসে মিলেয়ে গেছে। এ অবস্থাটা সুখের? নিশ্চিন্ততার? না কি কেমন একটা শূন্যতার?

কিন্তু কিছুক্ষণ বাদে, সাধনবাবু চলে যাবার পর একটা ঘটনা ঘটলো যেটা প্রায় সাংঘাতিক।

সরস্বতীর শোক আর রোগকে উপলক্ষ করে ক'দিন ধরে যাঁরা সব আসছিলেন যাচ্ছিলেন, দু'চারদিন থেকে যাচ্ছিলেন (দূরে থেকে আসা কেউ কেউও তো ছিলেন।) তাঁরা সকলে চলে গেলেও, সরস্বতীর সেজদি থেকে গিয়েছিলেন এখনো পর্যন্ত। বলছিলেন জ্বরটা ছাড়া না দেখে যাই কী করে?

ঝঞ্ঝাট কিছু ছিল না তাঁর। নিঃসন্তান মহিলা, যৌথ সংসারের একজন বৌ।

শাশুড়ী বর্তমান। কাজেই কর্তাটির খাওয়া-দাওয়া নিয়ে চিন্তা নেই। তাছাড়া তিনি তো আসেনও যখন-তখন। আর সেজামাসি প্রায়ই বলেন, রাত হয়ে গেছে, রান্না তো হয়ে গেছে, খেয়ে যাও না।

অতএব ধরাই যাচ্ছিল সেজমাসি আরও কিছুদিন থাকবেন।

কিন্তু সেদিন—'জামাই' চলে যাবার পর হঠাৎ সেজমাসি মাকে সাবু আর দুটো আলুসেদ্ধ খাওয়াতে এসে বলে বসলেন, জামাইকে দেখে বুকটা ফেটে গেল রে সরস্বতী। আহা নিপাট ভালমানুষ। তা এখন তো শুনছি খুব নাকি ভাল চাকরি পেয়েছে, গভোরমেণ্টের আপিসে। চাঁদের মত ছেলে। তো অমন জামাইটিকে হাতছাড়া করবি? তোর মণি তো বিয়ের যুগ্যি হয়েই উঠেছে, ওর সঙ্গে বলে দেখ না। এবারে নির্ঘাত বৌ নিয়ে কলকাতায় বাসা করবে। শিক্ষা হয়ে গেছে তো!

মণি এ ঘরে ছিল না, দীপু ছিল।

দীপু এই অসম্ভব একটা কথায় প্রায় বজ্রাহত হয়ে মায়ের মুখের দিকে তাকাল। দীপুর মনে হলো মায়ের দুই চোখের তারায় যেন ফস করে দুটো দেশলাই কাঠি জ্বলে উঠল।

মা না-খাওয়া সাবুর বাটিটা আর রেকাবীতে রাখা আলুসেদ্ধ দুটো হাত থেকে নামিয়ে খাটের তলার দিকে ঠেলে দিয়ে হাতটা তার ওপরই জল ঢেলে ধুয়ে নিয়ে গায়ে চাদর টেনে নিয়ে শুয়ে পড়লেন।

সেজমাসি অবাক হয়ে বললেন, কী হলো? খেলি না?

মা সংক্ষেপে বললেন, না।

ওমা কেন? বিকেল থেকে তো কিছু খাসনি। সাবু আর ভাল লাগছে না কেমন? তা শুধু দুধই একটু এনে দিই অ্যাঁ? জ্বর ছেড়ে গেছে, কিছু হবে না। আনি, কেমন?

মা উঠে বসলেন। তাঁর সেজদিকে হতচকিত করে স্পষ্ট গলায় বলে উঠলেন, কতদিন আর তুমি নিজের সংসার ফেলে আমার জন্যে এখানে পড়ে থাকবে সেজদি? এবার নিজের সংসার দ্যাখোগে। ভয় নেই, আমার কিছু হবে না!

বলে আবার শুয়ে পড়ে চাদরখানা মাথা পর্যন্ত টেনে ঢাকা দেন।

অথচ দীপুদের সেজমাসির এতে এমন কিছু দোষ ছিল না। অর্থাৎ তাঁর হৃদয়লোকে কোনো অপরাধবোধ থাকবার কথা নয়।

এমন তো আকছারই হয়ে থাকে। কোনো মেয়ে যদি ভরা সংসার ফেলে রেখে অকালে মারা যায়, সেই জামাইয়ের সঙ্গে পরবর্তী মেয়ের বিয়ে দেওয়ার নিয়মটাই তো সচরাচর চালু। আর পরবর্তী মেয়েরও তো অভাব ঘটে না বড় একটা। সারিগাঁথা তো থাকেই। নেহাৎ নিজের বোন না থাকলে 'তুতো' বোনও থাকতে পারে। মোট কথা জানা-চেনা একটি সুপাত্র কেউ সহজে হাতছাড়া করতে চায় না।

এই একটা অতি স্বাভাবিক চালু ব্যবস্থার পক্ষে কথা বলার অপরাধে যে সরস্বতী এমন একখানা কাণ্ড করে বসবেন তা কে জানতো?

চলে যাবার সময় সেজদি তাঁর ছোট ভগ্নীপতির কাছে এসে (সমবয়সী বলে যাঁর সঙ্গে বেশ একটু সহজ সখ্যতার সম্পর্ক ছিল। তাছাড়া সম্পর্কটাও তো সখ্যতারই অনুকুল) বলে গেলেন, তাহলে চললুম ভাই ছোট বোনাই। বোকা মুখ্যু সেকেলে মানুষ, কী বলতে কী বলে বসি, দোষ নিও না। তোমার বাড়িতে এসে কটা দিন বড় সুখেই মানে সম্মানে কাটিয়েছি। যাত্রাকালে যে এমন হতমান্যি হয়ে ফিরতে হবে তা ভাবিনি। যাক, দোষঘাট যা হয়েছে মাপ করে নিও।

বড় সুখেই কাটিয়েছি।

অনায়াসেই এ উক্তি করলেন মহিলা। খেয়াল করলেন না কোন্ পরিস্থিতিতে তাঁর ছোট বোনাইয়ের বাড়িতে থাকতে এসেছিলেন।

আসলে সুখেই যে ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর এই ছোট বোনের বাড়িটিতে প্রাচুর্যের স্পর্শ আছে রীতিমত, টানা-কষা করবার বা কোনো ব্যাপারেই কাউকে জবাবদিহি করার প্রশ্ন নেই। যেটা তাঁর নিজের সংসারে রয়েছে। শাশুড়ী নেই, জায়েদের সঙ্গে সংসার। তিনি বড় হয়েও মেজ সেজ ছোটর চোখকে বড়ই ডরান। এতটুকু অসতর্কতা, এতটুকু অপচয় দেখলেই সেই ঘোমটাধারিণীরাই ঘোমটার মধ্যে খ্যামটা নাচের অনুশীলন করে সেটি সারা সংসারে চাউর করে ফেলতে বিলম্ব করে না। এবং সেই চাউর হওয়ার ফলও ফলে।

কী কারণে কে জানে, দীপুর ওই মেজমাসিদের সংসারে সব ছোট ভাইয়ের ওপর সংসার পরিচালনার দায়িত্ব, তা কে জানে। তবে পরিচালক যখন, তখন তো আর 'পরিচারক' হতে পারেন না। হয়েছেন 'প্রভু' 'কর্তা'! তিনি অনায়াসেই বলতে থাকেন, বাড়ির হেড্ই যদি এভাবে বেহেড্ কাজ করতে থাকেন, সে সংসারের আর ভবিষ্যৎ কী? অপচয়ে কুবেরের ভাঁড়ারেও ক্ষয় ঘটে।

এখানে ছোট বোন সরস্বতীর বাড়িতে গায়ে ফোসকা পড়ানোর মত কথার চাষ নেই। ছেলেমেয়ে 'মা'কে ভালওবাসে যত, ভয় করে তত। সভ্যভব্যও বেশ। 'মাসি' বলতে একেবারে তটস্থ। এমন একখানি সংসারের ছবি সরস্বতীর সেজদির স্বপ্নের বস্তু ছিল।

শুধু নিজের সংসার!

এটি যে মেয়েমনের পরম কাব্য তা আর কেউ না জানুক তাদের সৃষ্টিকর্তা তো জানেন। কিন্তু সমান সংসারের চালুকাঠামোয় তেমনটিতো আর সম্ভব নয়। যার কেউ নেই, তার জন্যেও 'কেউ' আছে। সরস্বতীর বড়দিই তো বলেন, 'জ্বালা দিতে নেই ঠাঁই, জ্বালা দেয় সতীনের ভাই।'

অর্থাৎ জীবন কখনোই নিষ্কণ্টক নয়।

অথচ সরস্বতীর সংসারটি নিষ্কণ্টক।

দেখলে চক্ষু জুড়োয়। একটা মেয়ে, কোথায় কোন্ দূরদূরান্তে শ্বশুরবাড়িতে থাকাকালীন অবস্থায় মরে গেছে, সে শোক তার মাসির ওপর ততটা রেখাপাত করতে পারেনি। তাই বলে ফেলতে পারলেন, 'বড় সুখে কেটেছে

তোমার বাড়িতে।'

কিন্তু সুখ কি আর বেশীদিন সয় ?

সরস্বতীর ব্যবহারটা যে খুবই খারাপ হয়েছে সেকথা সরস্বতীর স্বামী অনুভব করলেও পাথরের প্রতিমার মত কঠিন ভাবলেশশূন্য মুখ স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলে উঠতে পারলেন না, 'ব্যবহারটা ভাল হয়নি তোমার।' শুধু ঘরের মধ্যে এটা ওটা নাড়তে নাড়তে আপনমনে বলার মত বলে উঠলেন, তোমার সেজদি মনটা খুব খারাপ করে চলে গেলেন।

সরস্বতী এ কথায় বক্তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে তাপউত্তাপহীন গলায় বললেন, মনটা ভাল করবার মত অবস্থায় এসেছিলেন কী ?

না না, তা তো ঠিক। তবে ভেবেছিলেন তোমাকে আর একটু চাঙ্গা করে তুলে তবে যাবেন! তো—

সরস্বতী একটু অদ্ভুতমত হাসি হেসে বললেন, চাঙ্গা তো করে দিয়ে গেলেনই।

দীপু ঘরের একধারে বসে থালা পাতিয়ে বাবা জন্যে পান সাজছিল। তা তো সাজবেই। বাড়িতে একটা শোকের ভার এসে নেমেছে বলে কি আর নিত্য-কর্ম বন্ধ থাকে ?

মায়ের ওই অন্যরকম হাসি দেখে দীপুর হঠাৎ ভিতর থেকে একটা কান্না ঠেলে উঠল। দীপুর মনে হল মা বোধ হয় আর কোনদিন আগের মত হবেন না। মার আর এই সংসারের মধ্যে যেন একটা পাঁচিল গাঁথা হয়ে গেছে।

সাজা পান কৌটোয় ভরে দীপু আস্তে আস্তে একা ছাতে উঠে এল।

এই পৃথিবীটা যেন দীপুর কাছে ক্রমশঃ এক অচেনা পৃথিবী হয়ে দেখা দিচ্ছে।

যেন একটা নীরেট দেওয়ালের গায়ে হঠাৎ হঠাৎ এক-একটা জানলা খুলে যাচ্ছে। অথচ জানলার ওধারে আলো নেই।

বড়দি মারা গেলেন, মা একটুও কাঁদলেন না, অথচ মা যেন অন্য আর একটা মানুষ হয়ে গেলেন। বড়দির বর (মার অতো আদর-আহ্লাদের জামাই) শরৎ-বাবু মার সঙ্গে দেখা করতে এলেন, মা দেখা করলেন না, সেজমাসি কী সাংঘাতিক একটা প্রস্তাব করে বসলেন। মা তাঁর অতো মান্যের আর ভালবাসার সেজদিকে বলতে গেলে একরকম তাড়িয়েই দিলেন, অথচ লজ্জিত হলেন না অনুতপ্ত হলেন না। এসবের তাৎপর্য কী ? দীপু শুধু ভেবে চলে, তার দেখা পরিমণ্ডলটুকুর মধ্যে, মানুষের সংসার আর সংসারের মানুষ, এগুলো কি এই রকমই ছিল। শুধু দীপুর বোধের জগতের জানলাগুলো বন্ধ ছিল।

বড়দিকে দীপু কতটুকুই বা দেখেছে ? তবু দীপুর সেই ছোটখাটো চেহারার মানুষটির জন্যে খুব একটা মন-কেমন করতে লাগল। দীপুর মনের মধ্যে যেন আর এক রকমের শোক এসে দীপুকে ভীষণভাবে নাড়া দিতে থাকে। দীপুর মনে হয়, দীপুই যেন তাদের এই বাড়ি থেকে অনেক দূরে কোথাও একটা অজানা অচেনা বাড়িতে, যেখানে মা নেই, বাবা নেই, দাদারা মণিদি, ফুলি,

গোপাল কেউ নেই, দীপু একা একা মরে পড়ে রয়েছে। দেখতে পাচ্ছে দীপু সেই পড়ে থাকার দৃশ্যটা।

নিজের সেই মৃতদেহটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দীপু হাপুস নয়নে কাঁদতে থাকে। নিজের মৃত্যুশোকও এতো কষ্টের ?

কাঁদতে কাঁদতে আবার একসময় থেমেও যায়।

দীপু কল্পনা করতে থাকে সিমলা পাহাড়ের (যে পাহাড়টা দীপু কখনো দেখেনি) কোথায় কোনখানে যে শ্মশান আছে, সেই শ্মশানের কাছে কোনো পাহাড়ের গুহায় এক সাধু তপস্যা করতে করতে হঠাৎ চোখ মেলে দেখতে পেলেন একটা ছোটখাটো বৌকে শ্মশানে নিয়ে এসেছে পোড়াতে। দেখে তিনি হাত তুলে হাঁ হাঁ করতে করতে ছুটে এলেন। এবং তাঁর সেই পাহাড়ী সংস্কৃত ভাষায় বলে উঠলেন, 'একে পুড়িয়ে ফেলো না, একে আমি বাঁচিয়ে দেব। না হলে তোদের ভস্ম করে ফেলব।'

যারা খাটিয়া নিয়ে গিয়েছিল, তারা ভয় পেয়ে ছুটে পালিয়ে গেল।

সাধু তাঁর কমণ্ডলু থেকে মন্ত্রপড়া জল ছিটিয়ে ছিটিয়ে সেই মৃতদেহটাকে বাঁচিয়ে তুললেন। তারপর বললেন, তুই কোথায় যেতে চাস বল্। মন্ত্রবলে তোকে সেইখানে পাঠিয়ে দেব।

বৌটি উঠে বসে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল।

সাধুকে যে প্রণাম করতে হয়, সেকথাটুকুও ভুলে গেল।

কিন্তু দীপুও তো হাঁ করে তাকিয়ে দেখছে।

বৌটা কে ? বড়দি ? না দীপু ?

তা হলে ?

দীপু এতো স্বার্থপর যে সাধুর মন্ত্রপূত জলে নিজেই বেঁচে নিল ? বড়দিকে বাঁচাল না ? হে ভগবান, বড়দিকেই বাঁচিয়ে দিন সাধু।

হঠাৎ কে ডেকে উঠল—দীপু, দীপু !

দীপু চোখ মেলে তাকাল।

সাধু নয়, মণিদি। বলছে, এই দীপু তুই কী রে ! এই অদ্ভুত সময়ে তুই ছাতে এসে বসে বসে ঘুমোচ্ছিস ? বাবা আপিস চলে গেলেন, দেখতে পেলি না !

বাবা আপিসে চলে গেলেন !

তার মানে দীপু সকালবেলা ঘুমিয়ে পড়েছে। এ আবার কী !

মণিদি বলল, কিরে বাবা, অসুখ-টসুখ করেনি তো ?

নাঃ, অসুখ করেনি।

দীপুর সাতজন্মেও অসুখ করে না।

দীপু আর দীপুর ছোড়দা, বলতে গেলে লোহার শরীর।

বড়দা আর মণিদির তো কত সময় অসুখ করে। গোপালের আর ফুলির তো কথাই নেই। হলেই হলো অসুখ। ছোটু ছোটু মসজিদ থেকে 'জলপড়া' আনতে। কালীমন্দির থেকে মা-কালীর খাঁড়া-ধোওয়া জল আনতে।

অব্যর্থ এই ওষুধ দুটি যদি নেহাতই ব্যর্থ হয়, তাহলেই ডাক্তারী ওষুধের শরণ নেওয়া।

নাঃ, দীপুর কোনো অসুখ করেনি!

দীপু শুধু একবারের জন্যে মরে গিয়েছিল।

জ্বর হয়নি, তবু দীপু যেন আচ্ছন্নের মতোই আস্তে নেমে এল নীচে।

সাধুর ভাবনাটা মন থেকে মুছতে চাইছে না।

এমনও তো হতে পারে, সত্যিই হঠাৎ একদিন দেখা গেল বড়দি এসে হাজির! বলছেন, মরবো না কেন? মরেই তো গিয়েছিলাম। শ্বশুড়বাড়িতে যা কষ্ট! কষ্টে-কষ্টেই মরে গিয়েছিলাম। তা একজন সাধু মন্ত্রবলে বাঁচিয়ে দিয়ে—

দীপুর চোখে আবার বান ডাকে।

হঠাৎ ছোড়দা বলে উঠলেন, এই তোর চোখটা এতো লাল হয়েছে কেন রে? নিশ্চয়ই 'চোখ উঠবে' তোর! আমাদের ক্লাসের একটা ছেলের—

দীপু হঠাৎ চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল, ভাল হবে না বলছি ছোড়দা! মা, দেখো না, ছোড়দা আমায় অভিশাপ দিচ্ছেন। বলছেন তোর 'চোখ উঠবে'।

শেষ পর্যন্ত ছোড়দাই দীপুকে বাঁচালো।

দীপু চেঁচিয়ে কেঁদে নিয়ে বাঁচল।

এরপরই একদিন ওবাড়ি থেকে দীপুর ঠাকুমা এলেন পাল্কি চেপে।

কোথায় যেন তীর্থে গিয়েছিলেন, প্রসাদটসাদ দিলেন। 'মাস্তু'র নাম করে কাঁদলেন একপালা। তারপর বললেন, আমি বলি কি সেজবৌমা, মাস্তুর মেয়েটাকে তোমার কাছে আনিয়ে নাও।

দীপুর মা অবাক হয়ে বললেন, আমার কাছে?

ওমা, এমন আকাশ থেকে পড়ছ কেন বাছা! মাওড়া ছেলেমেয়ে দিদিমার কাছে মানুষ হয় না? তুমি তোমার জামাইকে শক্ত হয়ে বলো, মেয়েটাকে তোমার কাছে দিয়ে যেতে।

সরস্বতী আস্তে বললেন, তার তো ঠাকুমা ঠাকুর্দা সবাই রয়েছে।

তা থাক। ঠাকুমা তো সেই আত্মসুখী, গতরসোহাগী! তোমার মেয়েটাকে খাটিয়ে-খাটিয়েই মেরে ফেলল!

চোখ মুছতে লাগলেন থানের আঁচলে।

দীপু অবাক হয়ে ভাবল, বুড়ো হলে কি মানুষ এইরকম বোকা হয়ে যায়? যে কথা শুনলে মার ভীষণ কষ্ট হবে, কত সহজেই সেই কথাটা বলছেন! নিজে কাঁদছেন তবু বলতে ইচ্ছে করছে? কই মা তো একবারও বড়দির নাম করেন না!

নাম করতে পারেন না বলেই তো!

দীপু-মণিরা শুধু চুপিচুপি নিজেরা বলাবলি করে, তখন যদি জানতাম বড়দিকে আর দেখতে পাবো না, তা হলে যাবার সময় অনেক বেশী করে দেখে নিতাম।

বলে, আমরা তো তখন নেহাৎ ছোট ছিলাম তাই। বুঝতেও পারতাম না বড়দির কত কষ্ট।

বলে, নিজেরা বলাবলি করে চুপি চুপি বলে।

আর ঠাকুমা কিনা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে মার সামনে বলছেন, শাওড়ী মাগী তোমার মেয়েটাকে খাটিয়ে খাটিয়েই মেরে ফেলল!

সাধে কি আর বলতে ইচ্ছে করে, বুড়ো হলে মানুষ বোকা হয়ে যায়!

ঠাকুমা আবার বলেন, বাপ তো আবার বিয়ে করবেই, তখন মেয়েটার কী হাড়ির হাল হবে তা তো বুঝতেই পারছো বাছা!

মা বিরস নীরস গলায় বললেন, যে যার ভাগ্য নিয়ে এসেছে!

ঠাকুমা আরো বিরস বেজার গলায় বললেন, এ তোমার গা-এড়ানো কথা হলো মেজবৌমা। সৎমার সংসার আর কামারশালের হাপড় হচ্ছে এক। আর মা মরলে বাপ তালুই, এ তো চিরকেলে কথা!

সরস্বতী ক্লান্ত গলায় বললেন, যাদের মেয়ে তারা বুঝবে। আমি আর কী বলবো বলুন!

তার মানে তুমি দায়িত্বটি নেবে না! চিরকেলে একবগ্গা তো! বলে ঠাকুমা রাগ করে ছেলের কাছে চলে গেলেন।

পালকি দাঁড় করানো আছে, বাড়তি একটা কি দুটো পয়সা দেবেন ঠিক করেই রেখেছেন। নেহাৎ ছেলের আকিঞ্চনে এক-একবার আসা আজকাল। প্রথম প্রথম তো একেবারেই আসতেন না। কেউ ভাবতেও পারতো না উনি আসবেন।

যে বৌ তাঁর ছেলেটাকে কেড়ে নিয়ে ঘর ভেঙে চলে এসেছে, সে বৌয়ের ছোঁয়া মাড়ায় কেউ? নেহাৎই ছেলেটা কেঁদে ফেলে বলেছিল, আমার যদি হঠাৎ কোনো শক্ত অসুখ করে, মা, যদি মরেই যাই, তাহলেও তুমি আমার বাড়ির ছায়া মাড়াবে না? তাই না সেই অনমনীয়ার এই নমনীয়তাটুকু! কিন্তু বৌ যেন মানোয়ারি গোরা!

যাক—

ঠাকুমার একটা ভবিষ্যৎ-বাণী সঙ্গে সঙ্গে ফলল।

কদিন বাদেই জানা গেল সরস্বতীর জামাই আবার বিয়ের পিঁড়িতে বসতে যাচ্ছে।

কনে?

কনে দীপুদের সেজমাসির ছোট দ্যাওরের মেয়ে।

তবে মেজমাসি নাকি এ ব্যাপারের কথা ঘুণাক্ষরেও জানতেন না। বিয়ে ঠিক হওয়ার পর জানতে পেরেছেন। ছোট জায়ের বাপেরবাড়ি থেকেই নাকি সম্বন্ধটা এসেছিল। তারা তো আর কে কী বৃত্তান্ত জানে না!

সেজমাসিও তাই 'কিছু' জানতেন না। বর দোজবরে, শুধু একটামাত্র মেয়ে আছে, এইটুকুই শুনেছিলেন।

তবে কথা হচ্ছে, বেশী জানলেই বা কী? একটা দামী জিনিসকে কেউ যদি অচ্ছেদ্দা করে ফেলে দেয়, সেটা অন্য আর একজন কুড়িয়ে নেবে না? এতে আর আশ্চর্য কী!

বি. এ. পাস ছেলে, রূপের কান্তি, সরকারী চাকরি! এ ছেলে আগে একবার পিঁড়িতে বসেছিল বলে কি তার দাম কমে গেছে? না একটা সন্তানের বাপ হয়েছে বলে 'পতিত' হয়ে গেছে?

কি বা বয়েস!

সেজমাসির ছোট দ্যাওরের মেয়ের বিয়ের নেমন্তন্ন-পত্র দীপুদের বাড়িতেও এসেছিল বৈকি। কুটুম-কুটুম্বিতার ঘর তো বটেও।

আর নেমন্তন্ন যখন করেছে, তখন লৌকিকতাও করতেই হবে। বামুনদির হাত দিয়ে বিয়ের সকালে একখানা লাল ডুরে শাড়ি আর একথালা অমৃতি পাঠিয়ে দেওয়া হলো খুঞ্চেপোষ ঢাকা দিয়ে।...আর নেমন্তন্নরক্ষা হিসেবে বড়দাকে গিয়ে খেয়েও আসতো হলো।

নিমন্ত্রণ-কর্তা তো সেজ মেসোমশাই। চিঠির তলায় তাঁরই নামের স্বাক্ষর রয়েছে। তাঁর একটা মানমর্যাদা আছে তো।

এই বিয়ের ক'দিন পরেই সরস্বতীর প্রাক্তন জামাই হঠাৎ একদিন ঘোড়ার-গাড়ি চেপে তার সেই 'মাওড়া' মেয়েটাকে নিয়ে এসে হাজির।

হাজির বললে বোধ হয় ঠিক বলা হয় না, 'চোরের' মত ভীত কুণ্ঠিত পদার্পণ।

আবেদন, দিদিমা যদি মেয়েটাকে কাছে রাখেন!

কেন?

কেন আর? মা-হারা বেচারা! মায়ের মার কাছে যদি থাকতে পায় বর্তে যাবে!

সরস্বতী বললেন, কেন, ও তো নতুন মা পেয়েছে?

সে তো নিজেই ছেলেমানুষ! কী বা জানে বোঝে!

কেন, তার বাবার মা?

তিনি তো চিররুগ্ন! তা ছাড়া সাধন তো আর এবারে এখন বৌ-মেয়েকে সেই পাহাড়চুড়োয় রেখে আসবে না। কলকাতায় বাসাভাড়া করেছে।

সরস্বতী অবলীলায় বললেন, সে বাসায় যদি তোমার মেয়েকে না ধরে, কোনো ইস্কুল-বোর্ডিংএ রেখে দাও না। আজকাল তো হয়েছে এরকম কিছু কিছু ব্যবস্থা। নেহাৎ শিশু তো আর নয়। প্রায় ফুলিরই বয়সী তো।

জামাই মুখ কালো করে চলে গেলেন। একটু জল পর্যন্ত মুখে দিলেন না।

মেয়েটাকে যাই ইত্যবসরে তার মাসিরা ডেকে নিয়ে গিয়ে বিস্কুট ল্যাবনচুষ আর ছোলার চাকতি দিয়ে আপ্যায়ন করেছিল, তাই তার মামার বাড়িতে জলগ্রহণ!

মেয়েটা নিতান্তই কাতরভাবে তার সদ্য-চেনা মাসিদের দিকে করুণ চোখে

তাকাতে তাকাতে বাবার সঙ্গে গাড়িতে গিয়ে উঠল।

মাসিদেরও দুঃখে বুক ফেটে যাচ্ছিল। আর সেই ফাটা বুক থেকে ওঠা নিঃশ্বাসের সঙ্গে তাদের মধ্যেও একটি ক্ষুব্ধ প্রশ্ন জাগছিল, মা তো ইচ্ছে করলেই ওকে রাখতে পারতেন! তবে কেন?

মণি-দীপুদের যে মাঠের মত খাটটা রয়েছে, তাতে চারজনকে তো অনায়াসেই ধরে যেতো। আর থালা, গেলাস, বাটিও তো তাদের কত বেশী বেশী।

তবে?

তবে অসুবিধেটা কোথায় ছিল? মণিমালা বলে উঠল, যাই বলিস দীপু, ঠাকুমা যে সেদিন মাকে 'পাষাণী' বলে গেলেন তা নেহাৎ মিথ্যে নয়। 'সৎমার সংসার কামারশালের হাপর।' এও তো সত্যি! আহা, যাবার সময় কী রকম করে তাকাচ্ছিল বিবি!

তিন বোনে মিলে অনেক আলোচনা করেও ভেবে ঠিক করতে পারল না, বড়দির মেয়েটা এখানে থাকলে মার কোথায় কী অসুবিধে হতে পারে! অথচ মা—আহা, সৎমার কাছে থাকা! কী কষ্ট, কী কষ্ট!

হঠাৎ পর পর অনেকগুলো অভিজ্ঞতা এসে গেল দীপুর মানসিক জগতে। বড়দির আকস্মিক মৃত্যু, লোকের সেই এক অদ্ভুত প্রস্তাব মণির সঙ্গে বড়দির বরের বিয়ের, সেই সূত্রে মায়ের চিরভালবাসার সেজদিকে বাড়ি থেকে চলে যেতে বলা, এবং সর্বোপরি বড়দির মেয়ে 'বিবি'কে নিজের কাছে রাখতে না চাওয়া!

ঘটনাগুলো যেন এক একটা করে হাতুড়ী বসিয়েছে দীপুকে। অথবা দীপুদের। দীপু মণি ফুলি তিনজন ভরদুপুরে ছাতের সিঁড়িতে বসে, মায়ের হৃদয়হীনতা নিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে। বলেছে, এদিকে তো দেখি কত দয়ামায়া! খোকার মার মা-মরে-যাওয়া নাতিটার জন্যে সব সময় কত কী দেন, অথচ নিজের নাতনী—

দুঃখে অভিমানে কথা শেষ করতে পারেনি বেচারীরা।

বিশেষ করে ফুলি। বিবিকে ওর বাবা এখানে রাখতে এসেছে শুনে আহ্লাদে আটখানা হচ্ছিল, একটি সমবয়সী পাবে বলে। সে আশায় ছাই পড়ল। ফুলি সেই আক্ষেপটি হজম করতে না পেরে, মার আড়ালে বাবার কাছে অভিযোগে ভেঙে পড়ল। আচ্ছা বাবা, মা যে বিবিকে থাকতে দিলেন না, তাড়িয়ে দিলেন এটা বুঝি খুব ভাল কথা হল?

বাবা প্রথম অবাক হলেন, বিবি কে?

বিবি 'কে', তাও জানো না? ইস! নিজের নাতনী! দুজনেই দেখছি একরকম। বিবি বড়দির মেয়ে না? ওকে ওর বাবা আজ নিয়ে এসেছিলেন না, এখানে রেখে যেতে? তোর মা তো থাকতেই দিলেন না। তাড়িয়ে দিলেন।

ফ্রকের তলাটা তুলে চোখ মুছল ফুলি।

বাবা আগের থেকেও অবাক হয়ে বললেন, তাড়িয়ে দিলেন?

দিলেনই তো। বললেন এখানে রাখা সুবিধে হবে না।

বাবা অফিসের জামাকাপড় ছাড়ছিলেন, সেটা স্থগিত রেখে আস্তে বললেন, তোমাদের মা যা ভাল বুঝেছেন তাই করেছেন। এতে আর তোমাদের কী ?

আমাদের কী ? বাঃ ! আমার একটা প্রাণের বন্ধু হতো না ?

বাবা সামান্য হেসে বললেন, উল্টোও তো হতে পারতো।

উল্টো ! মানে বন্ধু না হয়ে শংকর ? আমি তেমনি মেয়ে ?

তুমি কেমন মেয়ে সে তো জানাই কথা ! অন্যজন ? সে কেমন তুমি তো জানো না।

বাবা ! বামুনদি বলেন, ভালবাসলে বনের পশুও বশ হয়।

আরে বাবা, বনের পশু বশ হয় বলে যে মানুষও হবে, তার কী মানে ? এক হিসেবে ওইসব জন্তুজানোয়াররা মানুষের থেকে অনেক ভাল।

মানুষের থেকে জন্তুরা ভালো !

ফুলি হাঁ।

বাবা জোর দিয়ে বলেন, কেন নয় ? মানুষ মিথ্যে কথা কয়, বিশ্বাসঘাতকতা করে, অপরকে ঠকায়, জন্তুরা করে এ সব ? তা যাক, এ নিয়ে মন খারাপ কোরো নাম। তারই যে এখানটা ভাল লাগতো তাও না হতে পারে। মামারবাড়ির কাকেই বা চেনে ? সেখানে তার ঠাকুর্দা ঠাকুমা পিসিরা কাকারা—

হাতীরা ! ঘোড়ারা !

ফুলি প্রায় কেঁদে ফেলে বলে ওঠে, ও কি আর সিমলেয় যাবে নাকি ? কলকাতায় সৎমার কাছে তো থাকতে হবে ওকে ! ওর কী কষ্ট হবে ভাবো বাবা। সৎ মা ! উঃ !

বাবা একটু নিঃশ্বাস ফেলে বলেন, সৎমা যে খুব খারাপই হবে এমন ভাবছ কেন ? ওই তো তোমাদের সেজমাসির শ্বশুরবাড়ির মেয়ে। চেনা জানা !

আহা রে—

ফুলির যতো সাহস হচ্ছে অবোধের দুঃসাহস। মণি দীপু ফুলির কথা শুনে হাঁ হয়ে যায়।

ফুলিটা বলে কিনা, আহা রে ! বাবা তুমি যেন এই মাত্তর আকাশ থেকে পড়লে ! কিছু জানো না !...জানো—শাস্তরে আছে সাপ যদিও বা ভাল হতে পারে, সৎমা কখনো ভাল হয় না।

থামো ! এঁচোড়ো পাকা মেয়ে !

বাবা হঠাৎ স্বভাবছাড়া ভাবে ফুলিকে ধমকে উঠলেন, এইসব শাস্ত্রকথা কে শিখিয়েছে তোমায় ?

এর উত্তর অবশ্য দেবার ক্ষমতা রইল না ফুলির। ফুলির এই শাস্ত্রের উৎস যে খোকার মা, সে কথা তো বাবার সামনে বলতে পারে না।

তবে ফুলির এই দুঃসাহসে প্রতিক্রিয়া কিছু ঘটলো। বেশ জোরালোই ঘটলো।

সরস্বতী বললেন, আমি যখন এতই পাষাণী, তবে আমার কথা বাদ দাও। নিয়ে এসো তুমি বিবিকে।

অতঃপর নিয়েও এলেন বিজয়ভূষণ, জামাইয়ের নতুন বাসায় গিয়ে, বলে কয়ে।

কিন্তু সাতদিনও থাকল না বিবি তার মাসিদের কাছে। কেঁদেকেটে চলে গেল। এবং গেল সেই সিমলাতেই। বাবার কলকাতার বাসায় নয়! বলেছে কিনা কলকাতায় আবার মানুষে থাকে? ছাই বিচ্ছিরি পচা।

ভালবাসায় বনের পশু বশ হলেও, মানুষ যে সব সময় তা হয় না, তা তো দেখাই গেল। কী প্রাণঢালা ভালবাসা নিয়েই তারা তিন বোন মাতৃহারা মেয়েটাকে দুঃখ ভুলিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু হিতে বিপরীতই হলো।

সাত বছরের মেয়েটা, যার বাংলা কথায় পাহাড়ি টান (লোকজনের কল্যাণে) সে পাকা গিন্নীর মত ওদের দেওয়া খেলনা পুতুলগুলো ছুড়ে ছিটিয়ে ফেলে দিয়ে দিয়ে বলেছিল তোদের আদর আমার বিচ্ছিরী লাগে। রাতদিন কেবল, আহা তোর মা মরে গেছে। আহা তোর মা—

ছুটে চলে গিয়েছিল ছাতের সিঁড়িতে।

এরা হাঁ করে তাকিয়ে থেকেছে।

কী আশ্চর্য! কখন আবার ওকথা বলেছে তারা। একবারের জন্যে তো মুখেও আনেনি ও কথা। তবে কেন?

ওর ওই ছুটে চলে যাওয়া দেখে হঠাৎ বুকটা কাঁপে দীপুর।

চোখের সামনে ভেসে উঠল: একটা সমারোহময় বিয়েবাড়ি, আর—আর বারান্দা থেকে নীচে পড়ে যাওয়া একটা ফুলের মত মেয়ের রক্তাক্ত চেহারা।

কেন যে তখন সেই ভয়াবহ দৃশ্যটা মনে এসে গেল। দীপু মনেমনে ঠাকুরের নাম জপ করতে করতে সিঁড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ওকে দেখেই বিনি ছিটকে উঠে বলল, আবার এলি জ্বালাতন করতে? আমি থাকব না, আমি এখানে থাকবো না। দিদিমাকে বলে দিগে, আমায় পাঠিয়ে দিতে।

এই অদ্ভুত অভিজ্ঞতাটা দীপুকে যেন ভয়ানক একটা ধাক্কা দিয়ে একটা চড়া রোদের মধ্যে এনে দাঁড় করিয়ে দিল।

ওই ছোট্ট মেয়েটা মা হারানোর হাহাকারটা বরং পরিপাক করে নিতে পারছে, পারছে না সহানুভূতির স্নিগ্ধ প্রলেপ। স্নিগ্ধ না করে সেই সহানুভূতি মেয়েটাকে বিদ্ধই করেছে। তাই সে ডাক ছেড়ে বলে উঠেলে, সব সময় খালি তোর মা মরে গেছে, তোর মা মরে গেছে—।

আবার ওই মেয়েকে পেঁছে দিয়ে আসতে হল দীপুদের বাবাকে। ঘোড়ার গাড়িতে চাপিয়ে সঙ্গে খেলনা খাবার আর অনেক লজেন্স দিয়ে। তখন আর সে সব ফেলে দিল না বিবি। বেশ আত্মস্থ ভাবে বসে রইল ফুলোহাতা ফ্রকের হাতার মত গাল দুটো ফুলিয়ে। আর গাড়ি ছাড়বার আগে কী ভেবে বলে উঠল, তোরা একবার যাস আমাদের সিমলেয়।

ভগবান জানেন কী ভেবে বলল।

ওর জায়গাটা যে কী সুন্দর, তাই দেখবার মানসে? না পাল্টা সৌজন্যের জন্যে?

দীপু ভেবেছিল গাড়িটা চলে যাবার পর মা বুঝি কেটে পড়বেন। হয়তো বলে উঠবেন, দেখলি ? দেখলি তো বুঝলি কেন আমি প্রথম থেকেই রাখতে চাইনি !

কিন্তু সে সব কিছু হল না। মা ঘরে চলে এসে একখানা বই নিয়ে বসলেন।

তো এ তো সেদিন বিকেলের কথা। রবিবারের বিকেল। সোমবার সকালে অশনিপাতের মত একটি খবর এল জ্যেঠিমার সেজ মেয়ে 'ভামি' নামের সেই অতি সাধারণ মেয়েটা একটা অসাধারণ ঘটনার নায়িকা হয়ে বসে আছে।

চোদ্দ বছরের ভামি, যার মাত্র বছর দেড়েক হল বিয়ে হয়েছে, সেই ভামি 'বিধবা' হয়েছে।

কী আশ্চর্য ঘটনা !

প্রায় মণির মতই বয়সের মেয়েটা।

সাত তাড়াতাড়ি বিয়ে দেওয়া হয়েছিল তার। ভাল খরবর পাওয়া গিয়েছিল। তারাও খুব আগ্রহ দেখিয়েছিল।

এখন শুনতে পাওয়া যাচ্ছে (যাদের দ্বারা সব খবর সরবরাহ হয়। তাদের দ্বারাই শোনা গেল) ভামির বরটার নাকি কী একটা মোক্ষম ফাঁড়া ছিল। তো জ্যোতিষীরা কোষ্ঠী দেখে বলেছিল, বিয়ে হলে ফাঁড়া কেটে যেতে পারে।

তাই অত আগ্রহ।

তার মানে জেনে বুঝে একটা কাঁচ মেয়েকে 'বিধবা' করাবার জন্যে আয়োজন হয়েছে।

কিন্তু এখানেও যে আবার ছন্দ ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে।

ভামিদিকে যে রাজ্যি সুদ্ধু সবাই 'আহা' 'আহা' করছে, ভামিদি তো কই রেগে যাচ্ছে না। কই বলে তো উঠছে না, রাতদিন কেবল বলা হচ্ছে আহা তোর বর মরে গেছে ! আহা তোর বর মরে গেছে !

না এমন কথা বলে উঠছে না ভামি বা ভামিনী নামের মেয়েটা। বরং সে যেন ওই 'আহা'র হাতে নিজেকে সঁপে দিয়েছে।

বাড়ির ব্যাপার, সরস্বতীকেও প্রায় প্রায়ই আসতে হচ্ছে তার বড়জায়ের শোকে সান্ত্বনা দিতে। কিন্তু খুবই অস্বস্তিকর অবস্থা। সরস্বতী দুপুরের দিকে যখন ছেলেরা স্কুলে, আর স্বামী অফিসে, তখন একটা ঘোড়ার গাড়ি ডাকিয়ে রামের সঙ্গে আসছেন মেয়ে তিনটিকে নিয়ে। বড় হয়েছে, একা বাড়িতে রেখে আসা যায় না।

তিনজনে একা ?

তা তিরিশজনে হলেও হতো বোধ হয়।

কুমারী মেয়ে একটু বড় হয়ে উঠলেই সে যে বেড়ালের রাজ্যে, মাছ দুধের সামিল। তাকে সামলাতে হবে বৈকি, তো এসে সারা দুপুরটা দীপুরা বাড়ির এই শোকলীলা দেখতো। শোক অথবা সান্ত্বনালীলা।

ভামি বসে থাকে দুই হাঁটুতে মুখ গুঁজে, আর পাড়াপড়শিনী আত্মীয়াকুল তাকে ঘিরে বসে, অনবরত তার পিঠে হাত বুলিয়ে চলেন, তার বিশাল কেশ-

রাশির মধ্যে আঙুল চালাতে থাকেন আর দীর্ঘশ্বাস ফেলতে থাকেন।

দীপু ভেবে পায় না ওঁরা একমনে ভামিদির পিঠটায় হাত বুলিয়ে চলেন কেন? দেখে মনে হয়, যেন ভামির এই দারুণ দুর্ভাগ্যের জ্বালা যন্ত্রণাটা বুঝি তার পিঠটাতেই আশ্রয় নিয়েছে। তার সমবেত চেষ্টা ঘষে ঘষে সেই জ্বালা দূর করার।

হাসিটা গর্হিত। হাসিটা অন্যায়। তবু একদিন আড়ালে মণির সঙ্গে দীপুর হাসাহাসি চলেছে, সবাই মিলে ভামিদির পিঠটা অতো ডলে কেন বল তো? কষ্টটা বুঝি পিঠে আটকে আছে?

যা বলেছিস! দেখে এতো খারাপ লাগে! আমায় কেউ ওরকম করলে ঠিক ওদের হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে যেতাম।

ইস! এই মণিদি, তুমি ভামিদির সঙ্গে নিজের তুলনা করলে? 'অপয়া' হল না? এখন ভামিদির সঙ্গে তুলনা করতে আছে?

মণি তাড়াতাড়ি হাত জোর করে কপালে ঠেকিয়ে বলে, ভুলে রে! কাউকে বলিস না বাবা!

আর দেখেছিস, কটু পিসি ভামিদির চুলে হাত দিয়ে নাড়েন আর বলতে থাকেন, আহা! আহা! এই চুলের ঢাল!

সেই তো! আমার তো শুনে শুনে ভয় করে। চুলগুলো ঠাকুমার মত কেটে দেবে না তো?

তা আশ্চর্য্য নেই। ওনারা হায় হায় করতে করতে সব পারেন।

আর দ্যাখ কেবলই সবাই মিলে বলে চলেছে, 'আহা এই বয়েসে সব ঘুচলো!···আহা এই কচি বয়েসেই আহা মাছ না হলে মেয়েটা একবেলা খেতে পারতো না।·আহা, নাপতিনী এলে আগে ছুটতো আলতা পরার জন্যে।' বলতে ভালো লাগে?

দেখছি তো ভালো লাগছে। মা ওই জন্যে আসতে চান না। কিন্তু না এলে বাবা মনে দুঃখু পাবেন, ঠাকুমা জ্যেঠিমারা ভাববেন, মার কিছু কষ্ট হয়নি, তাই আসেন। তাইতো মা এ ঘরে বেশী আসেন না।

তা এ চরে বেশী না এলেও সরস্বতীকে তাঁর বড় জায়ের ঘরে ঢুকেই বসে থাকতে হয় একপাশে।

সেখানেও এই একই লীলা।

জ্যেঠিমা উপুর হয়ে শুয়ে পিঠটা খোলা চুলগুলো উল্টে ওপর দিকে তোলা, আর এ ঘরের সহানুভূতিশীলারা জ্যেঠিমার চওড়া পিঠটায় একমনে হাত ঘষে যাচ্ছেন। বাবা যেমন কাঠের জিনিসটিনিস পালিশ করবার আগে শিরিষ কাগজ ঘষতে থাকেন।

সরস্বতী সে দলে নেই। সরস্বতী দেয়ালে পিঠ দিয়ে বসে থাকেন চুপচাপ। কখনো বা বলেন, এ ভাবে না খেয়ে পড়ে থাকলেই কি কোনো লাভ আছে দিদি? খাও কিছু!

দিদি কখনো ঠিকরে উঠে বলেন, আমায় তোমরা খেতে বলছ? ভামির

কপাল খেয়ে বসে আছি আমি—

সরস্বতী হতাশ গলায় বলেন, এইসব কথার কোনো মানে আছে ?

'মানে নেই, তবু এইরকম সব কথার চাষ চলতেই থাকে। ভামি তার জীবনের কী কী হারাল, তার ফিরিস্তি চলতে থাকে। আর ভামির মা হঠাৎ হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে বলেন, ওরে জন্ম জন্ম লোকের মেয়ে মরুক। মেয়ে যেন বিধবা না হয়।

তার মানে সরস্বতী সম্প্রতি যে শোক পেয়েছেন, তার থেকে অনেক গভীর যন্ত্রণাদায়ক শোক সরস্বতীর বড়জায়ের।

কিন্তু দীপু মণি শুনে চমকে ওঠে। জন্ম জন্ম 'মেয়ে মরুক'।

তার মানে মেয়ে 'মরা'টা কোনো ব্যাপারই নয়। 'মেয়ে'রা যে নিতান্তই মূল্যহীন, এ সত্য উদ্ঘাটিত হয়ে চলেছে তো অতি শৈশবকাল থেকেই। তবু—

মা হয়ে বলছেন, জন্ম জন্ম মরুক মেয়ে !

দীপুর মনে হল, আসলে এই 'শোক' জিনিসটা একটা 'নিয়ম' পালন মাত্র।

না কেঁদেও থাকা যায়। তবু লোকে ইনিয়ে বিনিয়ে কথা বলে বলে কেঁদে কেঁদে ব্যাপারটাকে জুড়োতে দেয় না, ঠাণ্ডা হতে দেয় না।

দীপু যখন বড় হয়ে এই সব কথা লিখবে, লিখে লিখে সব্বাইকে জানিয়ে দেবে এসব কথা।

পৃথিবী তার চিরন্তন নিয়মে দিনরাত্রির চক্রে আবর্তিত হয়ে চলেছে।

প্রকৃতি আবর্তিত হয়ে চলেছে ঋতুচক্রের তালে।

মানুষের ঘরে, সংসারচক্র আবর্তিত হয়ে চলেছে ওই দিন রাত্রি আর শীত গ্রীষ্ম বর্ষা বসন্তের ছন্দেই। তবে এ চক্র আবর্তিত হয়ে চলে, তার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত জীবগুলোর আশা হতাশা সুখ দুঃখ রোগ শোক আর জন্ম মৃত্যু বিবাহের ঘটনাদের নিয়ে।

সে চাকা কখনো চলে নিঃশব্দে মসৃণ ছন্দে, কখনো বা কর্কশ ঘর্ঘর তীব্র তীক্ষ্ণ আওয়াজ তুলে। তা তাতে ওই জীবগুলো অভ্যস্ত। তাই তাদেরকে এই দেখো কেঁদে ভাসাচ্ছে, এই দেখো আহ্লাদে ভাসছে। এই দেখো বুক চাপড়াচ্ছে, এই দেখো পান চিবোচ্ছে। তার জন্যেই না তার নাম 'মহাশয়'।

সংসারে একটা মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটে গেলেই যে তার অব্যবহিত পরেই সে সংসারে একটি জন্মের সূচনা দেখা দেবে না, এমন হয় না। সংসারে একটা মেয়ের অকাল বৈধব্য ঘটলেই যে সে সংসারের ভয়ে শিউরে অন্য একটা মেয়েকে 'সকাল সকাল' পাত্রস্থ না করে 'অরক্ষণীয়া' করে তুলে বসিয়ে রাখবে এমন অনাসৃষ্টি কথাও ভাবতে পারে না।

'ভামি'র অকাল বৈধব্যের শোকসভা-মঞ্চেই কেমন করে যেন মণিমালার উপযুক্ত (অথবা মণিমালা যাকে পেয়ে কৃতার্থ হবে) একটি সুপাত্রের সন্ধান পাওয়া গেল। যাওয়াই স্বাভাবিক, বিবাহবাসর আর 'শোক-বাসরে'র মধ্যে মহিলাকুলের আলাপ-আলোচনা বাক-বিনিময়ে খুব একটা পার্থক্য তো থাকে

না। বাড়ির আর এক মহিলার নতুন বালার ডিজাইন এবং তার মজুরির অংক তো এই সভা থেকেই সংগ্রহ করে গেল ভামির মাসির এক জা।

পাত্রের সন্ধানও এইভাবেই।

সরস্বতীকেই উপযাচক হয়ে বললেন একজন, এবং সরস্বতী যখন ম্রিয়মাণভাবে বললেন 'এখানে ওসব কথা থাক ভাই—' তখন সরস্বতীর ননদকুলের একজন ঝাঁপিয়ে পড়ে বললেন, ও পাগলের কথা রাখো ভাই তুমি, আমায় সব বিশদ বলো, ভাইদের বলে কথা পাকা করাই।

এরপর আর কী?

সরস্বতী তো আর সত্যি পাগল নয় যে, বলবেন, 'ভামির এই অবস্থা দেখে ইচ্ছে করছে না—মেয়েটাকে এক্ষুণি—'

মেঘে মেঘে তো বেলা কম হল না মেয়ের। তেরো পার হলো বলে।

সরস্বতীও তো আবার তেমনি আলগা মা! আইবুড়ো মেয়েকে যে যথেচ্ছ বাড়তে দিতে নেই, বারো-তেরোর গণ্ডীতে আটকে রাখতে হয়, এটি তাঁর জানা নেই। কাজেই মণিমালা তেরোয় পড়েও বসে পড়েনি, দিব্যি এগোচ্ছে। এবং ঘরে পরে সবাই সে খবর জেনে বসে আছে।

তেরো ভরে এল।

সোজা কথা! মেয়েদের তো দশ এগারো বছর বয়েস থেকেই 'আস্ত' একটা মানুষ ভেবে নিয়ে (মানে মেয়েমানুষ' ভেবে নিয়েই) তাকে সংসার রণাঙ্গনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয় সর্ববিধ ঝড়-ঝাপটার সঙ্গে মোকাবিলা করতে! তার কাছ থেকে একটা পুরো মানুষের আক্কেল-কর্তব্য, বিচার-বিবেচনা সেবা-যত্ন আর কাজকর্ম প্রত্যাশা করা হয়।

আশ্চায্যি!

পেরেও তো যেতো মেয়েগুলো। তা দশ-বারোই বা বলি কেন, সাত-আট বছর বয়েস থেকেই তো মেয়েগুলো মা খুড়ির কাঁচকাচাগুলোর আভভাবিকার পোস্টটি অধিকার করে দিব্যি তাদের প্রায় মানুষ করে তুলতো! পাঁচ ছয় সাত আট বছরের মেয়েগুলোর ট্যাঁকে একটা 'শিশুমানবক' নেই এমন দৃশ্য দৈবাতের ঘটনা।...

আজকের শহর সংস্করণের সমাজ একদম পালটে গেলেও গ্রামে গঞ্জে এখনো তেমন দৃশ্য বিরল নয়। এবং বিরল নয় বাসনমাজুনি কাপড়কাচুনিদের ঘরে।

অতএব বলা যায় কর্মক্ষমতা এবং মানসিক পরিণতি সমাজের ছাঁচ অনুযায়ীই বিকাশ পায়। সবটাই বয়েসের নিয়মে নয়।

ওইসব 'জননীর প্রতিনিধি অতি ছোট দিদি'-কুল পতিগৃহে যাত্রাকালে ছোট ভাই বোনটাকে কোল থেকে নামিয়ে চেলির আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে পরের বাড়ি গিয়ে উঠে সেবাড়ির ছোট ছোট গুলোকেই 'আপনজন' ভেবে আঁকড়াতো। এবং আসল সংসারের হাঁড়ি কড়া হাতাবেড়ির ফাঁস গলায় আটকে ধরলেও, ফাঁকে ফোকরে অবকাশ পেলেই, খেলাঘরের হাঁড়ি কড়া হাতা খুন্তি নিয়ে খেলতে বসতো ওই বালখিল্যবাহিনীদের সঙ্গে। আসল প্রাণের স্ফূর্তি তো এই 'সংসার'টিকে

ঘিরেই। তাছাড়া ওরাও যে হাপিত্যেশ করে বসে থাকে, কখন সময় হবে কাকীর, কখন সময় হবে বৌদির, এই আশায়!

এ হেন পটভূমিকায় তেরো ভরে আসা মেয়ে একটা সাংঘাতিক ব্যাপার। কাজেই সুপাত্রের সন্ধান। মেলা মাত্রই দেনাপাওনার ব্যাপার মিটিয়ে ফেলা, পাকা দেখা! এবং বিয়েতে যে লক্ষ কথা'র অবধারিত অনিবার্য, তার উনলক্ষ্যই মিটে গেল চটপট। ওই 'উন'টা পূর্ণ হবে বিবাহ রাত্রে বরযাত্রীদের আপ্যায়ন সভায়। ওইটি সুশৃঙ্খলে উৎরোতে পারলেই হাঁফ ফেলা।

কিন্তু বিধাতার প্রতিকূলতায় সেই শুভলগ্নটির আসা একটু পিছিয়ে যাওয়ায় মণিমেলা আর দুটো মাস অব্যাহতি পেলো।

মণিমালাকে নির্দেশ দেওয়া হলো এই দু'মাস যতটা সম্ভব রান্না শিখে নাও। কিন্তু মণিমালা অক্লেশে বলল, এই দুটো মাস আমি যত ইচ্ছে বই পড়ে নেব, যত ইচ্ছে আরাম করে নেব। যত ইচ্ছে কুলপি বরফ, আলুকাবলি চানাচুর খেয়ে নেব। কেউ কিছু বলতে পাবে না।

বাড়িতে সরস্বতী ব্যতীত অন্য কোনো মহিলা থাকলে, তা আত্মীয়ই হোন আর অনাত্মীয়ই হোন নির্ঘাত এ মেয়েকে পাঁশপেড়ে কাটাবার হুকুম দিতেন কিন্তু সরস্বতী তো সৃষ্টিছাড়া, তাই মুখটা অন্য দিকে ফিরিয়ে বললেন, আচ্ছা আচ্ছা। তাই করিস।

কিন্তু এই দু'মাসের মাঝখানে একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটলো। অভাবিতও।

সরস্বতীদের একটি বাড়ি কেনা হলো।

সুন্দর। নতুন। সদ্যসমাপ্ত। অথবা সমাপ্তির পথে।

সামনে মেয়ের বিয়ে আর বাড়ি কেন!

ভাবাই যায় না। তবু পাকেচক্রে এমন একটা অভাবিত ঘটনা ঘটেও গেল।

দীপুদের বাবার এক বন্ধু এই বাড়িটি বানিয়েই হঠাৎ খেয়াল করলেন, এই পাড়াটা তাঁর কর্মক্ষেত্র থেকে দূরে পড়ে যাচ্ছে, ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুকূল নয়, এবং তাঁর প্রয়োজনের তুলনায় যেন আয়তনটা পর্যাপ্ত নয়। কিছুদিন বাদেই তো পরপর দুই ছেলের বিয়ে দিতে হবে। তখন?

তবে আর কি, এ বাড়িটা বাতিল হোক। সুবিধের পাড়ায় আবার নতুন বাড়ি হোক। পয়সাওলা লোক, যে কথা সেই কাজ।

সেই বুদ্ধিমান ব্যক্তিই বন্ধুকে অফার দিলেন, বাড়িটা কিনে নিতে।

টাকা নেই? ধারে নাও। পরে শুধো। অত ধার শোধার সময় কোথায়?

জলের দরে দিচ্ছি। নাও।

কেন? তুমি শুধু শুধু লোকসান খাবে কেন?

আরে ব্যবসাদারের আবার লোকসান! তাদের সহজে দুধে হাত পড়ে না। জলের দর জলের ওপর দিয়েই যাবে।

তা এতে তোমার কী উপকারটা হচ্ছে?

হচ্ছে হে হচ্ছে।

কী হচ্ছে সেটাই খুলে বললেন।

বাড়িটির নক্সা খুব মনের মত করে করেছিলেন। অথচ এখন ঠিক 'সুবিধে' বোধও করছেন না। অপর কাউকে বেচলে, আর তো কখনো চোখে দেখতে পাবেন না। আর বাড়ি তো বন্ধুর বাড়ি হয়ে গেল, যখন-তখন আসতে পারবেন, ঘরের সামনের খোলা ছাতটুকুতে, রাস্তার ধারের গোল বারান্দাটিতে ইজিচেয়ার পেতে বসতে পারবেন।

আড্ডা দেবেন, চা খাবেন সিগারেট খাবেন।

এমনি একটা পরিস্থিতির ফলে দীপুদের নতুন বাড়ি। সুন্দর ঝকঝকে। আর—

আর সব চেয়ে 'অলৌকিক' ঘটনা, এ বাড়ি সেই তাদের ছেড়ে আসা পুরনো বাড়িটারই কাছাকাছি। সেই পাড়া, সেই রাস্তা, সেই পরেশনাথ মন্দিরের নিকটবর্তী।

হারিয়ে যাওয়াকে ফিরে পাওয়া।

অলৌকিক নয়?

মেয়ের বিয়ের উৎসবের আগে, আর একটা উৎসব করতে হলো দীপুদের বাবাকে। গৃহপ্রবেশের উৎসব।

কত সব যেন তার অনুষ্ঠান। পুজোপাঠ।

সকলে মিলে একসঙ্গে বাড়ি ঢুকতে হবে। ছেলের অনেক কাকুতি-মিনতি আর কাতরতায় ঠাকুমা এলেন ও-বাড়ি থেকে। তিনিই আগে ঢুকবেন। মানুষ জনেদের সঙ্গে হুড়মুড়িয়ে ঢুকিয়ে আনা হলো একটা গরু আর বাছুরকে। সেই দেখে দীপুদের ছোট ভাই তো হেসে কুটি কুটি।

আত্মীয়জনও এলেন কিছু কিছু। কেউ হাস্যবদনে, কেউ বা ভারী মুখে। কেউ বা—

কেউ বা নতুন করে আর একবার সরস্বতীর 'ভাগ্য'কে ঈর্ষা করল (গোপন করতে পারল না), কেউ বা দীপুর বাবার কন্যাদায়ের আগে বাড়ি কেনা এবং এই সব ঘটাঘটিকে বাহাদুরি দেখানো বলে সমালোচনায় মুখর হলো।

দীপুদের জ্যেঠী কাকাদের এর থেকে অনেক ভালো আর বড় বাড়ি বানাবার ক্ষমতা কি ছিল না? ছিল বৈকি। কিন্তু ওরা তো সেই গলির বাড়ি ছাড়বেন না।

সে বাড়ি ওদের যে খুব 'পয়মন্ত'।

বাড়িটা রবারের তৈরী নয়, তবু দেখা যাচ্ছে, রবারের ধর্মই পালন করে চলেছে। লোকসংখ্যা তো বেড়েই চলেছে, এবং বালখিল্যের দল হাতে পায়ে বেড়ে চলেছে।

তথাপি ওই বাড়িখানার খোলশের মধ্যে এঁটেও যাচ্ছে।

সারাদিনের গোলমালের পর বাইরের সবাই চলে গেল, দীপুরা তিন বোন,

সেই সুন্দর গোল বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

পড়ন্ত বিকেলের সোনাঢালা আলোর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দীপু আহ্লাদে ভাসা গলায় বলল, বিশ্বাস করতে পারছ মণিদি ?

মণি বলল, কী বিশ্বাস করব ?

এই যে—আমাদের এই পাড়ায় আমাদের নিজেদের একটা এতো সুন্দর বাড়ি হলো ?

মণি আলোর দিক থেকে মুখ ফেরাল।

মণি উদাস অবহেলার গলায় বলল, 'আমাদের' বলিস না। বল, 'তোদের'। আমি কে ? আমাকে তো কদিন পরেই এ বাড়ি থেকে বিদেয় করে দেওয়া হবে। তখন বলতে পারবো এটা আমাদের বাড়ি ?'

ম্লান হয়ে গেল আকাশের সোনালী আলো। পৃথিবীর ওপর নেমে এল সন্ধ্যার ছায়া।

ধন্যি ধন্যি পড়ে গেছে ভামির সুখ্যাতিতে। পনেরো ষোলো বছরের ভামি, জেদাজিদি করে শুধু যে 'ঠাকুমা'র কঠোর শুচিতায় মণ্ডিত হেঁসেলের সদস্য-পদটি আদায় করেছে তাই নয়, জবরদস্তি করে তার জন্যে নির্দিষ্ট সরু কালাপাড় ধুতির বদলে স্রেফ থানধুতি আদায় করে ছেড়েছে।...ছেড়েছে রাত্রে 'আচমনী' খাওয়া, বাজার দোকানের খাবার খাওয়া, পান মশলা খাওয়া। কী ভালই বাসতো পান খেতে ভামি। সেই ছোট্ট বেলা থেকে। নেমন্তন্ন বাড়ি যাবার প্রধান আকর্ষণ ছিল তার যত ইচ্ছে পান হাতানো। এখন ভামি খেয়ে উঠে একটু করে হর্তুকির টুকরো খাচ্ছে।

ভামি এখন জামা সেমিজ পরাও বর্জন করেছে। আহা, বিয়ের সময় কতো জ্যাকেট সেমিজ হয়েছিল, কটাই বা পুরনো হয়েছে ? লাল বেনারসীর সঙ্গে মিলিয়ে লাল মখমলের যে জরির কাজ করা জ্যাকেটটা তৈরী করানো হয়েছিল বিয়ের আগে, লজ্জার মাথা খেয়ে ভামি সেটাকে বুকে চেপে ধরে একপাক নেচে নিয়েছিল, সেটাকে একদিন মার দেরাজের মধ্যে দেখে তাকিয়েও দেখল না। ঠেলে সরিয়ে পাশ থেকে বাবার গায়ে দেওয়া একখানা সিল্কের চাদর খুঁজে বার করে নিল গায়ে জড়িয়ে ঠাকুমার সঙ্গে গঙ্গা নাইতে যেতে।

হ্যাঁ, থান ধরবার পর থেকেই ভামি চটপট ঠাকুমার নিত্য গঙ্গাস্নানের সঙ্গিনী হয়েছে। যাবার সময় শুধু ঘটি গামছা বয়, ফেরার সময় ফলের সম্ভার। ফল কেনা তো এখন বেড়েছে ঠাকুমার। ভামি যে রাত্তিরে 'আচমনী' গেলে না। খাবার মধ্যে তো ওই ফল মিষ্টি আর ছানা। তাও যে-সে দোকানের নয়, ঠাকুমার স্পেশাল দোকান।

এতেও যদি সবাই ধন্যি ধন্যি না করে ভামিকে, তো কিসে করবে ? ধন্যি ধন্যির কাজ তো ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

ভাগ্যক্রমে তো ভামির বৈধব্যের কাছাকাছিই চটপট অম্বুবাচী পড়ল। ভামি

দৈনিক একটা ফল খেয়ে দিন তিন চার দিব্যি কাটিয়ে দিল। তার একাদশীর দিন? মায়ের চুপিচুপি কাতর প্রার্থনাতেও একফোঁটা কাঁচা দুধ গঙ্গাজলও গলায় ঢালতে জোর অস্বীকার।

মা বলেছিল, ডাব আনাআনি করলেই লোক জানাজানি। এটুকু কেউ টের পাবে না।

মেয়ে মাকে ধিক্কার দিয়েছে, বাঃ! মা! চমৎকার! বলি ভগবান টের পাবেন না?

পেলেও কিছু বলবেন না রে ভামি। তার তো মায়ামমতা আছে।

ভামি মার মুখের ওপর ঝংকার দিয়ে বলেছিল, হ্যাঁ, মায়ামমতা'র খুব নমুনা দেখিয়েছেন। যাও যাও, নিয়ে যাও ওসব, ঠাকুমা কী করেন? নির্জলা করেননা?

মা মরমে মরে গিয়েও কাতর বচনে বলেছিল, ও'র পাকা হাড়, তোর বালাধাত।

হাড় পেকে যাবে! তুমি যাও তো!

তা হাড় যে বেশ তাড়াতাড়িই পাকলো তা কদিন পরেই দেখা গেল। হঠাৎ একদিন দেখা গেল ভামি কোথা থেকে কার একটা মরচেপড়া বড় কাঁচি যোগাড় করে তার সেই রক্ষেকালীর মত চুলের ঢাল পুঁছিয়ে কেটে সাফ করেছে।

বাড়িসুদ্ধ সকলে থ।

ভামির বাবা হাউ হাউ করে কেঁদে উঠে বলল, তুই এ কি করলি ভামি? আমাদের একবার জিগ্যেসও করলি না!

ভামি বলল, জিগ্যেস করলে তোমরা মত দিতে যে!

কিন্তু কেন? এখুনি কেন ভামি?

ভালই তো বাবা! বেশ নির্ঝঞ্ঝাট, গঙ্গা নাইতে গিয়ে আমার চুল মোছার দেরীতে ঠাকুমাকে এক ঘণ্টা ঘাটে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় না।

এর পরও যদি লোকে না বলে ভামি এ যুগে হিন্দু নারীর আদর্শস্থল, তাহলে তেমন লোকের মুখে আগুন। তা তেমন কেউই নেই এ দিগরে। বাদে ভামির মেজ খুড়ি সরস্বতী।

কিন্তু ওই মেজ খুড়িটির মত সৃষ্টিছাড়া আর কে আছে? যে ভামির ওই ধন্যিধান্যি শুনে অভিভূত না হয়ে বলে উঠবে, আরো ধন্যিধান্যি পেতো ওই মেয়ে যদি রাজা রামমোহন সতীদাহ প্রথা রদ না করে যেতেন। ধুঁতরোর শরবৎ খেয়ে, গলায় ফুলের মালা দুলিয়ে ড্যাডাং ড্যাডাং বাদ্যির মধ্যে হাসতে হাসতে সতী হতো ভামি।

কিন্তু সৃষ্টিছাড়াদের কথায় কে কান দেয়?

মানেই বা বুঝছে কে? পাগল-ছাগলের কথা তো বোঝাই দায়।

দীপুদের পিসিরা বাপের বাড়ি এলেই এ বাড়িটা একবার বেড়িয়ে যান।

দীপুর মা খবর পেলে নেমন্তন্ন করেও পাঠান।

কিন্তু ভামির এ দুরবস্থার পর নেমন্তন্নয় ভাঁটা পড়েছে। আর বলে পাঠান

না সরস্বতী। তবে তাঁরা নিরভিমানী, এমনিও আসেন।

আর এলেই ভামির ওই কঠোর কঠিন কৃচ্ছ্রসাধনের কাহিনী ফেঁদে বসেন। এখন তাঁদের মুখে একটাই প্রসঙ্গ, 'ভামি'।

হ্যাঁ! দেখালো বটে ভামি!

হ্যাঁ! ঠাকুমার নাতনী বটে ভামি! তো বলব তার থেকেও বেশী। ঠাকুমা তো আটটি মেয়ে আর পাঁচটি ছেলেকে পৃথিবীতে নামিয়ে আনার পর বিধবা হয়ে কৃচ্ছ্রসাধনের পথ ধরেছিলেন। কিন্তু ভামি? যৌবনে যোগিনী।

নতুন পিসি, সেজ পিসি, ফুল পিসি, কেউ না কেউ তো আসছেনই। সকলের প্রকৃতি একও নয়। কিন্তু এই এক জায়গায় সবাই এক।

জানো মেজ বৌ? ভামি নাকি কাঠকবুল, এই শ্রাবণ থেকেও 'চাতুর্মাস্য' করবে ঠাকুমার সঙ্গে।

শুনেছ মেজ বৌ, ভামি বলে রেখেছে, কাল-অশৌচের বছরটা পার হলেই ও গুরুমন্তর নেবে।

মেয়ে বটে!

ওই তো হাবাগোবা ভালমানুষ মেয়েটা ছিল, কী করে যে এমন হয়ে উঠল! সবই ভগবানের দয়া!

মেজ বৌ এ সময় ওদের কথায় সায় দিতেন। বলতেন, তা তো বটেই!

মণিমালার বিয়ের দিন এসে গেল।

দীপুর বাবার এ বাড়িতে এই প্রথম কাজ।

ঘটা তো কিছু করবেনই।

নিজের বড় মেয়ে মারা গেছে, দাদার মেয়েটা এই সেদিন বিধবা হয়েছে, প্রাণ খুলে আহ্লাদ নেই।

তবু ঘাটতিও কিছু নেই।

জনে জনে সবাইকেই ভাল করে বলছেন, বিয়েতে আসতে।

তবু এটাই সবাই ধরে নিয়েছিল ভামি আসবে না। হয়তো মা মেয়ে বাড়িতে থেকে যাবেন। কিন্তু সরস্বতী বড় জাকে বলে এসেছেন তুমি না গেলে নিয়ম-লক্ষণের কাজ করবার কে আছে? আমাকে তো জানোই। ও সব ভাল বুঝিও না, মনেও থাকে না। তুমি না দেখলে সবই ভুলভাল হবে।

এরপর আর বড় জা না এসে থাকবেন কী করে? একটা মেয়ে তো না জানি কোন খুঁৎ ঘটায়, কে কোথায় কী তুকতাক করায় বছর না ঘুরতেই কপাল পুড়িয়ে বসলো। আবার একট মেয়ের ব্যাপারে সাবধান না হলে?

যারা 'মন্দ' করতে চায়, তারা গায়ে-হলুদের মাদুরেরর একটু কাঠি ভেঙে নিয়ে কিংবা ছাউনি নাড়া ফুলটি হাতিয়ে, নিদেনপক্ষে জল সওয়া হাঁড়ির জল থেকে এক খাবলা পাচার করেও তুকতাক করতে পারে। অতএব কড়া পাহারা আবশ্যক।

আসতেই হলো বড় জ্যেঠিকে।

আর সবাইকে অবাক করে দিয়ে ভামিও এল মার সঙ্গে।

কেউ ভাবেনি।

কেউ আশা করেনি।

মণিমালার ইচ্ছে হচ্ছিল ভামিকে জড়িয়ে ধরে বলে, ভামিদি তুমি এসেছে?

কিন্তু সাহস করে জড়িয়ে ধরতে পারল না। কি জানি যদি গায়ে-হলুদ দিতে যাবার কালে বিধবাকে ছুঁলে দোষ হয়।

তাই শুধু জলভরা চোখে বলল, ভামিদি তুমি এসেছ?

ভামিও মণিকে ছুঁয়ে ফেলল না।

শুধু বলল, আ গেল! এখন কাঁদছিস কেন? কাঁদবি তো বর-কনে বিদেয়ের সময়।

তারপর বলল, তোর বিয়ে! আসব না?

তা এসে যে আড়ষ্ট হয়ে ঘুরে বেড়াল ভামি তাও নয়। সে তার রোগাপাতলা শরীরটাকে একখানা ফর্সা থানে মুড়ে আর তার ওপর সিল্কের চাদর জড়িয়ে দিব্যি সর্বত্র ঘুরল, সকলের সঙ্গে কথা বলল, ন্যাড়া হাত দুখানা নেড়ে নেড়ে পান সাজল (এতে তো আর অপয়ার দোষ লাগে না) এবং খাবার সময় বিধবাদের দিকে একগাদা বুড়ির সঙ্গে বসে কলাপাতায় করে ফল মিষ্টি আর মাটির খুরিতে দই ক্ষীর খেল চেটেপুটে। আর সকলকে তাজ্জব করে দিয়ে বাসরেও এসে বসলো দরজার চৌকাঠের বাইরে। সেই সাজসজ্জায়।

এককথায় ভামি দেড়দিন বিয়ে বাড়িতে থেকে যেন সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়ে চলে গেল।

কে জানতো ভামির মধ্যে নিজেকে বিকশিত করবার এমন একখানা প্রবল বাসনা লুকনো ছিল। কিন্তু 'ছিল' কেন? রইলই। ভামির এই বাসনা ঠিকই চরিতার্থ হয়ে চলবে জীবনভোর।

'মহয়সী' হবার একটা নেশা আছে বৈকি। আর মহীয়সী হয়েও 'মোহিনী' মনোহারিণী হওয়া যায়! রূপটি তো আছে।

ভামি যদি বাপের বাড়িই থেকে যায়, তো এখানের সংসার মাথায় করে রাখবে, পাঁচটা মানুষের খাটুনি একা খাটবে।

আর ভামিকে যদি ওর শ্বশুরবাড়ি থেকে কখনো 'লোকাভাব' বা অসুবিধের কালে তার অপয়াত্ব ভুলে গিয়ে নিয়ে যায়, তো ছাড়তে চাইবে না।

কে জানতো ভামির মধ্যে জীবনকে টিকিয়ে রাখতে এমন একটি জীবনদর্শন জন্ম নেবে!

মণিমালার বিয়েতে যার আসার কথা নয়, সে এসে মাতিয়ে দিয়ে চলে গেল, আর যার আসাটা নিশ্চিত ছিল তার আসা হল না।

সে হচ্ছে সয়ম্বতীর নদাদার মেয়ে সুধা। মণি-দীপুদের মামাতো বোন। তার শ্বশুরবাড়িটা তো কলকাতার মধ্যেই, সেখানে গিয়ে ভাল করে নেমন্তন্ন করে আসা হয়েছিল। 'মেয়ে নেমন্তন্ন'য় শুধু বেটাছেলে বললে হয় না বলে ফুলিকে

সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন দীপুদের বাবা।

বেয়াই খুব অমায়িক ভাবে বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, যাবেন বৈকি বৌমা।

আপনাদের তো অসুবিধে নেই! ঘরের গাড়ি রয়েছে, বাবাজী যেন সঙ্গে করে নিয়ে যান। আর বাড়িতে যে যে মেয়ে বৌ আছেন, অবশ্য করে যান।

তা যে যে পারবে যাবে। শুনে হৃষ্ট হয়েছিলেন সরস্বতী।

সুন্দর ভাইঝিটাকে দেখবে সবাই। মাথা থেকে পা পর্যন্ত সোনায় মুড়ে দিয়েছেন তার ন'দা। তাছাড়া বড়লোকের বৌ হওয়ায় জড়োয়া গহনাও দিয়েছে তারা বিস্তর।

মহারাণীর মত আসবে সুধা।

কিন্তু সরস্বতীর সেই মুখোজ্জ্বল হল না।

বিয়ের দিন সকালে বড়লোকের বাড়ি থেকে একটি সোনার তাগা হাতে গিন্নীবান্নী ঝি খুঞ্চেপোশ ঢাকা দিয়ে বড় একখানা ক্ষীরমোহন, আর ভাল একখানা জামদানী শাড়ি নিয়ে এসে দিয়ে গেল। এবং দীপুদের ব্যগ্র প্রশ্নে ঠোঁট উল্টে বলল, নাঃ, নতুন বৌদিদি আসবেনি।

সরস্বতী তাকে কাছে বসিয়ে খাইয়ে আর আস্ত একটা টাকা 'বিদেয়' দিয়ে শঙ্কিত প্রশ্ন করলেন, কেন? আসবে না কেন?

দাসী গলা নামিয়ে বলল, এখেনে বলে নয় মা, কোথাও যেতে পায় না ছোট বৌদিদি! ছোটদাবাবুর যে ভয়ানক 'সন্দ' বাতিক! বৌকে কাউর নজরে পড়তে দেবে না।

বড়লোকের বাড়ির দাসী, দু'দুটো মানুষকে কাঠ করে রেখে চলে গেল কোমর দুলিয়ে।

দীপুরা শুনেছিল ওরা সুধাদিকে বাপের বাড়ি পাঠাতে চায় না। বলে তিন দিনের রাস্তা, মরুভূমির দেশ, বৌয়ের রং ময়লা হয়ে যাবে।

কথাটা হাস্যকর ছিল। ওইখানেই তো মানুষ হয়েছে। সবাই ভেবেছে, এটা বড়লোকী চাল। কিন্তু এ কী সংবাদ?

এটা কে ভেবেছিল?

মণি ঘরে এসে ডুকরে উঠে বলল, দীপু! আমার যদি ওই রকম হয়?

মণিলাল শ্বশুরবাড়ি চলে গিয়ে দীপুকে যেন একটা গভীর শূন্যতার গহ্বরে ফেলে দিয়েছে। দীপুর পায়ের তলায় মাটি নেই, দীপুর হাতের কাছে আঁকড়ে ধরবার কিছু নেই। দীপুর বুকের মধ্যে সর্বদাই একটা খাঁখাঁ করা ভাব।

এর নামই কি 'বিরহ'? শব্দটা কি তবে কেবলমাত্র নরনারীর সম্পর্কের ব্যাকুলতার মধ্যেই সীমায়িত নয়?

এইভাবে কি আর ভাবতে পারে দীপু? তা নয়, তবু দীপু যেন এক একটা ঘটনার ধাক্কায় হঠাৎ হঠাৎ বেশ খানিকটা বড় হয়ে যায়।

কিন্তু এই কষ্টটা কি মণিদিরও হচ্ছে?

দিদিকে চিঠি লিখে জিজ্ঞেস করবে কি দীপু?

কিন্তু কী লিখবে ? মণিদি, তুমি চলে যাওয়ায় আমার যে রকম কষ্ট হচ্ছে, তোমারও কি এখান থেকে চলে গিয়ে সেরকম কষ্ট হচ্ছে ?

নাঃ, এ তো ভীষণ বোকার মত হবে। দীপুর যে 'কী রকম' কষ্ট হচ্ছে, সেটা কী করে জানতে পারবে মণিমালা ?

অষ্টমঙ্গলার সময় যখন মণি জোড়ে এসেছিল তখন তো 'মন কেমনে'র কথা তেমন বলেনি, কেবলই মায়ের কাছে চুপিচুপি বলেছে, তার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা কেমন।

না না, কারো নিন্দে করছে না মণি, সব্বাই খুব ভালো, তবে কিনা শাশুড়ী খুব রাগী তাই একটু ভয় ভয় করে। শ্বশুরের সঙ্গে যে কথা কইতে নেই তা জানতো না মণি, তাই কথা কয়ে ফেলেছিল। সেই দেখে শাশুড়ী এমন বকা বকেছিলেন যে মণি সেদিন খেতে পারেনি, কেবলই হেঁচকি তুলেছে।

আর তাতেও শাশুড়ী পিসশাশুড়ী পাড়ার আরো সব গিন্নীরা একসঙ্গে বসে 'ছি ছি' করেছেন মণিকে। এমন একগুঁয়ে বৌ যে, একটু বকা হয়েছে বলে তেজ করে ভাত খেল না। এ বৌ তো ভাল না। বকা কি শুধু শুধু হয়েছে ? দোষ করেছে বলেই না হয়েছে।

কিন্তু মণি ভেবে পায়নি দোষটা কোথায় হলো ? শ্বশুরমশাই কোথায় যেন বেরোতে যাবারকালে এদিক ওদিক কী যেন খুঁজে বেড়াতে বেড়াতে বলে উঠেছিলেন, বাড়িতে বিয়ে লেগে সব লণ্ডভণ্ড। ছাতাটা যে কোথায় গেল !

তখন মণি ঘোমটার মধ্যে থেকেই বলে ফেলেছিল, 'এই যে এখানে একটা ছাতা—'

ছাতাটা ঝোলানো ছিল দালানের একধারে বিছানার 'চালি'র একটা 'বাতায়'। পেড়ে নিয়ে এগিয়ে দিল। অবশ্য ঘোমটাঢাকা মুখেই।

শ্বশুর তো দেখতে পেয়ে হৃষ্টচিত্তে ছাতাটি নিয়ে বেরিয়ে এলেন, কিন্তু মস্ত একটি অনিষ্ট করে গেলেন 'নতুন বৌমা'র প্রশংসা করতে গিয়ে।

উঠোনে কুয়োতলায় বসে চুপড়ি করে শাক ধুচ্ছিলেন শাশুড়ী, কর্তা বেরোবার সময়ে বলে গেলেন, নতুন বৌমার বেশ হুঁশ পর্ব আছে। আমি আপন মনে ছাতাটা খুঁজে মরছিলাম, নিজে থেকে বুঝে নিয়ে খুঁজে দিলো।

শুনে শাশুড়ী ঠিকরে উঠে বললেন, খুঁজে দিল ! কোথায় ছিল ছাতা ?

আরে দেখো না, লেপের চালির বাতায় কে কখন ঝুলিয়ে রেখেছে, ঠিক লক্ষ্যটি পড়েছে। আমি তো সবদিক দেখেছি, পাইনি। বৌমা টুক করে বলে উঠলো, এই যে ছাতা ! নাঃ, বৌ তোমার বেশ ভাল হয়েছে।

তারপর ? ওই পরের ইতিহাসটি তো আগেই বলা হয়েছে।

অষ্টমঙ্গলার সময় এসে মণিদি এই সব গল্পই করেছে।

সরস্বতী বলেছিলেন, থাক মা, এসব কথা রাখ। এখানের কথা ওখানে আর ওখানের কথা এখানে বেশী বলাবলি করতে নেই। কে কখন কী শুনে ফেলবে, তাই থেকে অশান্তির সৃষ্টি ! বলবে, 'বাপের ঘরে গিয়ে শ্বশুর-ঘরের নিন্দে করছে।'

বাঃ, আমি বুঝি নিন্দে করেছি ? শুধু তো জিগ্যেস করছি, এতে কী দোষ হলো ?

ওকেই নিন্দে বলবে।

তারপর হঠাৎ একটু হেসে বলেছিলেন, আমার মত 'পৈতে পুড়িয়ে ভগবান' হতে তো পারবি না বাবা। আর না পারাই ভাল। পাঁচজনের মত হওয়াই ভাল। লড়াইয়ের ক্ষমতা সকলের থাকে না।

মায়ের কথা মণি সব সময় বুঝতে পারে না। এখনো তেমন পারল না, তাই অন্য লাইনটা ধরল। বলল, বেশ, না হয় ওখানের কথা এখানে বলা দোষের কিন্তু এখানের কথা ওখানে বলতে কী ? তাতে কি কেউ বলবে, এ বাড়ি এসে বাপের বাড়ির নিন্দে করছে ?

চোখে জল নিয়েও হেসে উঠল মণি।

মাও হাসলেন। বললেন, তা বলবে না। বলবে, 'বাপের বাড়ির অহংকার করছে'। তার থেকে বলি চুপচাপ থাকাই ভাল ! দেখে শুনে এই বুঝেছি।

তা সেই অষ্টমঙ্গলার পর কটা দিন মাত্র চলে গেছে মণি, আর আসেনি এতো-দিনের মধ্যে। শ্যামনগরে শ্বশুরবাড়ি, বর দেওর শ্বশুর সবাই ডেলি প্যাসেঞ্জারি করে, বৌ চলে এলে শাশুড়ীর কষ্ট। ডাগর বৌ, আর বাপের বাড়ি যাবেই বা কেন ? ঢের দিন তো থেকে এসেছো বাছা !

দীপু একদিন তার বড় মাসির সামনে বলে উঠেছিল, 'বাপের বাড়ি' আর 'শ্বশুর-বাড়ি' ! মেয়েমানুষের 'নিজে'র কোনো বাড়ি থাকে না কেন ?

মাসি চমকে উঠে বলেছিলেন, ওমা, এ আবার কী কথার ছিরি ? অ সরস্বতী, তোর এই মেয়েটার তো কথাবার্তা ভাল নয়। আলাদা করে 'নিজের বাড়ি'র আবার মানে কী ? শ্বশুরবাড়িই তো মেয়েদের নিজের বাড়ি।

দীপু মাসির ধিক্কারকে তোয়াক্কা না করে বলেছিল, আহা ! কী আমার নিজের বাড়ি রে ? সব সময় ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকা। আর যত ইচ্ছে বকুনি খাওয়া, আর যত পারো খাটা। বেটাছেলেদের এ রকম ?

তা মেয়েমানুষ কি বেটাছেলে ?

নাই বা হলো ! মানুষ তো দুজনেই।

মাসি বলেছিলেন, জন্মকাল থেকে গুচ্ছির বই গিলতে দিয়ে সরস্বতী মেয়েদের মাথা খেয়ে বসে আছে। বলি, পায়ে মাথা কি এক হবে রে দীপু। না বটবৃক্ষে আর ঘেঁটু গাছে সমান হবে ? জানি না তোমার মণিমালার মতি-বুদ্ধিটি কেমন।

দীপু অনুভব করে শুধু ঠাকুমার বাড়ির থেকেই যে তার মায়ের সমালোচনা হয়। তা নয়। মামার বাড়ি থেকেও ওঠে। মায়ের খোদ বাপের বাড়ি থেকেই।

দীপু অবাক হয়।

দীপুর মধ্যে অনেক প্রশ্ন দেখা দেয়। দীপু ভেবে পায় না, বড় মাসি কী করে বললেন 'পায়ে মাথায় কী এক হয় ?' মেয়েরা 'পা' আর ছেলেরা 'মাথা' ?

ভগবান একথা তাদের গায়ে লিখে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ?

এই, এই জন্যেই সুধাদির অমন দুর্দশা ! এতো এতো গয়না, এতো এতো ভাল ভাল শাড়ি, কোথাও নেমন্তন্ন যেতে পায় না । তার বরের 'সন্দ' বাতিক ।

দীপু বুঝতে পারেনি 'সন্দ' কথাটার অর্থ কী ! মণিদি পরে বলে বুঝিয়ে দিয়েছিল ।

কী আশ্চর্য, সুধাদির শাশুড়ী নিজের ছেলেকে বকে দিতে পারেন না ? বলতে পারেন না, এ আবার কী আবদার রে তোর ? বৌ কোথাও যেতে পাবে না ? আমোদ-আহ্লাদ করবে না ? কারুর বিয়ে দেখবে না ? ও মানুষ নয় ? ওর দুঃখু হবে না ?

তা বলেন না নিশ্চয় । বলবার সাহসই নেই হয়তো । 'মা' হয়েও নিজেকে 'পা' ই ভাবেন ।

দীপুর মন বড় প্রশ্ন-মুখর ।

এটা দীপুর একটা জ্বালা । মণি থাকতে দীপু এসব প্রশ্ন মণিদির কাছে নিবেদন করতো । মণিদিও সেই জ্বালার সমব্যথীই ছিল । বলতো—সত্যি রে, আমারও এ সব ভাবতে বসলেই মাথা খারাপ হয়ে যায় । কিন্তু কী করব বল ? মেয়ে হয়ে জন্মে মরেছি ।

এতে অবশ্য সমাধান নেই, তবে আলোচনায় আর ক্ষোভপ্রকাশে মনটা কিছু হালকা হয় । এখন মন শুধুই ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে ।

সেজপিসির মেয়ে পুঁটিদি একদিন বেড়াতে এসে বলে গেল, তা এটারও তো বিয়ের বয়েস হয়ে গেছে মেজমামী ! এর জন্যে পাত্তর দেখছ না ? পিঠোপিঠি দিদিটার বিয়ে হয়ে গেল, মন গুমরে থাকে ।

আর একদিন গোবিন্দদা বলে বসল, ও মেজমামী, তোমার এই মেয়েটা এতো হাসিখুশী ছিল, এত কথার ঝুড়ি ছিল, হঠাৎ এমন চুপচাপ হয়ে গেল কেন গো ? দিদির হিংসেয় নাকি ? তা দাও না বাবা, ওরও একখানা বিয়ে লাগিয়ে । আমরা দুটো ভালমন্দ খাইটাই ।

এতো রাগ হয় দীপুর ! কার কাছে ঝাল ঝাড়বে সে ?

মণিদিকে চিঠি লিখেই জানাতে হবে এসব ।

অতএব দীপু হৃদয় উজাড় করে দিন দুই ধরে একখানা চিঠি লিখল মণিকে, তারপর মায়ের কাছে গেল একখানা ডাকের খাম চাইতে ।

মা খামটা এগিয়ে দিয়ে বললেন, ওমা, কত পাতা রে ? এতে আরও টিকিট না মারলে যে 'বেয়ারিং' হয়ে যাবে । এতো কী লিখেছিস ?

দীপু অবশ্য চুপ করেই থাকল ।

মাও একটু চুপ করে থেকে বললেন, অন্যের চিঠি পড়া উচিত নয় । পড়বো না, তবে চিঠিটা কুটুম বাড়ি যাবে, তারা হয়তো টানাটানি করে পড়তে বসবে, 'বৌয়ের বোন এতো কী লিখেছে' বলে । তো বল বাবা, কী এতো লিখেছিস ?

দীপু বলে উঠল, অন্য লোকেরা মণিদির চিঠি নিয়ে পড়বে ?

তাইতো করে রে। বরের চিঠি নিয়েই কেড়ে পড়ে নেয়। 'বৌ'কে তো আর একটা মানুষ ভাবে না!

দীপুর ভেতর থেকে হঠাৎ একটা কান্নার ঢেউ উঠে আসে। খুব কষ্টে বলে, কারা করে ওসব? শ্বশুর-টসুর?

দূর পাগলা। বাড়িতে যে সব মেয়েরা থাকে তারাই করে। তাই বলছি, শ্বশুরবাড়ির লোকেরা কেমন এসব জিগ্যেস করিসনি তো? বুঝেসুঝে পাঠাস।

পাঠাতে চাই না।

বলেই হঠাৎ বহু আবেগ, আশা আর বিরহ-বেদনায় মোড়া দীর্ঘ দুদিনের পরিশ্রমের ফসল সেই কাগজগুলো কুটি কুটি করে ছিঁড়ে মুচড়ে ফেলে দিয়ে চলে আসে দীপু।

মা যা ভয় করেছেন, সেই সবই তো লিখেছে দীপু। চিঠিখানা তো 'কথামালা'র মত প্রায় 'প্রশ্নমালা'।

সরস্বতী চুপ করে তাকিয়ে থাকলেন সেই ছেঁড়া কাগজের কুচিগুলোর দিকে।

দীপু ঘরে গিয়ে একপালা কেঁদে নিল। কত কষ্টের লেখা, নিজের হাতে ছিঁড়ে ফেলে এসে, বুকের মধ্যেটা মোচড় দিতে থাকে। রেখে দিলে মণি কখনো এলেও তো দেওয়া যেত তার হাতে। অনেক প্রশ্ন তো হারিয়েও গেল।

কিন্তু কবে আসবে মণি?

তা এলো কিছুদিন পরে।

কিন্তু ঠিক আগের মণিদিকে কী খুঁজে পেল দীপু? এ তো প্রায় রোগাক্রান্ত এক মেয়ে। সর্বদাই তার মাথা ঘোরে, বুক জ্বালা করে, কিছু খেতে পারে না।

এতোদিন ধরে দীপু যে সব 'পত্রিকা'গুলো জমিয়ে এক জায়গায় রেখে দিয়েছিল, মণিদি এলে পড়বে বলে, সেগুলোর দিকে তেমন গ্রাহ্যই দেখা গেল না মণির। একটু নেড়েচেড়ে 'পরে পড়বো' বলে রেখে দিল।

আর, আমার আর কিছু ভাল লাগে না রে।—বলে চোখ বুড়ে শুয়ে পড়ল।

শুয়ে থাকাই এক রোগ হয়েছে মণির। সেইজন্যেই না, এখানে আসার ছাড়পত্র। যে বৌকে দিয়ে কোনো কাজ পাওয়া যাবে না, বরং তাকেই দেখাশুনো করতে হবে, সারাদিন না খেয়ে পড়ে থাকলে, একবারও অন্ততঃ জিজ্ঞেস করতেই হবে, 'কী খাবে গো?' তাকে বাড়িতে রেখে দরকার? অতএব চলে যাক বাবা বাপ-মায়ের কাছে। যত ইচ্ছে শুয়ে থাকুক, যা ইচ্ছে খাক, অথবা না খাক।

এইসব ভেবেচিন্তেই সমাজে আইন করে রাখা হয়েছে, শরীর ফরির গড়বড় করলেই বাপের বাড়ি থেকে আমন্ত্রণ পাঠাতে হবে মেয়েকে আনার জন্যে। যদি কোনো বেআক্কেলে মা-বাপ এই আমন্ত্রণে তৎপর না হয়? তাদের জন্যে নিন্দে-মন্দ, সমালোচনা, ছিছিক্কার!

দীপুর অভিজ্ঞতার জগতে এও এক নতুন সংযোজন!

মণিদির শরীর খারাপের কারণ বুঝতে খুব বেশী দেরী হল না দীপুর। এটুকুও দেরী হত না, যদি না দীপু একটু উদোমাদা হতো। তবু বুঝল। আর কেন জানি না দীপুর মনটা বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

মণির বিয়ে হয়ে যাওয়ার পরও বোধহয় এতটা বিষাদ-বিষণ্ণ হয়ে যায়নি দীপু। তখনো যেন ভরসা ছিল মণিদি 'তাদেরই একজন' আছে। জোর করে বিয়ে দিয়ে পরের বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বেচারাকে. কী করবে?

কিন্তু এখন আর তা মনে হচ্ছে না।

এখন যেন মনে হচ্ছে মণিদি নিজেই তার চিরকালীন জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। আর কোনোদিনই মণিমালা দীপু ফুলির সঙ্গে সমগোত্রে থাকবেনা।

বিষণ্ণতার আরো একটা কারণ, বড়দির ইতিহাস। অতি শৈশবে দেখা সেই স্মৃতি। বড়দির একটি ছোট্ট ফুটফুটে বাচ্চা হওয়ার সেই ছবি।

তারপর কী না কি হয়ে গেল।

কে জানে মণিমালাব জীবনে ওই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে কিনা।··· বড়দির মেয়ের সেই মাসিদের একান্ত ভালবাসার এগিয়ে যাওয়া হৃদয়কে অনায়াসে উপেক্ষা করে চলে যাওয়া, দীপুকে যেন একটা আছাড় মেরে অনেকটা বড় করে দিয়েছিল।

হয়তো মণিদির ব্যাপারেও তাই হবে। হয়তো মণিদিও হঠাৎ কোনদিন শ্বশুরবাড়িতে থাকতে থাকতে মরে যাবে। দীপুরা আর তাকে—

এই অমঙ্গল চিন্তায় শিউরে উঠে দীপু গিন্নীদের মত মনে মনে 'দুর্গা দুর্গা' করল। কিন্তু চোখের জলকে বাগ মানাতে পারল না।

আর সেইদিন অনেকখানি চোখের জল খরচ করে ফেলার পর দীপু আবিষ্কার করল, কাল্পনিক দুঃখও সত্যি দুঃখের মতই কষ্টকর। দুঃখের বই পড়তে পড়তে যেমন মন প্রাণ উদ্বেল হয়ে ওঠে, যন্ত্রণাবোধ হয়, সত্যিকার মানুষদের নিয়ে কাল্পনিক দুঃখ খাড়া করলেও একই রকম হয়।

কিন্তু একটা তফাত আছে। রীতিমত তফাত।

হাসির গল্প পড়তে পড়তে যেমন ভেতর থেকে হাসি উথলে ওঠে, কোনো সত্যি মানুষ নিয়ে হাসির পরিস্থিতি ভাবতে গিয়ে ঠিক তেমটি হয় না।

কল্পনায় শোকের দুঃখের এমনকি অকাল মৃত্যু-শোকেরও বেদনা ব্যর্থতা যন্ত্রণার স্বাদ পাওয়া যায় আনন্দজনক ঘটনার কল্পনায় তেমন প্রত্যক্ষভাবে আনন্দের স্বাদ অনুভূতি পাওয়া যায় না।

এখন যদি দীপু ভাবতে বসে, সে মরে গেছে, হয়তো পুজোয় পাওয়া নতুন কাপড়-জামা আর পরা হল না। পড়া হল না হাতের কাছে আসা ভাল ভাল বইগুলো। পড়া হল না পত্রিকায় প্রকাশিত ধারাবাহিকের শেষটা, উথলে উথলে কান্না পাবে দীপুর। ভাববে ভেবেই কান্না পাচ্ছে। নিজের মৃত্যুশয্যার দৃশ্যটাও দেখতে পাচ্ছে।

কিন্তু দীপু যদি ভাবতে বসে দীপু হঠাৎ খুব বড়লোক হয়ে গেছে, যত

ইচ্ছে জিনিস কিনে কিনে সব্বাইকে উপহার দিচ্ছে, রেলগাড়ি চেপে কত কত দূর দেশে বেড়াতে যাচ্ছে, মনের মধ্যে কি কোনো সাড়া মিলবে?

মনে তো হয় না। কিন্তু কেন?

ভাবতে ভাবতে আরও একটা আবিষ্কার করে ফেলে দীপু।

ওঃ! এই জন্যেই গল্প উপন্যাসের বইগুলোয় বেশীর ভাগই কেবলই দুঃখের ছড়াছড়ি।

তার মানে ওটাই মানুষের মনকে খুব চটপট নাড়া দেয়।

দু'দুটো আবিষ্কার করে ফেলেও দীপুর মনটা বিষণ্ণই রয়ে গেল। দীপু দুঃখু দুঃখু মুখে মণিদির কাছে গিয়ে বসল।

দেখল মণি কী যেন লিখছে।

কী আর লিখবে এতো মন দিয়ে? বরের চিঠি ছাড়া?

দীপুকে আসতে দেখে লেখাটা একপাশে সরিয়ে রেখে বেজার গলায় বলল, এই এক জ্বালা হয়েছে। শ্বশুরবাড়ির সব্বাইকে জনে জনে চিঠি লিখতে হবে। না হলেই কর্তব্যের হানি। যত কর্তব্য বৌদের। কর্তব্য ছাড়া কথা নেই। উঠতে বসতে কর্তব্য। আমি বড় হয়ে কখনো আমার বৌকে এরকম—

লজ্জা পেয়ে চুপ করে গেল।

দীপু ভাবল অন্য কথা বলে মণির মনটা ভাল করে দেবে। তাই ফস করে বলে ফেলল, তোমার কী মনে হয় মণিদি? কী হবে?

মণি ভুরু কুঁচকে বলল, কীসের কী?

দীপু লজ্জা লজ্জা হাসি হেসে বলল, মেয়ে না ছেলে?

মণি ফস করে জ্বলে উঠে বলল, ও নিয়ে কিছু মাথা ঘামাই না আমি। যদি কিছু না হয়, হবার আগেই যাতা হয়ে যায়, বেশ হয়।

দীপু স্তম্ভিত হয়ে বলে, মণিদি! কী বলছ?

মণি বলে ওঠে, যা মনের কথা তাই বললাম। মেয়েমানুষের তো সবই পরের জুলুমে। তার আবার ভালমন্দ।

শুয়ে পড়ল পাশ ফিরে।

আরো মন মরা হয়ে চলে এল দীপু।

একেবারে নীচের তলায় চলে এল।

বাইরের দিকের জানলার ধারে এসে দাঁড়াল।

এ সময় বড়দা বাড়ি নেই, জানলাটা একটু খুলে দাঁড়ানো যায়। বড়দা বাড়ি থাকলে? ওরে বাবা! একটা ঘাড়ে দুটো মাথা না কি দীপুর?

আস্তে এসে জানলাটা খুলে ফেলল।

আর—

আর ঠিক সেই মুহূর্তে দীপুর জীবনের একটা নতুন জানলা খুলে গেল!

'দেবদূত' শব্দটা শুনেছে দীপু। জানা আছে।

কিন্তু সেই শব্দটা যে সত্যি কোনো মূর্তি ধরে এসে দাঁড়াতে পারে একথা কি জানতো ?

সরস্বতী আর তাঁর নদাদা। স্তব্ধ হয়ে বসে ছিলেন।

দূরবর্তী হয়েও মুখোমুখি হয়েই।

তখনকার দিনে—শ্বশুরবাড়িতে বাপের বাড়ির লোকের সঙ্গে বেশী কাছাকাছি বসার নিয়ম ছিল না। হলেও বা বাপ ভাই, কী মামা-কাকা! মা হলে তো আরোই নয়।

কাছাকাছি বসলেই তো সন্দেহ হবে, মেয়েকে তাঁরা কুমন্ত্রণা কুপরামর্শ দিচ্ছেন।

সরস্বতীর এটা শ্বশুরবাড়ি নয়, নিজেরই বাড়ি, কিন্তু অভ্যাসটা তো গেঁথে গেছে সেই বালিকাকাল থেকে। তা ছাড় পিতৃকুলের লোকেরাও এ নিয়ম জানেন এবং মানেন।

স্তব্ধতার ভঙ্গী দেখে বোঝা যাচ্ছে, ইতিপূর্বে কোনো গভীর যন্ত্রণাময় আলোচনা হয়ে গেছে। সেই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতেই এই স্তব্ধতা।

একটু পরে সরস্বতীর দাদা ছোট বোনের দিকে তাকিয়ে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, তাহলে তুই বলছিস, মেয়েটাকে নিয়ে চলে আসাই ভালো ?

সরস্বতী একটু বিপন্ন ভাবে বললেন, আমি আর কী বলব নদা, ন বৌ যা বলেন।

তোদের ন বৌয়ের কথা বাদ দে। কখনো মেয়ের জ্বালা-যন্ত্রণা শুনে কেঁদে কেঁদে শয্যে নিচ্ছে, বলছে এক্ষুনি নিয়ে এসো তাকে, আবার কখনো বলছে, এভাবে নিয়ে এসে মেয়েকে আটকে ফেললে চিরতরেই স্বামীর ঘর ঘুচবে। নির্ঘাৎ ওরা তখন ছেলের আবার বিয়ে দেবে।

সরস্বতী একটু ক্ষুব্ধ হাসি হেসে বললেন, ঘাঁটিআগলে পড়ে থাকলেই সেটা আটকানো যাবে ? ঘরে বৌ থাকতেও ছেলের আবার বিয়ে দিচ্ছে না কেউ।

সেই তো—

নদা গভীর পরিতাপের গলায় বললেন, সেইখানেই তো অভাগা মেয়েগুলোকে মেরে রেখেছে। শাশুড়ী ননদগুলো তো মেয়েছেলেই, তবু কী করে এমন নৃশংস হয় কে জানে।

সরস্বতী বললেন, চিঠিপত্রও তো দিতে দেয় না!

কই আর ? ওই কখনো-সখনো একে ওকে ধরে চুপিচুপি একখানা চিঠি দেয় তাতেই জানতে পারি—

কষ্টে গলাটা পরিষ্কার করে বললেন, আমাদের দেওয়া চিঠি ওকে দেয় না।

সরস্বতী ক্ষোভের গলায় বললে, এর পরও ন বৌ আশা করছেন ভবিষ্যতে মেয়ে স্বামীসুখে সুখী হয়ে শ্বশুরঘর করবে ?

নদা চিন্তিত গলায় বলেন, ওই তো বললাম, মতি স্থির নেই, এক এক সময় এক এক রকম কথা। আবার বলে—নিদেন একটা ছেলে মেয়ে হওয়া অবধি

কাদায় গুণ দিয়ে থাকুক। নচেৎ সারাটা জীবন কী নিয়ে কাটাবে?

সরস্বতী হঠাৎ ফস করে জ্বলে ওঠেন। বলেন, ওঃ! এততেও সাধ মেটেনি ন বৌয়ের! বিষ গাছের চারা নিয়ে এসে পুঁততে বাসনা? আমি কোথায় ভাবছিলাম যাই, ভাগ্যিস দু-একটা ছেলেপুলে হয়ে বসেনি। আর ন বৌ—

ঠোঁটটা কামড়ে বললেন, এরপর আর কী বলা যায় নদা?

আমি অবশ্য ওর কথা তত ধরছি না—

নদা যেন একটু অন্যমনস্ক ভাবে বললেন, জোর তো ওদেরই, যদি বেশী হাঙ্গামা হুজ্জৎ করে!

সরস্বতী জোর দিয়ে বলে ওঠেন, তাহলে তোমাদের আগে থেকে পুলিসে খবর দিয়ে রাখা উচিত মেয়ের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছে—নতুনদা ছোড়দা দুজনেই তো পরামর্শ দিতে পারেন। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মানুষ!

নদা হতাশ গলায় বলেন, বলেছিলাম। দুজনেই বলল, ওসব করতে গেলেই লোক জানাজানি, সমাজে নিন্দে, মেয়েমানুষ একটু সয়ে থাকুক, পরে ঠিক হয়ে যাবে। শাশুড়ী তো আর চিরকাল থাকবে না।

হ্যাঁ, এই কথাই বলছেন নদার দুই ম্যাজিস্ট্রেট ভাই। অতএব সেখানে সাহায্যের আশা নেই।

সরস্বতী রুদ্ধ স্বরে বলে ওঠেন, তবে তাই থাকুক। তারপর হঠাৎ একদিন শুনো মেয়ে বিষ খেয়েছে কি গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলেছে।

গলাটা ধরে এল।

সরস্বতীর এই হতাশার কথায় তাঁর নদা বোধ হয় শিউরে উঠলেন। সেই মেয়েটা—যাকে তিনি এখনো 'সোনার খুকু' নামে ডাকেন। আর তার মা বলে, 'লাল গোলাপ', সেই মেয়ে বিষ খেয়ে শুয়ে আছে, গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে। ভাবা যায় না।

নদা উঠে পড়লেন।

বললেন, নাঃ! ন বৌয়ের পাগলামিতে আর কান দেব না। যেন-তেন করে মেয়েটাকে আনিয়ে ফেলে নিয়ে পালাব। সেখান পর্যন্ত কি ধাওয়া করবে?

তারপর আবার একটু নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, তবে কতদিন আর? রিটায়ার করতে তো আর দুটো বছর বাকি।

সরস্বতীও দাদার সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এলেন। বললেন, শুনছি নাকি ওরা এক্ষুণি রটাচ্ছে চার-পাঁচ বছর বিয়ে হয়েছে, এখনো ছেলেপুলে হল না, মেয়ে বাঁজা। বয়েসটার কথা ভাবে না। কত বয়েস ওর! সতেরো মাত্র। আসলে অতি অমার্জিত অশিক্ষিত বাড়ি। ঐশ্বর্য দেখে ভুলেছিলে নদা!

নদা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, সবই কপাল। দূরে থাকি। যারা সম্বন্ধ দিয়েছে তার ধন্যি ধন্যি করেছিল।

তারা বাইরেটাই দেখেছে।

নদা ক্ষুব্ধ হাসি হেসে বললেন, বাইরেটা ছাড়া ভেতরটা আর কে কবে দেখতে যায় বল সরস্বতী! যাক, দেখি একবার কপাল ঠুকে।

দীপুদের ন মামার সেই কপাল ঠোকার ইতিহাসটি একটি রোমাঞ্চকর নাটক।

মেয়ের শ্বশুরবাড়ি খবর গেল তার মা মৃত্যুশয্যায়। মেয়েকে একবার শেষ দেখা দেখতে চায় মা। এক ঘণ্টার জন্যে যদি মেয়েকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ওদেরই জুড়ি গাড়িতে যাবে, এবং সেই গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকবে। আবার ফেরত আনবে।

খবর দিতে গিয়েছিলেন স্বয়ং বাপ।

নিয়েও এসেছিলেন মেয়েকে এবং ওদেরই গাড়িতে পেঁাছে দেবার অঙ্গীকারও করেছিলেন। কিন্তু মাটা যদি তক্ষুণি মরতে বসে?

বাড়ির মধ্যে থেকে কর্তার এক ভাগ্নে না ভাইপো বেরিয়ে এসে মণির মুখে গাড়ির চালককে খবরটা জানিয়ে বলল, ছুটে গিয়ে একবার যদি জামাইবাবুকে আনতে পারে।

তা সে বেচারারা আর কী করবে? ছুটেই গেল, কলকাতার এপাড়া থেকে ওপাড়া বৈ তো নয়। জামাইকে অবশ্য পেল না, পাবার কথাও নয়। এলেন জামাইয়ের বাবা।

এসে হতভম্ব হয়ে দেখলেন বেয়াইয়ের বাড়ির সদর দরজায় বড় একখানা তালা ঝুলছে।

তারপর?

সে তো একটি গোয়েন্দা গল্পেরই কাছাকাছি। সেদিন তো আগে থেকে রেলের টিকিট কাটতে লোক চলে গিয়েছিল, আর ঘোড়ার গাড়িও মজুত ছিল হাওড়া স্টেশনে যাবার জন্যে।

মেয়ে নিয়ে রাজস্থানে পালিয়ে গিয়েছিলেন দীপুদের ন মামা। এবং মেয়েকে আবার নতুন করে লেখাপড়া ধরিয়েছিলেন।

নিজে রিটায়ার করার পরও ফিরে আসেননি। রাজস্থানেরই এক প্রান্তে থেকে গিয়েছিলেন। বাড়ি বদলে।

এরা নিষ্ফল ক্রোধে তক্ষুণি চটপট ছেলের আবার বিয়ে দিয়েছিল। এবং কুটুম্বদের আত্মীয়জনেদের কাছে জানিয়ে দিয়েছিল সে খবর। সরস্বতীও সেই আত্মীয়জনেদের মধ্যে পড়েন।

তাঁর কাছে নাকি হুমকিও এসেছিল, তাঁরা জোচ্চোর বেয়েইটার নামে পুলিস কেস করে তাকে ঘানি টানিয়ে ছাড়বে।

কিন্তু তেমন কিছু ঘটনা ঘটতে দেখা যায়নি।

শুধু—

হ্যাঁ, শুধু পরে, অনেকদিন পরে জানা গিয়েছিল মানে দীপু তার স্মৃতির অতল থেকে সেই ছবি তুলে এনে দেখেছে, লজ্জায় মাথা হেঁট করেছে।

দীপু ন মামার সেই নির্লজ্জ মেয়েটার কাহিনী এই—এতদিন পরেও মনে পড়লে মাথা কাটা যায় দীপুর।

আশ্চর্য! পরিবেশটাও তার নির্লজ্জতার অনুকূল হয়েছিল।

দীপুর ন মামীর বাবা মারা গেলেন, বাপ-মার একমাত্র মেয়ে ন মামী বাপের সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হয়ে পাথুরেঘাটা অঞ্চলে একখানা দিব্যি ভাল দোতলা বাড়ির মালিক হয়ে বসলেন। আর তার সঙ্গে পেলেন বিধবা মায়ের দেখভালের দায়িত্ব। অতএব চলে আসতে হলো তাঁকে উদয়পুর থেকে কলকাতায় পাথুরে-ঘাটায়।

ন মামাই বা না এসে কী করবেন?

চলে এলেন মেয়েকে নিয়েই।

আর তারপরই কীভাবে খবর পেয়ে বড়লোকের কার্তিক হেন ছেলে সেই জামাই এসে হাজির হল পাথুরেঘাটায়।

না না, হম্বিতম্বি নয়, হাত জোড়, নাকে খত কানমলা। বৌকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়।

মা ছিল যত নষ্টের গোড়া, এখন মা গত হয়েছেন, গৃহিণীশূন্য বাড়িতে তার 'পরী বৌ' গিয়ে সংসারের হাল ধরুক। জানা গেল বরের ঘরে না কি মেয়েটার নাম 'পরী বৌ'। আর বলতে কী এখনো নামের গৌরব হ্রাস তো হয়ইনি, বরং আরো যেন বেড়েছে। বাইশ বছর পার করেও আরো উজ্বল, আরো জমজমাটি জৌলুস লেগেছে চেহারায়।

বাইশ পঁচিশটা যে পূর্ণ যৌবন, এটা তো তখন মানা হতো না, ধরা ছিল, মেয়েরা কুড়ি পোরালেই বুড়ি।

অবশ্য না হবেই বা কেন সে ধারণা? তেরো চোদ্দ থেকে গাছে ফল ধরতে শুরু করলে, আর সেই নিয়মিত বার্ষিক ফলন হলে কোথায় গিয়ে পৌঁছতো ভাববার কথা।

কিন্তু দীপুর ন মামার মেয়ের পরিবেশটি অন্য ছিল।

বর না কি প্রথম দেখা মাত্রই বলেছিল, রূপ যে আরো খুলেছে গো পরী! তবে যে শুনেছিলাম সতী নারীরা পতি-বিরহে কৃশ হয়ে যায়!

পরী বৌয়ের তখন শুধু রূপই খুলেছে তা নয়, বুদ্ধিও খুলেছে। উত্তর দিয়েছিল না কি, 'চিরদিন তো সন্দেহই করে এসেছ। এখনো সতী নারীর মর্যাদাটা দিচ্ছ তাহলে?'

বর জিভ কেটেছে, এবং সত্যিই কান মলেছে।

তোমায় সন্দেহ করেছে কোন্ বেল্লিক? পাছে কাক শকুনির নজর লাগে, তাই আগলে বেড়িয়েছি। আর অমন হবে না।

আর অমন হবে না।

এর চাইতে অভয় বাণী আর কী আছে?

পরী বৌকে তার শাশুড়ীবিহীন শ্বশুরবাড়িতে কর্তৃত্বভার নিতে যেতেই হবে। সোজা লোভনীয় পোস্টটি তো নয়?

দারিদ্র্যের সংসার তো নয়, ঐশ্বর্যের সংসার।

কিন্তু?

কিন্তু তার সেই সতীন?

সে সহ্য করবে ? সে ঝাঁটা নিয়ে তেড়ে আসবে না ? অথবা বিষ গুলে খাওয়াতে চেষ্টা করবে না ?

পাগল না কী ?

সেই এলেম আছে তার ?

রাগের মাথায় মা চটপট কোথা থেকে একটা জন্মরুগ্ন মেয়ে ধরে এনে ছেলের বিয়ে দিয়ে বসেছিল, এই পাঁচ বছরে তিন তিনটে পুঁইয়ে পাওয়া মেয়ের জন্ম দিয়ে বসে ধুঁকছে। কবে আছে কবে নেই। পরী বৌ যদি সতীনের ওপর যেতে আপত্তি করে, তাকে বাপের বাড়ি চালান করে দেওয়া হবে।

না, পরী বৌ সে আপত্তি করেনি।

সেই নির্লজ্জ মেয়েটা অনায়াসে সতীনের ঘরে গিয়ে উঠেছে। এবং—

তা সে তো পরবর্তী কথা।

সে কাহিনী আলাদা।

সেই সতীনকে না কি যত্ন-আত্তির গুণে আবার আস্ত একটা স্বাস্থ্যে সুস্থ মানুষ করেছিল মেয়েটা, সতীন না কি 'দিদি' বলতে অজ্ঞান হতো। 'দিদি' তাকে স্বামীর ভাগও দিতো অগাধ উদারতায়।

তবে ভাঁড়ারের চাবিকাঠিটি কদাচ সতীনকে নয়। হবেই বা কী করে ? পরী যে সেই তেইশ বছর বয়েসে প্রথম 'মা' হয়ে তিরিশের মধ্যে পর পর চার-চারটে সোনার চাঁদের মত ছেলেকে পৃথিবীর আলো দেখাল।

আসনটা তার কোন্ উঁচুতে উঠল ভাবো ?

পরে এসব ঘটনার খবর বার্তা কানে এসেছে, দীপুর মনে হয়েতে কী নির্লজ্জ ! কী নির্লজ্জ !

তবে আরো পরে অনেক কিছু শুনতে শুনতে আর দেখতে দেখতে বুঝেছে দীপু, তার মামাতো দিদির মত সংসার-ক্যাঙলা নির্লজ্জ মেয়ের সংখ্যা বাঙলা দেশে হাজার হাজার।

একটু 'সংসার' পাবার আশায় তারা কী অধমের ভূমিকাতেই না পড়ে থাকে ! সত্তা বিসর্জন দিয়ে দাসত্ব !

'মান মর্যাদা' শব্দটার বানান ভুলে গিয়ে সংসারসুখের আস্বাদ।

কিন্তু সে ভূমিকা কি শেষ হয়ে গেছে মেয়েদের ?

আজকের মেয়েদের কি 'স্বাধীন সত্তা'র স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে সংসারসুখের আস্বাদ মিলছে ? এ প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্যে কি তৈরী হচ্ছে নতুন প্রজন্ম ?

এই নতুন বাড়িটায় তো এসেছে দীপুরা বেশ কত দিনই। সাধারণ পাড়া সাধারণ প্রতিবেশী। তবে সবাই বেশ সভ্য ভব্য শিক্ষিত।

দীপুদের সিই সুন্দর বারান্দার উপরকার একতলা বাড়িটা, যার সামনে দিয়ে মহরমের তাজিয়া ভাসানের মিছিল যেতো, হামেশাই ইংরেজি বাজনা বাজিয়ে আট ঘোড়ার গাড়িতে চেপে 'বর' যেতো। শনিবার দুপুর হলেই সাহেব-মেমরা মোটরবাইক চেপে ব্যারাকপুরে যেতো, আর অহোরাত্র ফেরিওলা যেতো, সে

বাড়ির প্রতিবেশীদের শ্রেণীটা একটু অন্য রকম ছিল।

তাদের পিছনের গলির বাড়ি থেকে লোকেরা জোর বাজনা বাজিয়ে বরই যাক অথবা মড়াই যাক (তাও যেতো তো) ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে আসতো, 'বড়দিনের উৎসব করতে দেখলে হেসে হেসে বলতো, তোরা বুঝি খৃীষ্টান ?

আর বসাক-গিন্নীদের মত মহিলারা গা-ভর্তি ভারী ভারী গহনা পরে গৃহ-পালিত গরুর দুধ দুইতো, আর তাদের গোবর জমা করে বাড়ির দেয়াল ভর্তি করে ঘুঁটে দিতো।

এরা তেমন নয়। এরা উচ্চ মানের।

এদের বাড়িতে আলমারী ভর্তি ভর্তি বই।

সেই সূত্রেই দীপুর জীবনে আলাদা একটা অধ্যায় সৃষ্টি হতে শুরু করল।

কিন্তু তার আগে ?

সেও এক নতুন অনুভূতির জগতে পেঁছিনো।

ছোড়দা এসে বললেন, এই, আমার একটা বন্ধু একখানা বই দিয়ে গেছে ?

হ্যাঁ তো।

বলে তাড়াতাড়ি এনে দিল দীপু খানিক আগে রেখে দেওয়া বইটা।

ইংরিজি বই, কাজেই দীপুর অভক্ষ্য। না হলে এতক্ষণে সে বই দীপুর গলাধঃকরণ হয়ে যেতো।

ছোড়দা বললো, বইটা নেবার সময় তুই না কি বুঝতে পারিসনি ও আমার বন্ধু ? ভ্যাবলা হয়ে তাকিয়ে ছিলি, নিতে হাত বাড়াচ্ছিলি না ?

আহা ! ভ্যাবলা মানে ?

এখন অবশ্য দীপুর সেই 'অলৌকিক' বিভ্রান্তির অবস্থাটা একটু কেটে গেছে। তাই প্রতিবাদের গলা। ভ্যাবলা মানে ?

মানে জানি না। ও তো তাই বলল। বলল, 'বইটা দিতে এসে বলেছে আমি অলকের বন্ধু, এই বইটা তাকে দিয়ে দিয়ো।' তুই এমন করেছিলি, যেন অলক নামটাই জানিস না।

ওসব তোমার বন্ধুর বানানো।

ছোড়দা হেসে উঠে বলল, তা হতেও পারে। ভারি মজার ছেলে। সবাইকে ক্ষ্যাপায়। কিন্তু পড়াশোনায় দারুণ ভালো। ওর নাম হচ্ছে বিভূতি।

ছোড়দা, বইটা কী গো। একটা ছবি রয়েছে—একজন সাহেব চেয়ারে বসে রয়েছে, তার মাথায় সাপ জড়ানো। কী গল্প ?

শার্লক হোমসের গল্প। তোদের তো বলেছি শার্লক হোমসের কত গল্প।

ও হো ! মিস্টার ব্লেকের মতন ?

হুঁ। আচ্ছা বলব পরে।

তোমার ওই বন্ধুর বুঝি ডিটেকটিভ বই পড়ার শখ ?

ওর কাছ থেকেই তো রবার্ট ব্লেকের বইগুলো আনি। 'রহস্য লহরী'র গ্রাহক।

একজন সদ্য কলেজে ওঠা ছেলে 'পড়াশুনোয় নাকি দারুণ' তার ওপর আবার দেখতে দেবদূতের মত, এবং 'রহস্য লহরী'র গ্রাহক।

এ যদি দীপুকে 'ভ্যাবলা' আখ্যা দিয়ে যায়, তার জ্বালাটা কী কাঁকড়া বিছে কামড়ানোর তুল্য নয় ?

উঃ ! ও কি আর কোনোদিন বই দিতে অথবা নিতে আসবে না ?

দীপুর একটা কাজ বেড়ে গেল।

যখন-তখন একটা ছুতো করে একতলায় নেমে আসা, এবং জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়ানো।

মণির শ্বশুরবাড়ি শ্যামনগরের শ্রীপদ মজুমদারের বাড়িতে আজ একটি পরম আহ্লাদের হিল্লোল বইছে। নতুন বৌয়ের বাপেরবাড়ি থেকে লোক এসে সুখবর দিয়ে গেল, গতরাত্রে নতুন বৌয়ের একটি চাঁদের মত খোকা হয়েছে।

খোকা ? সত্যি ? ঠিক তো ?

হ্যাঁ গো হ্যাঁ। সত্যি না তো কি ভুলভাল বলছিগো মাঠাকরুণ ?

বলল খবরদাতা।

মনে মনে অবশ্য বলল, জিগ্যেস করাকেও বলিহারি ! যেন 'খোকা' হওয়া একটা ছিষ্টিছাড়া, আকাশ থেকে পড়া ঘটনা। দুনিয়াখানায় যত মনিষ্যি তার অর্ধেকগুলোই তো 'খোকা'রূপেই জন্মায়। বাকি অর্ধেক খুকী !

তবে মনের কথা বাইরে প্রকাশ করে না। বলে, হ্যাঁ মাঠাকরুণ, ভগবানের আশীর্বাদে বেটাছেলেটিই হয়েছে।

তা হতে কোনো কষ্টটষ্ট হয়নি তো বাবা ?

আজ্ঞে তেমন তো শুনলাম নাই।

তবে লোকটার এক বদ অভ্যাস মনে মনে কথা বলা। তাই মনে মনে বলে চলে, প্রেসবযন্ত্রণা না হয়ে ছেলে পেয়েছে ? তুমি বুড়ী ন্যাকা নাকি ?

লোকটা কে ?

আর কে ? মণিদের বাড়ির পুরনো নাপিত পতিতপাবন। তো 'পাবন' আবার কে বলতে যাচ্ছে ? পতিত—পতিতই শুনতে অভ্যস্ত সে।

বিয়ের সময় ফুলশয্যের তত্ত্ব নিয়ে এসেছিল এ বাড়িতে, তাই চেনা হয়ে গেছে। নাপিত বলে কথা। ধুরন্ধর। ভেবে বুঝে ওকেই পাঠানো হয়েছে।

মণি তো ভয়ে কাঁটা হয়ে ছিল, পাছে মেয়ে হয়। সরস্বতীও কম নয়। তাঁর নিজের দিক থেকে তেমন কিছু না। দুটো জাতের মধ্যে একটাই তো হবে। তবে ছেলে দেখে আহ্লাদে বুক ভরে গিয়েছে।

তাই না সক্কাল হতেই তোড়জোড় করে লোক পাঠিয়ে খবর। তা লোক তো আর কুটুমবাড়িতে 'শুভ সন্দেশ' নিয়ে শুধুহাতে আসবে না ? তাই কলকাতার নামকরা দোকানের সন্দেশও সঙ্গে দিতে হয়েছে তিজেলভর্তি।

মজুমদার গিন্নীর মুখে এমন উথলে ওঠা হাসি বিরল ঘটনা। তাঁর বিধবা ননদ আর ছোট জা আড়ালে বলাবলি করতে থাকে, তা হবে না ? একে বেটাছেলে, তায় চাঁদের মত ছেলে। আবার তার সঙ্গে তিজেলভর্তি কলকাতার ডাকসাইটে ময়রার সন্দেশ।

পতিত বলল, মাঠাকরুণ তাহলে এবার উঠি। ওদিকে কত দিকে কত কাজ। নাপিতের তো আর ছুটি নাই মা। জম্মো-মিত্যু-বিয়ে, এই তিনটি ঘটনা যেমন বিধাতাকে নিয়ে, তেমনি নাপতে ব্যাটাকে নিয়েও। নাপতে ছাড়া তিনটির একটিতেও উদ্ধার নাই। কেমন কিনা ?

তা তো বটেই ! বলেই গিন্নী ননদের দিকে অলক্ষ্যে তাকান।

এক্ষেত্রে মন্ত্রিত্বের গৌরব কিন্তু বিধবা ননদেরই। তা তিনি তাঁর কর্তব্য পালন করেন। হৈ-হৈ করে বলে ওঠেন; ওমা সে কী ! উঠি কি ? সুখবর আনলে, পেট পুরে খাবে, বখশিশ নেবে তবে তো। ছেলের ঠাকুর্দা অবিশ্যি বাড়ি নেই। ডেলি প্যাসেঞ্জারের বাবু তো ! বাড়ি ফিরতে সেই সন্ধ্যে। তো যাক, আমরা তো আছি।

পতিত চালাক ছেলে, নিজে থেকে বখশিশের নাম মুখে আনেনি। জানে প্রার্থীর ভূমিকায় দাঁড়ালেই মান কমে যায়। নিস্পৃহতা দেখালেই মান্য। জানে খবরখানি এনেছে একদম সরেস। একে প্রথম সন্তান, (মেয়ে হলেও কিছু-কিঞ্চিৎ জুটতো) তায় ছেলে। হৈচৈ পড়ে যায়। শুধু বাড়িতেই নয়, পাড়াতেও।

লোকের মুখে মুখে বার্তা !

হ্যাঁগো নাড়ুর মা, শুনলুম নাকি নাড়ুর বৌয়ের খোকা হয়েছে ? লোক পাঠিয়ে খবর দিয়েছে ? তো কুটুমবাড়ির সন্দেশ একলা খাবে ?

কেউ কেউ আবার বললেন, শুধু খবরটি দিলেই তো হবে না গিন্নী। হাঁড়ি ভরে রসগোল্লা চাই। তোমার সেরা ছেলে নাড়ু। তার প্রথম খোকা !

মিষ্টি খাওয়ার দাবিতেই সবাই মুখর।

এও একটা সামাজিক নিয়ম। সুখবর শুনলে মিষ্টির বায়না করা। এটি না করলে মনে হবে তুমি ঈর্ষা করছো !

এদিকে আবার গিন্নীর ভাগ্নী চুপিসাড়ে খিড়কি দরজা দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে যাদের সঙ্গে বেশী আঁতাত এমন এমন পড়শীদের বাড়ির হেঁসেল থেকে সংগ্রহ করে এনে জমা করল বেশ কিছু পদ ব্যঞ্জন। কুটুমবাড়ির লোকের সামনে ভাতের থালা ধরে দেবার সময় গৌরব বাড়বে, দ্যাখো আমার সংসারে হঠাৎ হুটুকোরী লোক এসে পড়লেও দশ-তরকারি দিয়ে খেয়ে যাবে।

এছাড়া মাছ তো আছেই বেশী। কর্তা কর্তার ভাই ছেলেরা ভাগ্নে সব কটা পুরুষই তো সকালে যো সো করে খেয়ে ট্রেন ধরতে ছুটেছে, তাদের আসল খাওয়া তো রাত্তিরে।

গোকলো জেলের বৌ যোগানের মাছ দিয়ে যায় বেলা দশটা-এগারোটা নাগাদ। সেই মাছ শেষ বেলায় রাঁধা থাকে বেশীর ভাগটাই তো। কটা মেয়ে-মানুষ আর কতো খায় ? এয়োস্ত্রী মানুষ মাছ রাঁধলে কুটলে, না খেয়ে তুলে রাখতে তো নেই।

তো আজকের মাছের সম্ভার পুরোটাই মজুত ছিল। তার ওপর পাঁচবাড়ির হেঁসেল মিলিয়ে ডাল তরকারি।

খেতে বসে পতিত হাঁ-হাঁ করে ওঠে, করেন কি মাঠাকরুণ, করেন কি ?

কত মাছ কত অন্নব্যঞ্জন! এ যে বে-বাড়ির নেমন্তন্নকে ছাপিয়ে গেল! বাড়িতে কি আজ কোনো কাজকম্মো ছেল?

মোহিত হন এনারা।

পরিতৃপ্ত গলায় বলে ওঠেন, না না। কাজকর্ম কিছুই না। ওই রাঁধতে রাঁধতে পাঁচখানা হয়ে যায়—রান্না বাতিক। আর এ বাড়ির বেটাছেলেদের যে বাটিভর্তি মাছ নইলে ভাত রোচে না। সকালে তো তেমন জুৎ করে খাওয়া হয় না।

মাছ-তরকারির পরিমাণ দেখে পাঁতত যতই হাঁ হাঁ করুক, খাবার পর পাত দেখে পিঁপড়ে কেঁদে চলে গেল।

খাবার-শেষে চাটাপোটা পাতে আঁকিবুকি কাটতে কাটতে (এটা করলে নাকি অহজমের ভয় থাকে না) বলে পাঁতত, আপনারা গাঁ-ঘরে আছেন মাঠকরুণ, তাই এতো খাওয়ার সুখ। কলকেতায় বড়মানুষের ঘরেও এমনটি হতে হয় না। ষোড়ষোপচার বলুন, তার সঙ্গে বাটিভর্তি মাছ। বাবাঃ! না আমাদের মেজ-বাবুর এই মেয়েটি খুব কপাল করে এসেছিল, তাই এমন বাড়িটিতে পড়েছে। ওঃ যা খেলুম অনেককাল মনে থাকবে। হ্যাঁ, বে বাড়ি যজ্ঞিবাড়ি হয় সে আলাদা কথা। নিত্যদিন এমন ভোজন-সুখ!

কথায় বলে 'নাপিত ধূর্ত'।

ঠিকই জানে এই রকম তোয়াজী কথাতেই মাটি ভেজে, বৃক্ষলতায় ফল ফলে। হলও তাই।

একজোড়া ধুতি, একখানা পেতলের নতুন থালা, আর নগদ করকরে পাঁচটি টাকা ট্যাঁকস্থ করে, মণিদির ভাগ্যের জয়গান করতে করতে বিদায় নিল পাঁতত।

পাঁতত চলে যাবার পর কথাটা তুললেন মজুমদার গিন্নী। বললেন, তোমার বাবা নজর বড় লম্বা ঠাকুরঝি। তোমার পরামর্শ তো ঠেলতে পারব না, তাই যা বললে দিলুম। একজোড়া কাপড় আর নগদ পাঁচটা টাকা। খাওয়াটিও তো—

ঠাকুরঝি বলে ওঠেন, ওগো বৌ, বলি এ ঘটনা একবার বৈ তো দুবার নয়। বছর বছর তো আর কুটুমবাড়ি থেকে লোক আসবে না। এই একবারেই তোমার 'নজরের' সুখ্যাতিতে ধন্যি ধন্যি পড়ে যাবে। শ্বশুরবাড়িতে তোমার নাড়ুর মুখ উজ্জ্বল হবে। ঝি-চাকর নাপতে-নাপতিনীদের মুখেই সুনাম দুর্নাম। বিশেষ করে নাপতে। এরা তো ঘটকালিও করে। এই যে দেখেশুনে গেল, তো বলবে তো পাঁচজনকে। তাছাড়া ওবাড়ির বড়খুড়ী, কেমন চালটি চেলে গেলেন তা ভাবো? সাতসম্পর্কের জ্ঞাতি খুড়ী, তিনি অমনি ওমা আমার নাতির ঘরে পুতি হল! আমার তো জয়জয়কার! বলে মচ্ করে আঁচলখুলে নগদ করকরে দুটো টাকা বার করে ধরে দিলেন না নাপতে ব্যাটার হাতে। এরপর আর তোমার পাঁচ টাকা বার না করলে মান থাকতো?

মজুমদার গিন্নী অবহিত হন। তাই তো। বলে ওঠেন, সেই তো কথা! আর কিছুই না, জ্ঞাতি শত্তুরতাই সাধা। নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ।

নাও তুমি এখন কী করবে করো!

সুখবর শুনে আহ্লাদ দেখাতে পাড়াপড়শী বা আত্মজনের বাড়ির ঝি-চাকরকে বকশিশ দেওয়া অবশ্য রেওয়াজই। তাই বলে নগদ দু'দুটো টাকা! চালাকি চাতুরী ছাড়া আর কী? এই যে বিধবা ননদও দিলেন না কি? দিলেন বৈকি, খবরটা শোনামাত্রই পতিতের হাতে একখানা নতুন গামছা আর আটগণ্ডা পয়সা ধরে দিলেন।

দুজোড়া কোরা থান, কী দু'খানা নতুন গামছা এমন তো থাকেই প্যাঁটরায়।

নাতি হওয়ার আহ্লাদের ঢেউয়ের ওপর চাপান পড়ল জ্ঞাতিখুড়ীর চাতুরী হিংসুটেপনা। এবং এই একটা থেকে অনেক দৃষ্টান্ত স্মরণে আসতে লাগল দুই ননদ-ভাজের।

নতুন করে আহ্লাদের ঢেউ উঠল আবার ডেলি প্যাসেঞ্জার বাবুরা বাড়ি ফিরলে।

এখনকার হৈ-হৈ রৈ-রৈএর পালাটি আরো অনেক জমজমাটি।

জুতো খুলতে তর সয় না, কর্তাকে এবং বাকি জনেদেরও সবাই ঘিরে এসে ধরে। গিন্নী, বিধবা বোন, বরে-খ্যাদানো ভাগ্নী, আইবুড়ো মেয়েরা। এবং দূরবর্তী ভাবে ভাদ্রবৌ ও আর দুই পুত্রবধূ।

একসঙ্গে সমবেত স্বর।

ওনারাও প্রথমে বলে উঠলেন, সত্যি? তাই নাকি? ভাল ভাল।

ছোট কর্তা অবশ্য একবার বলে উঠলেন, ব্যাটা বকশিশের লোভে চাল ফলিয়ে উল্টোটা বলে গেল না তো?

আহা! ঠাকুরপোর যা কথা! বলি উল্টোটি হলে তারা বড়মুখ করে লোক পাঠিয়ে খবর দিতো!

তাই তো! সত্যি!

কর্তা আর একবার বললেন, আমি তোমায় গোড়া থেকেই বলেছি না, নতুন বৌমাটি খুব গুণের!

যেন পেট থেকে মেয়ে বার না করে ছেলে বার করতে পারাটি একটি নিজস্ব গুণ!

তা সেইভাবেই দেখা অভ্যাস লোকের।

তো লোকটাকে ভাল করে খাইয়ে-টাইয়েছিলে তো?

আহা! তোমার পরামর্শের জন্যে বসে ছিলাম।

ও দাদা, সে আর বোলো না। সেই নাপতেব্যাটা বলে গেল বে-বাড়িতেও এমন খাওয়া জোটে না। আপনাদের বারো মাস নিত্য এমন যজ্ঞি!

তাই নাকি? খুব অনেক রাঁধলি তখন?

হুঁ, তা আর নয়! ওসব কৌশলের ব্যাপার। তবে হ্যাঁ, তোমাদের ভাগের মাছ থেকে একখানা করে কমে গেছে।

চুলোয় যাক। ভাল করে খেয়েছে তো? তাহলেই হলো। তা বকশিশ-টকশিশ?

সে আর বোলো না। তোমার এই বোনটির নজরটি তো লম্বা কম নয়। ওর পরামর্শেই কাজ। বকশিশ দেওয়া হয়েছে একজোড়া কাপড়, একখানা গামছা, একখানা নতুন পেতলের থালা, আর নগদ পাঁচটি টাকা।

অ্যাঁ, বল কী? এতর ওপর আবার নগদ পাঁচ টাকা? এ যে বড়মানুষের বাড়ির মত হলো!

তা মানটা তো রাখতে হবে?

ও মামা, তুমি এই বলছ? লোকটা তেমন খাঁইওলা নয় তাই, আর কেউ হলে সোনার আংটি চেয়ে বসতো।

ও বাবা! নাতি আর কারুর হয় না?

তা যাক, সন্তুষ্ট হয়ে গেছে তো?

ও বাবা, ত আর বলতে?

ছোট কর্তা বললেন, একটু বেশী বাড়াবাড়ি হয়েছে আর কী!

তো নাড়ুর মুখটাও তো বড় হলো শ্বশুরবাড়িতে? নাড়ুর প্রেথম ছেলে হয়েছে এটা কম আহ্লাদের কথা!

তা অবশ্য তাই। নাড়ু দামী ছেলে। শ্যামনগরের এই মজুমদার বাড়িতে এর আগে কোন্ ছেলেটা বি এ পাস করেছে?

হৈ-চৈ-অন্তে কাজের কথা পাড়লেন গিন্নী। নাও, আহ্লাদও হলো কর্তব্যও বাড়লো। বেটাছেলের বেলায় ষেটের আটকৌড়ে, একুশে ষষ্ঠী, এসব খবর বাপের কুলের। হিসেবমতন টাকা ধরে দেবে বৌমার বাবাকে।

শোনো কথা! বৌমার বাবাকে আমি পাচ্ছি কোথায়?

শোনো কথা! নাতির মুখ দেখতে যেতে হবে না? একদিন বার ভাল দেখে আফিস থেকে সকাল করে বেরিয়ে দুই ভাইয়ে গিয়ে দেখে এসো। ঘরে হাফ-গিনি আছে ছেলেদেরই দরুন, তাই নিয়ে যেও দু'খানা।

আবার গিনি দিয়ে দেখতে হবে?

ওমা! তা হবে না? প্রথম বলে তো বটেই, তায় আবার নাতি। নাড়ু যখন দেখবে তখন ওকে তো সোনা দিয়ে ছেলের মুখ দেখতে হবে।

কিন্তু নাড়ু কই?

নাড়ু আবার এখানে থাকবে কী? খবর শোনামাত্রই তো লজ্জায় লাল হয়ে সরে পড়েছে।

ও দাদা, নাতি হওয়ার আহ্লাদও যেমন দায়ভারও তেমন। এখন পাড়া-সুদ্ধ মিষ্টি বিলোতে হবে। সবাই বলে গেছে। তাতেও ঘটাপটা না করলে মানাবে না।

হ্যাঁ, এরপর আবার অন্নপ্রাশন আছে।

আর শোনো—আমাদের খুদুর মা, করালী ধোবা গয়লা জেলেনী, সবাইকে কিছু কিছু বকশিশ দিতে হবে।

ছোট কর্তা হঠাৎ বলে ওঠেন, ও বাবা! বৌদি, ফিরিস্তি যে বাড়িয়েই চলেছ দেখছি। এর থেকে তো দেখছি নাড়ু একটা মেয়ে হলেই ছিল ভাল!

নিচের তলায় নেমে নেমে জানলার কাছে এসে দাঁড়ানো খতম হয়ে গেছে দীপুর। মানুষের অকারণ হিংস্রতা আর নিষ্ঠুরতা যে অপরকে কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে বঞ্চিত করে তা যারা হিংস্র নিষ্ঠুর তারা কি বুঝতে পারে ?

হয়তো পারে। আর পেরে 'একটা কিছু "খতম" করতে পারলাম' ভেবে রীতিমত আত্মপ্রসাদ অনুভব করে।

অথবা হয়তো সবাই পারে না। যেমন পথচলতি লোক চলতে চলতে হঠাৎ পাশে কোন গাছ দেখতে পেলে অকারণ তার পাতা ছিঁড়ে ফেলতে ফেলতে যায়। আর ফুল থাকলে তো কথাই নেই। গাছ থেকে ফট্ করে ছিঁড়ে তুলে নিয়ে তার পাপড়িগুলো ছিঁড়তে ছিঁড়তে নখের ডগায় পিষতে পিষতে রাস্তা হাঁটে। এরা হয়তো হিংস্র নয় শুধু অন্যমনস্ক।

তবে দীপুর ওই সামান্য সুখটুকু ['সামান্য' আবার বলা চলে 'অসামান্য'] যিনি খতম করবার মহৎ দায়িত্বটুকু পালন করলেন, তিনি হচ্ছেন দীপুর এক পিসেমশাই।

তিনি কদাচ কখনো বেড়াতে আসেন। আসলে এটা তো তাঁর শ্বশুরবাড়ি নয় শালার বাড়ি, দেখা করার দায় নেই। সেদায় আছে যেখানে এখনো দোর্দণ্ড-প্রতাপ শাশুড়ী বিরাজিতা। যিনি একদা পায়ে হেঁটে 'চারধাম' করেছেন, এবং সেটি করে নিয়েছেন বলেই যে থেমে বসে আছেন তা নয়। এখনো যখন খুশি তখন পায়ে হেঁটে চলে যাচ্ছেন তারকেশ্বর, চলে যাচ্ছেন বাঁশবেড়িয়ার হংসেশ্বরী মন্দিরে, চলে যাচ্ছেন যোগে-যাগে ত্রিবেণীর গঙ্গায় স্নান করতে।

এহেন শাশুড়ী ঠাকুরাণীকে সমীহ করতেই হয়, মাঝে মধ্যে দেখা করতে যেতেই হয়। সেও অবশ্য শালাদেরই বাড়ি তবে তাঁরা চারজন কর্তা ব্যক্তি সে সংসারের 'প্রজা' মাত্র। এখনো সেটি 'মহারাণীর রাজ্য'।

এ বাড়ির পরিস্থিতি আলাদা।

তবে অনেক আত্মীয়স্বজন আবার এ বাড়িতে আসতেই অধিক পছন্দ করে। কারণ এখানে 'ভয়' নেই। এসো বসো, গালগল্প করো, ভালমন্দ খাও দাও খোশ মেজাজে বিদায় নাও।

তবে কারো কারো এই সদা আহ্লাদের বাড়িটি দেখলে অন্তরজ্বালা ধরে। দীপুর অনেকজন পিসেমশাইয়ের মধ্যে ইনি একজন।

ইনি হয়তো এ পাড়ায় কোথাও এসেছিলেন, এখানে ঢু মারতে এসেছেন কিন্তু ঢোকবার মুখেই জানলায় দাঁড়িয়ে থাকা দীপুকে অবলোকন করলেন।

সেই অবলোকনের ফলশ্রুতি দীপুর রাস্তার ধারের জানলায় দাঁড়ানো খতম।

এরকম একটা বয়স্থা কুমারী মেয়ের রাস্তার ধারের জানলায় দাঁড়িয়ে থাকার দৃশ্য দেখে তিনি নাকি হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন, এবং তারপর দীপুর মায়ের কাছে অনেক জ্ঞানের বাণী শুনিয়ে এই গর্হিত ব্যাপারটি বন্ধ করার অনুরোধ জানিয়ে মেয়ের তাড়াতাড়ি পাত্র খোঁজার চেষ্টা করতে অনুরোধ করে গিয়েছিলেন।

ইতিপূর্বে বামুনদির ঘটনা ঘটেছে। এখন আবার এই। কড়া নিষেধ হয়ে গেল দীপুর ওপর।

তা এটি খুব আশ্চর্যেরও কিছু নয়। দীপুর ছোড়দারই না হয় প্রগতিশীল মানসিকতা, ফার থেকে মাত্র বছর দুইয়ের বড় দাদাটি? তিনি তো সেই পুরনো ঐতিহ্যেরই বহনকারী। তিনিও তো দীপুকে একবার বারান্দায় দাঁড়াতে দেখলেই (সাধ্যপক্ষে বারান্দায় দাঁড়ানো দেখবার সুযোগ দেয় না দীপু) বলে ওঠেন, 'এখানে কী করছিস? যা ঘরে যা।'

তবে মা ছেলেকে তত গ্রাহ্য করতেন না। ননদাইকে করতে হল।

কড়া শাসন জারি হয়ে গেল।

কিন্তু লোহার বাসরেও তক্ষক ঢোকে।

দোতলার ঘরেও জানলা আছে। তবে সেটা রাস্তামুখী নয়, পাশের বাড়ি-মুখো। এ দিকে তাদের পাঁচিলের ধারে সারি দেওয়া কিছু গাছ আছে, তার মধ্যে একটি হচ্ছে মস্ত একটি শিউলী গাছ।

শিউলীর সুবাস যে এমন উতলাকারী তা আগে এতদিন জানা ছিল না। অথচ বছর দুই তো 'শিউলী কাল' পার হয়ে গেছে এই বাড়িতেই।

আর শরৎ কাল?

সেও তো জীবনে এসেছে অনেকবার।

দীপুর মনে হচ্ছে জীবনে যেন এই প্রথম শরৎকাল এল। তার কোন্ ছোট বেলা থেকে মুখস্থ করা সব কবিতাগুলো যেন হঠাৎ হঠাৎ নতুন অর্থ নিয়ে ধরা দিতে শুরু করল।

বিশেষ বিশেষ এক-একটি কবিতা কী গভীর অর্থবহ আর দীপুর মানসিকতার সঙ্গে খাপ খাওয়া!

অথচ দীপু আগে কোন কালে মণিদি আর ফুলির সঙ্গে গলা মিলিয়ে কত সময় আবৃত্তি করেছে—

'আজি শরৎ তপনে প্রভাত স্বপনে—
কী জানি পরাণ কী যে চায়।
কোন শেফালীর আশে কোন ফুলবাসে—
সুনীল আকাশে মন ধায়।
কে যেন গো নাই এ প্রভাতে তাই—
জীবন বিফল হয় গো—
চারিদিকে চায় মন কেঁদে গায়
এ নহে এ নহে নয় গো!'

হ্যাঁ, আগে এ লাইনগুলো শত বার বলেছে দীপু। শিউলীও দেখেছে কত-বার।

তবে তখনো পড়েনি, "হেথা নয় হেথা নয় অন্য কোথা অন্য কোনোখানে।"

তা না পড়ুক—'এ নহে এ নহে নয় গো—' তো একই কথা বলছে।

'বয়স্থা কুমারী কন্যার' পক্ষে এ চিন্তা যে রীতিমত গর্হিত এ জ্ঞান নেই দীপুর।

সন্ধ্যার মুখে শিউলী ফোটার গন্ধ বাতাসে ভেসে আসে। শরতের মাদকতাময় স্নিগ্ধ বাতাস। বসন্তের বাতাসকে এত প্রাধান্য দেওয়া হয়ে থাকে, কিন্তু শরতের হাওয়া কি তার থেকে কিছু কম ?

হয়তো বা তার চেয়ে কোনোদিক থেকে বেশী।

দীপুর অন্ততঃ তাই মনে হয়। মনে হয় বসন্ত কালের এলোমেলো বাতাস যেন কোনো কিছু ভাব-ভাবনার স্বাদ এনে দিতে পারে না, শুধু এলোমেলোই করে দিতে পারে। শরতের হাওয়া ভাব-ভাবনার স্বাদ এনে দেয়।

(দীপুর ছেলেবেলায় এই সব ঋতুদের চেহারা দেখা যেত আলাদা আলাদা করে। 'ষড়ঋতু' শব্দটার অর্থ ছিল। আর ছিল বলেই না কবি অমন করে 'প্রকৃতি সঙ্গীত' রচনা করেছেন।)

জানলাটার কাছে এসে দাঁড়াল দীপু। শরৎ সন্ধ্যার বাতাসে ভেসে এল স্ফুটনোন্মুখ শিউলীর সুবাস।

পাশের ঘরে মণি ছেলেকে ঘুম পাড়াচ্ছে।

মণিদির জন্যে একটু দুঃখ হল দীপুর। এক ধরনের মন কেমনও।

মণিদি আর দীপুর অনুভূতির জগতের নিবিড় অংশীদার নেই। একদা মণিদি ছাড়া দীপু একা কোনো কিছুই উপভোগ করতে পারত না। এখন মণি দীপুর থেকে অনেক অনেক দূরে চলে গেছে।

হঠাৎ মনটা হু হু করে উঠল।

দীপুরও হয়তো এই দশাই হবে। হয়তো কেন হবেই তো। তখন এ বাড়ির ঘরে দালানে জানলায় বারান্দায় ঘুরে বেড়াবে শুধু ফুলি।

ফুলিও দীপুর সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মতই থাকে, যেমন দীপু থাকতো মণির সঙ্গে সঙ্গে, কিন্তু ফুলি বড় বেশী চাপা। ফুলিকে বোঝা যায় না। ফুলি স্বল্পভাষিণী নয়, অনর্গল কথা বলে, কিন্তু সে সব কথা বহিরঙ্গের কথা, ওর মনের মধ্যে কোন্ ভাবের খেলা বোঝা যায় না। বারো বছরের ফুলি যেন একটা আস্ত মেয়ে। যদিও আকৃতিতে নয়।

যখন মণি আর দীপু 'একাত্মা' ছিল তখন দিনগুলো কী জমজমাট ভরন্ত ছিল। দীপুকে হঠাৎ একদম নিঃসঙ্গ করে দিয়ে মণিদি ভিন্ন ভুবনের বাসিন্দা হয়ে গেল। মণি এই সিউলীগন্ধি শরৎ হাওয়ার দিকে জানলাটা এঁটে বন্ধ করে বসে আছে ছেলের ঠাণ্ডা লেগে যাবার ভয়ে।

নিঃসঙ্গ দীপু ওই সুরভিত হওয়ার মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ একটি মৃদু মেয়েলি সুরেলা কণ্ঠের গান শুনতে পেল।

গান গাইছে কে ?

স্বর্ণদি ?

কিন্তু না, স্বর্ণদির গলা তো নয়। সে তো শুনেছে দীপু। স্বর্ণদি হারমোনিয়ম বাজিয়ে গান গায়। গানের মাস্টারের কাছে গান শেখে।

ওরা বড়লোক। ওদের বাড়িটা দীপুদের বাড়ির মত এমন সেকেলে নিয়মে পরিচালিত নয়। যদিও দীপুর মা একটি আশ্চর্য আধুনিকা মহিলা, কিন্তু সে তাঁর নিজস্ব মনোজগতে।

বাড়ির রীতিনীতি অনুশাসন (বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে) এখনো দীপুদের পুরনো বাড়ির আইনেই আবর্তিত। যেমন দীপুর ঠাকুমার নিষেধ অনুযায়ী তাঁর বাড়ির মেয়েরা স্কুলের দরজা মাড়াবে না। মেয়েদের গানের চর্চার প্রশ্নই উঠবে না। আরো কত কিছু।

দীপুর মা তাঁর ছেলেমেয়েদের এবং নিজেকে নিয়েও সে বাড়ির আওতা থেকে চলে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন, কিন্তু তার অধিক আর কিছু করে ওঠা সম্ভব হয়নি তাঁর। দীপুর বাবার মতে যা করা হয়েছে, সেটাই যথেষ্ট। আরও বেশী কিছু করতে যাওয়াটা হবে তাঁর মায়ের প্রতি অবমাননা দেখানো। অতএব ওই 'আলাদা' হয়ে আসা ছাড়া বহির্দৃশ্যে আর কোনো কিছুই করে উঠতে পারলেন না দীপুর মা।

দীপুর বাবা নিজে যে বিশেষ কট্টর তা নয়। কিন্তু অতিরিক্ত মাতৃভক্ত। বিশেষ করে মায়ের কাছ থেকে আলাদা হয়ে আসার দরুন তাঁর (এমনিতে সুবিধে স্বাচ্ছন্দ্য আরাম আয়েস স্বাধীনতা সব পেলেও) মনের মধ্যে ছিল একটি অপরাধবোধের তাড়না। সেই তাড়নাই তাঁকে এখনো 'ও বাড়ি'র অনুশাসনে শাসিত করে রেখেছে।

দীপুদের পাশের বাড়িটা অন্য ধরনের।

যদিও সে ধরনটা জটিল কি সরল তা বোঝবার ক্ষমতা দীপুর ছিল না। তা-ছাড়া ওরা বড়লোক বলে মেলামেশাটা খুব বেশী এগোতে পায়নি এতদিনেও।

যদিও স্বর্ণদি ছিল আশ্চর্য সুন্দর সরল একটি মেয়ে। আর তার প্রাণের মধ্যেটা যেন ভালবাসা দিয়েই গড়া। স্বর্ণর ডাকাডাকিতেই দীপুরা ওদের বাড়ি যায় এক-আধবার। তবে মণির অবস্থা তো বদলে গেল, একা দীপু আর কী যাবে ? তাছাড়া—স্বর্ণর তেমন সময় কোথা ? স্বর্ণকে স্কুলে যেতে হয়, গান শিখতে হয় আবার পিসিদের কাছে রান্নাও শিখতে হয়, এবং খুড়ির কাছে সেলাই। তাকে তো চৌকস করে তুলতে হবে। ভাল বাড়িতে বিয়ে দিতে হবে।

গানটা আর একটু স্পষ্ট শোনা গেল।

হয়তো এই শিউলী সুবাসিত শরৎ হাওয়ার আবেশে একটু বিহ্বলতা এসে থাকবে, তাই গলাটা মৃদুতার সীমা ছাড়িয়ে বসেছে।

দীপু অবাক হয়ে দেখল গায়িকা স্বর্ণদির ছোটপিসি।

দীপুরা যাঁকে বেণু পিসি বলে।

দীপু অবাক হয়ে গিয়ে যেন দিশেহারা হয়ে গেল।

বেণু পিসি গান গাইছেন !

বেণু পিসির গলা এমন সুরেলা এমন সুন্দর।

দীপুর মনে হল যদি জানলাটা টপকে দীপু ওদের ওই নীচু ছাতটায় গিয়ে পড়তে পারতো ! কাছে গিয়ে দেখে নিশ্চিত হতো। অবশ্য জানলা না টপকেও

নিশ্চিত হলো। হ্যাঁ, বেণু পিসিই।

এখন আকাশে একফালি চাঁদ দেখা দিয়েছে। আর সেই আলোটুকুতেই দেখা যাচ্ছে বেণু পিসির গায়ে জড়ানো সাদা ধবধবে থান কাপড়টা।

থানটাও জ্যোৎস্নার মতই ধবধবে সাদা।

আর বেণু পিসির রং? সেও তো জ্যোৎস্নার মতই। বেণু পিসির রংকে নাকি আগে বলা হতো 'মেমের মত'। বিধবা হবার পর নাকি আর বলা হয় না। বোধ হয় বিধবার রূপের কথা আলোচনা করতে নেই। তবে রূপবতী যে তাতে তো সন্দেহ নেই। মেমের মত রং, অনবদ্য মুখশ্রী। শুধু শরীরে একটু মেদের বাহুল্য। দীপু যখনই ও'কে দেখে মনে মনে ও'র মেদগুলো চে'চে ফেলে দিয়ে কল্পনা করতে থাকে কেমনটি লাগে।

আবিষ্কার করতে চেষ্টা করে একটি পরমা সুন্দরীকে।

কিন্তু মনে মনে যা কিছু চে'চে ফেলা যায় বাস্তবে তো তা যায় না। কোনো কিছুই যায় না। তাই বেণু পিসি তাঁর ভারিসারি দুধবরণ দেহটি নিয়ে একটি দুধবরণ ঢিলেঢালা সেমিজ আর তেমনি দুধবরণ একখানি মিহি থান পরে নানা কাজে ঘুরে বেড়ান। সারা সকাল জাঁকিয়ে বসে কুটনো কোটেন, আর দুপুর বেলা বয়েসে অনেক বড় দুই বিধবা দিদির সঙ্গে নিরামিষ ঘরে গিয়ে পা ছড়িয়ে বসে এক কাঁসি চচ্চড়ি খান।

সেই বেণু পিসির গলায় এমন গান।

প্রথমটা গানের লাইন ধরতে পারেনি দীপু। কিন্তু বেণু পিসি যখন অন্যমনা হয়ে গলাটা একটু চড়িয়ে ফেললে, আর ছাদে বেড়িয়ে বেড়ানোর বদলে শুধু আলসে ধরে দাঁড়িয়ে গাইতে লাগলেন তখন বুঝতে পারা গেল। ধরে ফেলা গেল গানের লাইন।

এই গান গাইছেন বেণু পিসি! দীপুরই প্রাণের গান!

'দিবস রজনী আমি যেন কার আসার আশায় থাকি।'

দীপু জানে না বেণুপিসির বয়স কত। তবে থান পরা বিধবাকে বুড়োদের দলেই ধরা হয় তো, তাই বয়সের কথা মনে আসে না। অবশ্য এটা জানে পাঁচ বোন আর চার ভাইয়ের মধ্যে বেণু পিসিই সবচেয়ে ছোট। মা বাপের কোলের মেয়ে। সব দাদা দিদিদের আদরের আর হয়তো সে আদরের সঙ্গে করুণাও জড়িত।

দীপুর জানা বলেই গানের লাইনগুলো আরো স্পষ্ট হয়ে উঠছে—

'চঞ্চল হয়ে ঘুরিয়া বেড়াই, সদা মনে হয়
যদি দেখা পাই!
"কে আসিছে" বলে চমকিয়া চাই কাননে—
ডাকিলে পাখি।'

হায়! এমন দশা তো দীপুরই ঘটেছিল এই কিছুদিন আগেও। কিন্তু সে অবস্থার ওপর যবনিকা পড়ে গেছে। দেবদূতের দেখা পাবার আশা আর নেই। দীপু 'বয়স্থা কুমারী', ওসব মনোভাবকে প্রশ্রয় দেওয়া গর্হিত!

কিন্তু বিধবা ?

দীপুর দিশেহারা হওয়ার কারণও তো এই প্রশ্ন ! একজন 'বিধবা' যিনি একাদশী করেন, একবেলা মাত্র খান, থান পরে দুখানা পুরো ন্যাড়া হাত নিয়ে বেড়ান, দীপুর ঠাকুমার মতই সন্দেশ রসগোল্লা ছাড়া দোকান বাজারের আর কোনো খাবার ছোঁন না তাঁর কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হয়ে চলে—

'জাগরণে তারে না দেখিতে পাই
থাকি স্বপনেরই আশে—
ঘুমের আড়ালে যদি ধরা দেয়—
বাঁধিব স্বপন ফাঁসে—
এত ভালবাসি এত যারে চাই—
মনে হয় না তো সে যে কাছে নাই।
যেন এ বাসনা ব্যাকুল আবেগে
তাহারে আনিবে ডাকি।'

দীপু আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না, বসে পড়ে জানলার নীচে।…কার উদ্দেশ্যে এই গান ! যাতে এমন এমন গভীর আবেগের সুর ! ওঁর সেই মরে যাওয়া বরের ? কিন্তু তাই বা কী করে হয় ?

দীপু তো মায়ের মুখে ওনার ইতিহাস শুনেছে। কেবলমাত্র বিয়ের সময় ছাড়া বেণু পিসি তো তাঁর বরকে আর দেখেনইনি। অষ্টমঙ্গলার দিন বাপের বাড়ি চলে এসেছিলেন। আর সেই আসার এক মাস দশ দিন পরে খবর এসেছিল সেই উনিশ বছরের বরটি একদিনের জ্বরে শেষ। বেণু পিসির নাকি তখন সাড়ে ন বছর বয়েস !

'একথাবা স্থলপদ্মের মত' দেখতে মেয়েটাকে কোথায় কোন্ বিয়ে-বাড়িতে দেখে কোন বড়লোকের গিন্নী নাকি জবরদস্তি করে (আবার নাকি হাতে পায়ে ধরেও) বেণু পিসির ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বাপকে ন বছরের মেয়ের বিয়ে দেওয়ায় রাজী করিয়ে তাকে নাতবৌ করে ছেড়েছিলেন।

তবে বিয়ের দেড় মাসের মাথায় এই দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ায় তাঁরা আর সেই স্থলপদ্মের 'থাবার' মুখদর্শন করেননি। কে জানতো—অমন রূপের মধ্যে এমন 'বিষকন্যা'।

তো সেই বরের কথা ভেবে ভেবেই কি বেণু পিসি ?

হঠাৎ ওই নেহাৎই স্বর্ণদির ছোট পিসির সম্পর্কে তীব্র একটা আকর্ষণ অনুভব করতে থাকল দীপু !

কাল যাব স্বর্ণদিদের বাড়ি।

রাত্রে সবাই একসঙ্গে খেতে বসে দীপু আবিষ্কার করল ওই গানের সুর দীপুর মাও শুনেছেন। এবং মণিদিও। মা মণিদিকে বলেছেন, 'এত রূপ এত গুণ অথচ কী কপাল !'

দীপু জানতে দিল না সেও শুনেছে।

বামুনদি বলল, দীপু খুকি, তোমার আজ খিদে নেই না কি ?

দীপু রেগে গিয়ে বলল, কেন থাকবে না ? খাচ্ছি তো।

রাত্রে বিছানায় এসে দেখল দীপু, মণিদি ইতিমধ্যেই ছেলে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। ফুলি আর গোপাল ওদের বিছানায় বসে লুডো খেলছে।

দীপু মণির খোকার এপাশে নিজের বালিশে শুয়ে পড়ল আর এখন ও অনুভব করল পাশের বাড়ির সেই শিউলীরা সবাই একসঙ্গে ফুটে উঠেছে। এ গন্ধ বন্ধ জানলা ভেদ করেও ঢুকে এসে পড়ছে।

জানলারা তো সব আটে কাঠে বন্ধ।

খোলা থাকলে মণির প্রাণপুতুল পুত্তুরের ঠাণ্ডা লেগে যাবে না ?

সেই চাপা শিউলী গন্ধের মাদকতার মধ্যে দীপু জেগে জেগে ভাবতে লাগল, সেই প্রায় না দেখা বরটার কথাই বা ভাবতে যাবেন কেন বেণু পিসি ? কেউ কোথাও না থাকলেও কি এমন মনে হয় না কে যেন আছে, কে যেন আসবে !

দীপুরই বা এ গানটা এত প্রিয় কেন ?

দীপু হঠাৎ ওই গিন্নীবান্নী চেহারার বিধবা বেণু পিসির সঙ্গে কেমন একাত্মতা অনুভব করল।

দীপু কাল স্বর্ণদিদের বাড়ি যাবেই যাবে। ভাল করে দেখবে বেণু পিসিকে।

শুনে বেণু পিসি আর নেই !

গান শোনাতে হবে ? পাগল না ক্ষ্যাপা ? শোনো কথা মেয়ের। অ স্বর্ণ, তোর বন্ধু কি বলে রে ?

কিন্তু স্বর্ণ তো এখন বিরোধী শিবিরের।

স্বর্ণর 'বল' এই দীপুর বুকের বল। স্বর্ণর ভরসাতেই ভরসা। স্বর্ণর পৃষ্ঠপোষকতাতেই না তাক মাফিক সময়ে আসা। এ সময় বাড়িতে পুরুষরা কেউ নেই, এমন কি পুরনো চাকর বললামও নাকি একদিনের জন্যে তার দেশের বাড়ি —হাওড়াতে না কোথায় গেছে। অতএব সুবর্ণ সুযোগ। বাড়ি এখন প্রমীলার রাজ্য।

অবশ্য বাড়িতে পুরুষ বলতে যাঁরা, অর্থাৎ গিন্নিদের ভাষায় ব্যাটাছেলে তাঁরা কেউই বেণুর শ্বশুর-ভাসুর নন, নেহাৎই দাদারা মাত্র। আর একটা একটু বড় হয়ে যাওয়া ভাইপো। পিতৃকুল ছাড়া পতিকুলের কাউকে তো চক্ষেও দেখবার সুযোগ ঘটেনি বেণুর। দাদারাই সব। খুবই স্নেহ সমাদর আছে তাঁদের কাছে। তাই বলে তাঁদের উপস্থিতিতে গলা খুলে গান ? সে তো আর সম্ভবের মধ্যে নয়। যদিও এঁরা দীপুদের বাড়ির মত অত গোঁড়া নন, স্বর্ণ তার মেজকাকার কাছে হারমোনিয়ম বাজিয়ে গান শেখে, আবার সপ্তাহে একদিন করে আধামেম টিচারও আসেন সেলাই, বোনা শেখাতে। স্বর্ণ বেথুন স্কুলে পড়ে। আঁটা খড়খড়ি-মারা জানলা দেওয়া টানা লম্বা গাড়ি আসে স্বর্ণকে স্কুলে নিয়ে যেতে। তা এসব তো করতেই হবে। উঁচু ঘরে বিয়ে দিতে হবে না মেয়েকে ? এখনকার শিক্ষিত ছেলেরা নেহাৎ গণ্ডমুখ্যু মেয়ে পছন্দ করে না। অতএব স্বর্ণর সম্পর্কে আইন শিথিল। তাই বলে বালবিধবা বোন গলা খুলে গান গাইবে ? এ তো আর হতে পারে না।

হলেও সে বোনের মাত্র চব্বিশ বছর বয়েস।

হ্যাঁ, স্বর্ণর কথাসূত্রে জানা গিয়েছিল এ কথা।

জানিস রে, ছোট পিসি তো আমার থেকে মাত্তর দশ বছরের বড়। অথচ আমার জন্মাবার আগেই ওনার বিয়েহওয়া বিধবা হওয়া সব মিটে বসে আছে।... আহা কত গহনা ছোট পিসির, মেজ পিসি একদিন দেয়ালে গাঁথা লোহার সিন্দুকটা খুলে দেখিয়েছিল। দেখে এত দুঃখ হল! মটুক তাপর গিয়ে কান-ঝাপটা রতনচুড় কত কী। তো একদিনের জন্যে গায়ে পরা চেহারাটি দেখলাম না। ওই যে বিয়ের সময় বর-কনের ছবি তোলা হয়েছিল তাতেই যা দেখেছি। তা সে তো ঘোমটা দেওয়া জবড়জঙ্ মূর্তি

কোথায় গো স্বর্ণদি সে ছবি?

ও সে তিনতলার ঠাকুমার যে ঘর ছিল সেই ঘরের উঁচু দেওয়ালে টাঙানো আছে। সে ঘরে তো সব সময় তালা লাগানো থাকে। অনেক অনেক সব জিনিস আছে তো। দেখতে চাস তো বলব একদিন মেজ পিসিকে।

দীপু বলেছিল, নাঃ। সেই জবড়জঙ্ মূর্তি ছবি দেখে আর কী হবে।

যা বলেছিস রে।

স্বর্ণ নিঃশ্বাস ফেলে বলেছিল, তো সেদিন কী ধরাধরি করেছিলুম, যে একবারটি সবগুলো পর না গো ছোট পিসি। কেউ তো আর দেখতে আসছে না। শুধু আমি দেখবো আর তুমি বড় দাঁড়া আরশিটায় দেখবে নিজেকে একবারটি। তো মেজ পিসি যদি একবারটি বার করে দিতো গয়নাগুলো, বোধহয় পরতো ছোট পিসি। যতই মুখে বলুক—পাগলামী করিস না স্বর্ণ—। মুখটা কিন্তু বেশ আলো-আলো আর হাসি-হাসি দেখাচ্ছিল। কিন্তু বলব কী রে—

এ সময় স্বর্ণ গলার স্বর নামিয়ে ছিল—কিন্তু মেজ পিসি না আমায় এক ধমক দিল, কী আদিখ্যেতা হচ্ছে স্বর্ণ? একবারটি গায়ে ছুঁইয়ে কী সগ্গো-লাভ হবে শুনি? বলে না ধমাস করে সিন্দুকের পাল্লা বন্ধ করে দিল। যেন ছোট পিসিকেই ধমাস করে একটা থাবড়া মারল। কী রাগ যে ধরেছিল সেদিন। কান্না পেয়ে গেছল। ওমা, দেখি ছোট পিসি হি হি করে হেসে বলে উঠল, হলো তো? স্বর্ণলতার আশালতার গোড়ায় কোপ! এমন পাগল মেয়ে দেখিনি বাবা!

দীপু বলেছিল, বেণু পিসি সব সময় সবাইকে পাগল বলেন না রে?

হ্যাঁ, ওই একটা অব্যেস। ছোটকা বলে এটা নাকি 'মুদ্রাদোষ'। মুদ্রা মানে তো জানি টাকা, এর সঙ্গে কী যোগ কে জানে। তা আমার তো রাগ হয়ে গেছে। বলে উঠেছি মানুষ বুঝি শুধু স্বর্গলাভের জন্যে সব করে? আর নিতাই মামার বৌ যে রুলি পরে। তার কী? ··তো মেজ পিসি রেগে গরগর করে বলল, পরুক গে। আমরা অমন ইল্লুতে নয়।' তা বলব কী রে দীপু, মেজ পিসি, সেজ পিসি দু'জনার তো কত গয়না। সব তোলা আছে।

হঠাৎ দীপু বলে ওঠে, আচ্ছা স্বর্ণদি, তোমার পিসিমারা সব্বাই বিধবা কেন?

স্বর্ণ তাড়াতাড়ি জিভ কেটে বলেছে, এই ধ্যেৎ! আর বলিস না ও কথা। বড় পিসি ন' পিসি তো সধবা। দূরে দূরে থাকেন তাই দেখিসনি। বড় পিসি জয়পুরে, আর ন' পিসি এলাহাবাদে। পাঁচ পিসি তো আমার। অবশ্য বড় পিসি সতাতো।

ও'রাও সব্বাই এ'দের মত সোন্দর?

না রে। মোটেই না। এমনি মোটামুটি। ন'পিসি তো প্রায় কালোই। তো ওই জন্যেই নাকি আমাদের ঠাকুমা বলতেন, কারুর যেন সোন্দর মেয়ে না হয়। অতি সুন্দরী না পায় বর!

স্বর্ণর কথার ধরনটা গিন্নী গিন্নী।

দীপুর মা বলেন, হবে না? পাঁচ পাঁচজন। গিন্নীর সঙ্গে রাতদিন বসবাস। যতই বেথুন ইস্কুলে পড়াও আর মেম মাস্টার রেখে শিক্ষাদীক্ষা দাও, সবই ভস্মে ঘি। বাড়ির আবহাওয়াই আসল।

তা কী আর করা! বাড়ির আবহাওয়া তো আর বদলানো যায় না।

তবে নিজস্ব স্বভাবে স্বর্ণ খুব সরল ছেলেমানুষ। তাই স্বর্ণ বলেছে গান গাওয়া তো আর গয়না পরার মত অত দোষের নয়, তুই একবার ভাল করে বললেই—

আর সেই 'বলা'টি হয়ে গেছে এতক্ষণ ধরে।

এবং বেণু পিসি সমানেই না যাবার জন্যে ভাইঝিকে আর ভাইঝির বান্ধবীকে 'পাগল' বলে চলেছেন।

হঠাৎ কোন সহৃদয়তায় সেজ পিসি বলে বসলেন, তো এত করে বলছে মেয়ে দুটো, শোনা না বাপু দুটো গান।

বেণু পিসি মেজদির দিকে তাকালেন।

দালানে বড় চৌকীর ওপর দুপুরের আসর। এ বাড়িতে কারো দিবানিদ্রার পাট নেই, নাটক-নভেল পড়ারও না। এই ঢাউশ চৌকীটার এক ধারে স্বর্ণর মেজ খুড়ি এক মনে সরু ক্রুশে সরু সুতোয় লেশ বুনে চলেছেন, যেটা তাঁর নেশা। প্রকৃতপক্ষে স্বর্ণর মেম দিদিমণির কাছ থেকে লাভবান হন স্বর্ণর মেজ খুড়িই। ছোট খুড়ি এতক্ষণ কোলের ছেলেকে পিটিয়ে পিটিয়ে ঘুম পাড়িয়ে ছেড়ে, তাকে ঘরে শোওয়াতে গেছে। এই সুযোগে নিজে একটু গড়িয়ে নেবে এই আর কী।

তবে বেশীক্ষণ নয়। একটু দেরী হলেই মেজ ননদ দরজায় এসে দাঁড়িয়ে শুধোবেন, ছেলে এখনো ঘুমোয়নি না কি ছোট বৌ?

স্বর্ণর সেজ পিসি এক মনে এক ধ্যানে তাঁর মেজদির পাকা চুল তুলে দিচ্ছেন। আসলে পাকা চুল থাক না থাক এ একটা বুড়োমির ভেক।

বেণু পিসি একগাদা শার্ট পাঞ্জাবি হাতের কাছে জড়ো করে ছুঁচ সুতো নিয়ে বোতাম বসাচ্ছেন। বাড়িতে চারটি ব্যাটাছেলে, তিন দাদা আর একটি ভাইপো, এদের জামার সংখ্যা তো কম নয়। আর বোতাম ছেঁড়াতেও কমতি নেই।

সেজ পিসি ফস করে অনুমোদন দিয়ে বসায় বেণু পিসি ভয়ে ভয়ে তাঁর মেজদির মুখের দিকে তাকালেন এক পলকে। কী ভাগ্যি সে মুখে আষাঢ়ের মেঘ নামেনি, বরং যেন এক চিলতে সকালের আলো।

বললেন, তা গা না বেণু। আমরাও তো কতদিন তোর গান শুনিনি।

বেণুর ফর্সা মুখটা লাল লাল হয়ে উঠল।

আহা ভারী যেন একেবারে গাইয়ে!

স্বর্ণ তাড়াতাড়ি বলে উঠল, আহা, তোমায় কেউ গাইয়েদের আসরে গাইতে বলেছে বুঝি?

হাতের ছুঁচ-সুতোটাকে নামিয়ে রেখে বেণু পিসি ন্যাড়া হাত দুটো কোলের ওপর জড়ো করে গাইতে শুরু করলেন, 'অন্ধজনে দেহ আলো, মৃতজনে দেহ প্রাণ! ওহে করুণাসিন্ধু কর করুণা-কণা দান।'

হ্যাঁ, গলা খুবই মিষ্টি। বেশ সুরেলাও। কিন্তু এই গান শুতে চেয়েছিল নাকি দীপু? দীপুর মনে হল বেণু পিসি নামের মহিলাটি তার সঙ্গে অদ্ভুত একটা চাতুরী খেললেন।

এই গানটি শেষ হতেই মেজ পিসিই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বলে উঠলেন, আহা! এমন গলা, এমন গান, তা চব্বিশ ঘণ্টাই ভূতের খাটুনি খেটে মরা। থির হয়ে বসে দু দণ্ড শোনারও অবকাশ নেই। আর একটা গা বেণু।

এই সময় দীপু অলক্ষ্যে তার স্বর্ণদির গায়ে একটা সূক্ষ্ম চিমটি কাটল। যার অর্থ, সেই ভাল গানটা গাইতে বল না।

স্বর্ণও ওই চিমটির ভাষাতেই উত্তর দিল, সে এখানে চলবে না।

অতএব এখানে যা চলে তাই চলল।

দীপু বিহ্বল হয়ে দেখল এখন গান গাইবার সময় বেণু পিসির চোখ দুটি একদম নীচু, যেন নিজের হাতের আঙুলগুলো দেখছেন নিবিষ্ট হয়ে।

তা সেও দেখার মতই।

একেই কি চাঁপার কলির মত বলে?

আর হঠাৎ লক্ষ্য করল দীপু, বেণু পিসির চোখের কোলে জলের আভাস।

অনেক দিনের অনভ্যাসের পর গলা তুলতে ভিতরে যে আবেগ আর কম্পন উঠেছে এ তারই ফল, না ওনার ভিতরের দুঃখের আলোড়ন!

সেই ঈষৎ কম্পিত গলা থেকে তখন উচ্চারিত হচ্ছে—

'শুনেছে তোমার নাম অনাথ আতুর জন।
এসেছে তোমারি দ্বারে শূন্য করো না যেন।'

অর্থাৎ দীপুর সঙ্গে চাতুরী করবার উপযুক্ত গানের স্টক বেশ ভালই মজুত আছে বেণু পিসির।

এ গান শেষ হতেই মেজ পিসি একটা হাই তুলে বললেন, নে, এখন হাতের কাজ শেষ করে নে। সাড়ে তিনটে বাজল। কলে জল এসে গেছে অনেকক্ষণ। ক্ষেণু উঠে পড়, মুক্তকে বল জলখাবারের ঘরের উনুনে আঁচ দিতে। সিতুর কলেজ থেকে

ফেরার আগে কচুরি কটা ভেজে নিবি।

ক্ষেণু কে?

কে আর সেজ পিসি। ন' পিসি নামের যিনি এলাহাবাদে না কোথায় থাকেন তিনি হচ্ছেন গেণু। অর্থাৎ 'জ্ঞানপ্রভা'। ক্ষেণু 'ক্ষণপ্রভা'। আর বেণু? বেণু 'বনপ্রভা'।

কিন্তু সিতু? যার জন্যে জলখাবারের তোড়জোড়? সে? সে হচ্ছে পিসিদের ভাইপো সিতাংশু। স্বর্ণর দাদা।

দীপু দেখেছে এদের বাড়িতে দোকান থেকে খাবারটাবার কিনে আসে না। সব বাড়িতে তৈরী হয়। দীপুদের তো এর আগে জানাই ছিল না সিঙাড়া কচুরি রসগোল্লা পান্তুয়া আবার বাড়িতে তৈরী করা যায়।

মণিমালা আর দীপু একদিন তাদের মায়ের কাছে এই বার্তা শুনিয়ে একটু অভিযোগ প্রকাশ করায় দীপুর মা ভারী মুখে বলেছিলেন, করা আবার যাবে না কেন? দোকানে মানুষেই তো তৈরী করে। বাড়িতে পাঁচ সাতটা মেয়েমানুষ—সারাদিন করবেটা কী? একখানা বই কাগজ ছুঁতে দেখি না। সারাক্ষণ ওই সব অদরকারী কাজ নিয়ে সময় কাটানো।

অর্থাৎ দীপুর মা ওনাদের মহিমায় বিগলিত হননি।

সে যাক। সেদিনের মত আসর ভাঙল।

স্বর্ণ আর দীপু নীচের তলায় নেমে এল। আর স্বর্ণ নিজেই যেন দীপুর গায়ে সান্ত্বনার হাত বুলিয়ে বলল, কী করবে বল? বড়দের সামনে তো আর ঠাকুর-দেবতার গান ছাড়া গাওয়া চলে না। তো তোকে আর একদিন ঠিক শোনাবো অন্য ভাল গান। একবার যখন মেজ পিসির মত হয়েছে।

তারপর বলল, অনেক ভাল গান জানে বেণু পিসি। দেখ না, সেজকা আমায় শিখিয়ে মরে, আমি কচুপোড়া শিখি। আর ছোট পিসি নিজে নিজেই—

কারুর কাছে শেখেননি উনি?

কি জানি। শুনি না তো। তবে আমাদের ঠাকুর্দার নাকি কলের গানের শখ ছিল। সেই রেকর্ডই শুনেছেন হয়তো। ঠাকুর্দার তো কেবলই বদলী হতে হতো, কোথায় না কোথায় থাকতে হতো। হি হি, একবার না কি 'গাইবান্ধা' বলে একটা দেশে ছিলেন। হি হি, নামের কী ছিরি। 'গাইবান্ধা'। তো সেইখানেই নাকি ছেটে পিসির বিধরা হবার খবর এসেছিল। এক দু মাস আগেই কলকাতা থেকে বিয়ে দিয়ে ওখানে নিয়ে গিয়েছিলেন ঠাকুর্দা সবাইকে। আর —আমি তো তখন জন্মাইনি, শোনা কথা। ঠাকুর্দার সেই বাসায় নাকি খুব বড় ফুল-ফলের বাগান ছিল। আর ছোট পিসির না কি খুব গাছে চড়ার শখ ছিল।

গাছে চড়ার!

হ্যাঁ রে, হি হি—কোলের মেয়ে তো। খুব আহ্লাদী ছিলেন নাকি। তো একদিন দুপুরে বাগানে গিয়ে—

হঠাৎ ক্ষেণুর কণ্ঠস্বর শোনা গেল—অ স্বর্ণ! চুলটা বেঁধে যা। চিরুনি নিয়ে বসেছি।

হ্যাঁ। বিকেল হতেই চিরুনি নিয়ে বসা একটি বিশেষ কাজ ক্ষেণুর। দুই ভাজের চুল নিয়ে যত ইচ্ছে কসরৎ করে খোঁপা বানানো, ভাইঝির বেণী বন্ধন, এবং অতঃপর নিজেদের তিন বোনের চুলের জট ছাড়ানো।

ওনাদের আলাদা চিরুনি। বিধবার চিরুনি নাকি সধবাদের চুলে ঠেকাতে নেই।

যাক গে, নেই তো নেই।

জন্মে অবধিই তো দীপু ওই 'করতে নেই'-এর ফিরিস্তি শুনে আসছে। 'মেয়েমানুষের এ করতে নেই, তা করতে নেই' তো আছেই। আবার 'ছেলের মা'র এ করতে নেই, তা করতে নেই, সে করতে নেই। প্রতিপদেই শাসন 'ওতে ছেলের অকল্যাণ হবে'।

আবার বিধবাদের অন্য এক রকম শাসন। বিধবাদের হাতের রান্নাটি খাও সবাই চর্বচোষ্য করে, বিধবাদের হাতের সেবাটি নাও ষোল আনা, তাদের দিয়ে ছেলেমেয়ে মানুষ করিয়ে নাও, কোনো দোষ ঘটবার ভয় নেই। দোষ ঘটবে তাদের চিরুনিটা মাথায় ঠেকাতে, তাদের গামছাখানা গায়ে ঠেকাতে।

আশ্চর্য!

মরুক গে—আশ্চর্য হতে হতে দীপু ক্রমেই আশ্চর্য হওয়া ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু এখন কৌতূহল, উদগ্র। সেই একদিন দুপুরে কী ঘটল?

ও স্বর্ণদি, কী হয়েছিল সেদিন?

স্বর্ণ বলল, পরে বলব রে। মণি শ্বশুরবাড়ি চলে যাবে শুনলাম, কাল-পরশু একদিন যাব দেখা করতে। তখন বলব।

ও স্বর্ণদি. শেষটা একটু বলে দাও। নইলে আধ-কপালে ধরবে।

স্বর্ণ ভীতচক্ষে বলল, একবারের বেশী দুবার ডাকতে হলে রক্ষে নেই রে। একদিন ছোট খুড়ি বুঝি ছেলে কাঁদছিল, মাকে ছাড়ছিল না বলে তাড়াতাড়ি আসতে পারেনি, দুবার ডাকতে হয়েছিল। ও বাবা, কী দুর্গতি সেদিন ছোট খুড়ির। ছোটকাকে বলে দিয়ে বৌকে 'উচিত শিক্ষা' দেওয়াবার জন্যে এমন বকা খাওয়ালো!

দীপু কিছুতেই অবাক হবে না মনস্থ করেও অবাক হল। এদের দেখে দেখে দীপুর সর্বদাই মনে হয় এরা কী সুখী। কত বড় বাড়ি, কত ভাল ভাল আসবাবপত্রে সব সাজানো। কী খাওয়াদাওয়ার ঘটা। আর বাড়ির তিন কর্তা ভাই আর তিন বোন যখন মজলিশে বসেন, তখন হাসির আওয়াজে আকাশ ফাটে। আর তেমন মজলিশ যখন-তখনই। খেতে বসে তো কথাই নেই, অন্য অন্য সময়ও।

এদের বাড়ির কর্তারা টেবিলে খায়।

যেটা দীপুদের চোখে অভিনব। স্বর্ণ আর স্বর্ণর দাদাও যে টেবিলের শরিক। তবে বৌরা মাটিতে বসে। খাবার ঘরের সামনের দালানে। তাদের

সঙ্গে একটু দূরে ছোঁয়া বাঁচিয়ে পুরনো রাতদিনের ঝি মুক্ত বসে, তার কাঁসিভর্তি ভাত-তরকারি নিয়ে। মুক্তও বাড়ির গিন্নীদের একজন। অন্ততঃ বৌদের থেকে তার পদমর্যাদা বেশী এতে সন্দেহ নেই।

তবু ছোটকাকে দিয়ে 'বকা খাওয়ানো' শুনে দীপু যেন কেমন হয়ে গেল।

তবু দীপু নির্বেদের সঙ্গে বলল, তা বলে তোমায় বাবা বকবেন না। তুমি যা আদুরে। বল না ভাই একটুখানি সংক্ষেপে—

স্বর্ণ তাড়াতাড়ি বলে উঠল, ওই তো বললাম রে—ছোট পিসি ছিল একটি গেছো মেয়ে—

বেণু পিসি! মানে গাছে চড়তেন!

হ্যাঁ, তাই তো শুনি। বিয়ে হয়ে গেছে, তবু দুপুরবেলা বাগানে গিয়ে পেয়ারা গাছে চড়ে বসে আছে। আর বিয়ের পরও বিয়ের আগের ঘাগরাগুলো পরা চাই। ম্যাজিস্ট্রেটের মেয়ে, ছিল তো অনেক সব। ঠাকুর্দার সঙ্গে বেড়াতে যেত সাহেব-সুবোদের বাড়ি। কোন সাহেব নাকি ওনাকে একটা ভিক্টোরিয়া হাতা ফ্রক পরা মূর্তি দেখে বলেছিল ঠিক বালিকা ভিক্টোরিয়ার মত দেখতে। হুঃ! ভিক্টোরিয়া হলেন মহারাণী আর বনপ্রভা হলেন এই।

দীপু ভাবল, ভাবা যায় না।

তো উনি তো ভরদুপুরে গাছে চড়ে পেয়ারা পাড়ছে আর সেই সময় ঠাকুর্দার অফিসে টেলিগ্রাম এসেছে তাঁর ছোট জামাইটি একদিনের জ্বরে—

ইস্!

সেইতো। ঠাকুর্দা তো তখনি বাড়ি চলে এসেছেন। তো সেই সময় নাকি ওনাদের এক মাসি ওই গাইবান্ধায় বেড়াতে গেছলেন। তিনি খবরটি শুনেই দাপাতে দাপাতে আর চেঁচাতে চেঁচাতে বাগানে গিয়ে বলেছিলেন, ওরে লক্ষ্মী-ছাড়ি রাক্ষুসী শতেকখোয়ারি, এখন তুমি হনুমানের মতন গাছে চড়ে বসে আছো? এদিকে কপাল যে পুড়ল তোমার জন্মের শোধ।

স্বর্ণ একটু থেমে বলে, ছোট পিসির কাছেই শুনেছি বাবা, হেসে হেসে গল্প করেছে, ছোট পিসি নাকি শুনেই কপালে হাত বুলিয়ে বলেছিল, ধ্যেৎ! গাছের ওপর আগুন! নামাবার ফন্দী! তারপর তো ওনাকে মারতে মারতে টেনে নাবানো হল।

মারতে মারতে!

আহা সে না কি মনের দুঃখেই। ভগবানের ওপর রাগে মেয়েটাকেই—

হঠাৎ আর একটা ডাক—স্বর্ণ! কানে তুলো দিয়ে বসে আছিস না কি?

ওরে বাবা! সর্বনাশ!

বলে দুদ্দাড়িয়ে নীচে নেমে এল স্বর্ণ। দীপুও অবশ্য পিছু পিছু। দীপুকেও এখন পিটটান দিতে হল।

স্বর্ণর দাদার কলেজ থেকে ফেরার সময় হয়ে গেল। আর থাকলে মণিদির জেরার মুখে পড়তে হবে।

'এতক্ষণ ওবাড়িতে কী করছিলি?'

ভামি যে এমন কাণ্ড করবে তা কেউ ভাবতেও পারেনি। না তার শ্বশুর-বাড়ির লোক, না বা তার বাপের বাড়ির লোক। তাই দুটো বাড়িই স্তম্ভিত হয়ে গেছে। তবে সেই স্তম্ভিত অবস্থার মধ্যেও পরস্পর পরস্পরকে দোষারোপ করতে কসুর করছে না।

গুরুদীক্ষা নেবার পর থেকে তো ভামি বেশীর ভাগ শ্বশুরবাড়িতেই থাকতো। বাপের বাড়িতে নাকি আচার বিচারের অভাব, বাড়ি সর্বদা 'বৃথা, গালগল্প আড্ডা তাসপাশা খেলা। যাকে বলে অধ্যাত্মপথের প্রতিকূল অবস্থা।

বিচার-আচার অবশ্য ঠাকুমার গণ্ডিটুকুর মধ্যে খুব কট্টরই আছে, কিন্তু সে তো একেবারে সীমিত গণ্ডি। কাউকে ভাগ দেবার মত জায়গা কম। তাছাড়া ঠাকুমার গণ্ডিতেও অধ্যাত্ম-আলোচনার বালাই আছে নাকি? তিনি তো তাঁর অধ্যাত্মপথের সন্ধানে কেবল পথে পথেই ঘুরে বেড়ান। অর্থাৎ পবিত্র অধ্যাত্ম-হাওয়া নিজেই খেয়ে বেড়ান, সংসারে বহাবার চেষ্টা করেন না।

হ্যাঁ, বৌগুলোকে অবশ্য বারব্রত উপোস নিয়মের গাড্ডায় ফেলেন মাঝে মাঝে, মানতের বেড়াজালেও ফেলে বসেন যখন তখন। স্বামীপুত্রের কল্যাণের জন্যে কে আর তাতে বিব্রত হবে? আর হলে প্রকাশ করারই বা সাহস কোথা?

তা ভামির মারই তো এখন চলছিল—বড়ছেলের জ্বরবিকার বাবদ বাবা তারকনাথের নামে সোমবার, স্বামীর স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে মঙ্গলবার, গেরস্থের বাড়-বাড়ন্তর আশায় লক্ষ্মীবার অর্থাৎ বেস্পতিবার, বড়ঠাকুর গ্রহরাজের দৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষাকল্পে শনিবার এবং রবিবার নয়, মাসে একটা করে রবিবার কোলের ছেলেটার জন্যে। ছেলেটা কেমন যেন ন্যালাক্ষ্যাপা মত, মা রবিবার করলে তার মধ্যে রবির তেজ সংক্রামিত হয়।

এক একটি মানতের এক এক রকম আহার-বিধি। সেসব করেও চলেছেন বড় গিন্নী। তবে তাতে আধ্যাত্মিক উন্নতি কী হয় ভেবে দেখেননি বড় গিন্নী। শাশুড়ীর নির্দেশ অনুযায়ী সপ্তাহে পাঁচদিন কৃচ্ছ্রসাধনের পাট চালিয়ে যাচ্ছেন। মানতি পুজোটি দিয়ে দিতে পারলেই এ থেকে অব্যাহতি মেলে। কিন্তু সেই পুজোটি দিতে যাওয়াও তো সময় এবং সুবিধে সাপেক্ষ। সে-সব দেব-দেবীর মন্দির কোথায় না কোথায়। তা যাক, 'বার' করতে আর কষ্টটা কী?

তবে স্বামী-পুত্তুরের জন্যে যে আয়োজন মেয়ের জন্যে তো আর তা হয় না। কাজেই ভামি নামের মেয়েটার কল্যাণচিন্তায় তার মার কোনো দায় ছিল না। তার অকালবৈধব্য বুকে শেল হেনেছিল। কিন্তু তার আত্মোন্নতির বহর দেখে সে শেলও ক্রমে উৎপাটিত হয়ে আসছিল।

ভামি তার শ্বশুরবাড়িতেও প্রায় দেবীতুল্য হয়ে উঠেছিল। বাড়ির গুরু-জনরাও পর্যন্ত তাকে সমীহর দৃষ্টিতে দেখতেন। তার মুখে সদাই একটি অলৌকিক প্রসন্ন হাসি, তার ভাবভঙ্গী চলন-বলন সব কিছুতেই যেন একটি 'পরমপ্রাপ্তি'র পূর্ণতার ছাপ।

সেই ভামি হঠাৎ একদিন—মানে এক রাত্রে হঠাৎ গলায় দড়ির ফাঁস লাগিয়ে ঝুলে পড়ে দুলতে লাগল।

এ কী অভাবিত অবিশ্বাস্য ব্যাপার!

পরদিন গুরুপূর্ণিমা। সেই বাবদ বেশ কিছু আয়োজন হবার কথা। শ্বশুরবাড়ির সকলেরই তো একটু 'ঠাকুর-ঠাকুর' প্রবণতা। আর অবস্থার স্বচ্ছলতাও রয়েছে।

ঝুড়িভর্তি ফল আনা আছে, 'দেবী বৌমা.' হ্যাঁ শ্বশুর নাকি ওই নামেই উল্লেখ করতে শুরু করেছিলেন ইদানীং। ছেলের বৌয়ের সঙ্গে কথা তো নিয়ম নয়. উল্লেখ করতে বলতেন, আমার দেবী বৌমার ওপর ভার দাও. ঠিক সময় হয়ে যাবে। আমার দেবী বৌমার গুণের সিকির সিকিও যদি অন্য সকলের থাকতো, সংসারটা উদ্ধার হয়ে যেত।

তো নিশ্চিত জানা ছিল দেবী-বৌমাই ভোরবেলা উঠে সেই ফলের ঝুড়িকে নৈবেদ্যয় পরিণত করে রাখবেন।

গৃহদেবতার সেবা ব্যতীতও গুরুবাড়িতে যাবে একখানা বড় নৈবেদ্য। কুলগুরু তো কুলদেবতারই সামিল। তো গুরুবাড়িটি যে কাছেপিঠে এটিই মস্ত সুবিধে।

ঠাকুরঘরে আলাদা এক চ্যাঙাড়ি সন্দেশ আনানো আছে গুরুবাড়ির জন্যে। তো এই সব ব্যবস্থাই ভামির হাতে।

সেই ভামি. যার নাকি সেই রাত চারটেয় উঠে স্নান সেরে গরদের থান পরে পুজোর ঘরে এসে বঁটি পেতে বসার কথা, বেলা হয়ে সূর্যি উঠে গেল তার দেখা নেই।

অ্যাঁ! সে কী? নতুন বৌমা এখনো ওঠেনি? বল কী? কী ব্যাপার? অসুখবিসুখ করেনি তো?

করতেও পারে। কদিন ধরেই যেন শরীরে একটু বেজুত দেখছিলাম।

তা সেটা আর আশ্চর্য কী? অত কৃচ্ছ্রসাধন অত অনলস পরিশ্রম। অতবড় সংসারের প্রত্যেকটি মানুষ তার সেবার স্পর্শ পায়। দাসীদের কষ্ট লাঘব করতে তাদের করণীয় কাজগুলোও কত সময় করে রেখে দেয়। অনুযোগ করলে হাসে।

বন্ধ দরজায় প্রথম টোকা দিয়েছিল পুরনো দাসী ব্রজর মা। তখন টোকাটা টুকটাক।

বৌদিমণি, উঠেচো না কী? আজ তো আবার তোমার অনেক কাজ।

এতে কাজ হয়নি।

অতঃপর এসেছিল ছোট ননদ।

দুমদাম ধাক্কা।

অ ভালো বৌদি. এখনো ঘুমুচ্ছো কেন গো? শরীর খারাপ না কী?

হ্যাঁ, 'ভালো বৌদি'।

পতিহীন পতিগৃহে ভামির অনেক নাম। দেবী বৌমা. ভালো বৌদি, দয়ার সাগর বৌদিমণি, এমন অনেকগুলো।

অতঃপর ভয় পেয়ে স্বয়ং শাশুড়ী এসেছিলেন। কী জানি বাবা, জ্বরেটরে

বেহুঁশ হয়ে পড়ে নেই তো ? তো এমন বেহুঁশ হবে একটু সাড়া পর্যন্ত দিতে অক্ষম হবে ?

প্রথমে ধীরে, তারপর অধীরে করাঘাত এবং স্বরাঘাত করেও কোনো ফল না পেয়ে ছুটে গেছলেন কর্তার কাছে।

আর তারপর যা যা ঘটবার ঘটেছিল। অথবা ঘটাতে বাধ্য হতে হয়েছিল।

পুলিসে খবর না দিয়ে উপায় কি ? দরজা ভাঙবে কে ? নিজেরা ভাঙাভাঙির পর যদি দেখতে পান বৌ হার্টফেল করে পড়ে আছে, সেটা কী পরে বিশ্বাসযোগ্য হবে ?

তখনো অবশ্য 'কেরোসিন হত্যা' চালু হয়নি এবং শহরে-বাজারে শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবারে (বৌকে অন্যভাবে নির্যাতন করলেও) বৌ পোড়ানোর রেওয়াজ হয়নি। 'কেরোসিন প্রবর্তক' স্নেহলতা পণপ্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে গায়ে কেরোসিন ঢেলে জ্বালিয়ে কন্যাদায়গ্রস্ত বাপের সমস্যার সমাধান করে গেলেও পাঁচজনে পণপ্রথার বিরুদ্ধে যতটা না সোচ্চার হচ্ছিল, তার থেকে বেশী সোচ্চার হচ্ছিল এই ভয়ংকর দৃষ্টান্ত স্থাপনের পথিকৃৎ স্নেহলতার বিরুদ্ধে। তবু—

হ্যাঁ তবু—অকালবৈধব্যে পতিত তরুণী সুন্দরী পুত্রবধূর কোনো রকম আকস্মিক মৃত্যুর খবর পেলে জ্ঞাতিশত্রুরা কী ছেড়ে কথা কইবে ? তাছাড়া —বৌয়ের বাপের বাড়ি ?

পুলিসকে দিয়ে দরজা ভাঙানোই নিরাপদ। ওঃ ! আজ কী দিনে কী ?

সেই নিরাপত্তার জন্যেই পুলিস ডাকার কেলেংকারি।

ধাক্কার চোটে দরজার ভিতরের খিলটা ভেঙে পড়তেই দুটো কপাট দু-হাট হয়ে যাবে এটা জানা কথা, কিন্তু এটা কী জানার জগতে ছিল ঘরের মধ্যেকার দৃশ্যটি এমন ভয়াবহ হবে ? এনাদের শান্তশিষ্ট সভ্যভব্য বৌমাটি বিছানায় স্থির হয়ে (জ্বরের ঘোরেই হোক বা অন্য ভীষণ কিছুর ফলেই হোক) শুয়ে পড়ে থাকার বদলে লেপের আড়ার আংটা থেকে দোদুল্যমান অবস্থায় দাঁত খিঁচিয়ে আর জিভ ভেঙিয়ে ড্যাবড্যাবে চোখে তাকিয়ে থাকবে ?

সেখানে অতঃপর আরো কী ঘটেছিল তার বিশদ বিবরণ ভামির পিতৃকুলের জানার কথা নয়। তাদের ডেকে এই দৃশ্য দেখিয়ে ধিক্কার দেওয়া হয়েছিল, একটা নিরীহ ভদ্রবাড়িতে একখানা পাগল মেয়ে গছিয়ে দেবার অপরাধে।

পাগল ছাড়া আর কী ? প্রথম থেকেই তো মাথা খারাপের লক্ষণ দেখা গিয়েছে। এঁরা নাকি অতি ভদ্র তাই তার খেয়ালের গোড়ে গোড় দিয়ে এসেছেন এযাবৎ 'আহা' 'অভাগিনী বেচারী' বলে।

ভামির বাপ কাকা এমন নির্বোধ নয় যে, এই পরিস্থিতিতে বাদপ্রতিবাদ করে লোক হাসাবেন। বরং 'মাথা খারাপ' অপবাদটাই মেনে নেওয়া শ্রেয়। তাতে মান-সম্ভ্রমের কিছুটা বাঁচলেও বাঁচতে পারে।

অপরাধ হজম করে হেঁটমুণ্ডে ফিরে এসেছিলেন তাঁরা কোঁচার খুঁটে চোখ মুছতে মুছতে। তবে বাড়ি ফিরে ফেটে পড়েছিলেন বৈকি।

মেয়েটাকে ওরা খাটিয়ে খাটিয়ে আর কৃচ্ছ্রসাধন করিয়ে করিয়েই মেরে ফেলার

যোগাড় করেছিল, এতে আর সন্দেহের কী আছে? প্রত্যক্ষই তো দেখা গেছে। অভাগা নিরুপায় মেয়েটা অবশেষে আপন হাতেই সকল জ্বালা জুড়িয়েছে।

দীপুও এ খবর শুনলো বৈকি।

তবে স্পষ্টাস্পষ্টি তক্ষুনি নয়।

প্রথমটা ঘটনার আকস্মিকতায় ভামির পিতৃকুল শ্বশুরকুল দু'বাড়িই একটু এলোমেলো হয়ে পড়ায় লোক জানাজানি। তারপরই চলেছে সামলাবার চেষ্টা।

অতএব ফিসফিস গুজগুজ। এ ওকে বলছে চুপিচুপি, ও একে ওকে তাকে বলে বেড়াচ্ছে আরো চুপিচুপি।

অর্থাৎ গিন্নিদের ভাষায় বলা যায় 'ঢাকে ঢোলে কাঠি, উলু দিতে মানা।' তবে আক্ষেপের থেকে ধিক্কারের বহরটাই বেশী।

মরলি মরলি মুখপুড়ি, একটু বিষ যোগাড় করে মরতে পারলি না? ডাক্তারকে একটু হাত করে অনায়াসেই 'স্বাভাবিক মৃত্যু' বলে কাঁদতে কাঁদতে নিমতলা ঘাটে পুড়িয়ে আসা যেত। একবার পুড়িয়ে ফেললে তো আর কারুর ট্যাঁ ফোঁ করার উপায় থাকতো না।

তা নয়, মেয়ে বিশ্ব-জানাজানি করে জিভ বার করে মলেন।

দীপুর মায়ের কাছে এলেন ওর এক পিসির মেয়ে। তো সম্পর্কে ভাগ্নী হলে কি হবে সরস্বতীরই প্রায় কাছাকাছি বয়েস। আর এঁর কণ্ঠনিনাদ? ফিসফিসানিই দেয়াল ফুঁড়ে অন্য ঘরে পেঁৗছে যায়।

দীপুর কানেও পেঁৗছল।

কিন্তু দীপু আকাশ-পাতাল ভেবেও ঠিক অনুধাবন করতে পারল না, 'দু-দুটো প্রাণ খতম হল' মানে কী? 'দুটো প্রাণহত্যের পাতক' হলো কেন ভামিদি?

আর কাউকে খুন করেছে নাকি ভামিদি? ধ্যেৎ! কী বলতে কী বলছেন নন্দরাণীদি!···কেমন যেন কথাবার্তা ওনার—খাপছাড়া এলোমেলো। নচেৎ আত্মহত্যার সঙ্গে 'গুরুমা'র রোগে সেবা করতে যাওয়ার সম্পর্ক কী?···অথচ বলছেনও তো, দেওয়াল ভেদ করে এ ঘরে আসছেও তো কথাটা।

ভক্তিমতী পুণ্যবতী কন্যে পুণ্যির ছালা বাঁধতে 'গুরুমা'র বাড়ি গিয়ে গিয়ে দিনভোর পড়ে থাকতেন তেনার সেবা করতে। কবরেজী ওষুধের অনুপান নিয়ে হিমসিম খেতে। বাটা ঘষা ছ্যাঁচা রস করা, খলে মেড়ে মেড়ে খাওয়ানো— কত ফিরিস্তি। কেন? তাদের আর কেউ কোথাও ছিল না? শাশুড়ী বুড়িও তেমনি ন্যাকা। 'বৌ ভক্তিমতী!' ওরে আমার কে রে!

দীপু একসময় শুনতে পেল মায়ের একটু ক্লান্ত কণ্ঠ: ওসব কথা থাক নন্দ। যা হয়ে গেছে তা তো আর ফিরবে না!

নন্দ চুপ করলেন।

কিন্তু দীপুর মাথার মধ্যে তাঁর কথাগুলো পাক খেতে থাকে। দীপু কোনোটার সঙ্গে কোনোটার যোগসূত্র আবিষ্কার করতে পারে না। ইস, মণিদি

থাকলে কি দীপুর এমন দুরবস্থা হতো ? মণি এমনিতে খুব একটা প্রখর বুদ্ধিশালিনী নয়, তবু মণি এখন অনেক বুঝতে শিখেছে। ইসারা ইঙ্গিতে ঠারেঠোরে কথা ধরতে পারে।

নন্দাদির এসব উল্টোপাল্টার কথার মানে ধরতে পারতো বোধহয়।

ভামিদির জন্যে ভীষণ কষ্ট হতে থাকে দীপুর।

ভামিদির জন্যে কষ্ট হতে হতে দীপুর মনের মধ্যে জমে থাকা অথচ ভুলে থাকা কষ্টগুলো হঠাৎ একসঙ্গে ভিড় করে এসে ঠ্যালা মারতে থাকল দীপুকে।

ন'মামার মেয়ের বিয়েবাড়িতে অত আনন্দ-উৎসবের মাঝখানে ইন্দুর সেই ভয়াবহ মৃত্যু !

বড়দির আকস্মিক মৃত্যুর খবরের অজ্ঞতায় সেই অনুভূতি। বড়দির মেয়ের সেই 'মাসি'দের আদর আগ্রহ অনুনয় উপেক্ষা করে নিষ্ঠুরের মত বাপের সঙ্গে চলে যাওয়া। এবং মায়ের সেই দুর্বোধ্য নিষ্ঠুরতা !

জামাইয়ের অনুরোধে বিগলিত হওয়ার বদলে, কঠিন হয়ে থেকে মৃতা কন্যার সন্তানটিকে নিজের কাছে রাখবার অক্ষমতা প্রকাশ করে মেয়েটাকে তার সৎমায়ের সংসারে ঠেলে পাঠিয়ে দেওয়া।

এর সবগুলোই যেন এক-একটা শোকের মত। অন্ততঃ এখন তাই মনে হচ্ছে।

তো সেই কতদিন আগে তুষারদির অকস্মাৎ তাদের পাশের বাড়িটা ছেড়ে চলে যাওয়া। জীবনে আর তাকে দেখতে না পাওয়া।

সেও কি একটা শোকের মত নয় ?

দীপুর মনে হল এই বয়সেই এত সব দুঃখজনক ঘটনা জমে উঠেছে তার। তাহলে আরো অনেকদিন যারা বেঁচে আছে তাদের মধ্যেও তো কত কাই জমা হয়ে আছে। হয়তো বড়রা মাঝেমাঝেই যেসব উল্টোপাল্টা আচরণ করে বসে, তার অন্তরালে থাকে ওইসব ডাঁই করে জমে থাকা দুঃখগুলো।

এই তো দীপুই তো—একটু আগে নন্দাদি চলে যাওয়ার সময় দেখা করল না তার সঙ্গে, প্রণাম করল না।

ছাতে গিয়ে বসে থাকল।

নন্দাদি তার শানানো গলায় একবার ডাক দিল। অথবা ঠিক ডাক নয়, বলে উঠল, চললুম গো মেজমাসী ! কই, তোমার মেয়েরা কোথায় গেল ?

মেয়েরা অর্থে অবশ্য ফুলিও।

এখন মণি চলে যাবার পর থেকেই তো দীপু যেখানে ফুলি সেখানে।

ফুলিও ছাতে উঠে এসেছে। এবং ওই ডাকটা শুনতে পেয়ে মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসি চাপা দিয়েছে।

তার মানে শুনতে পেয়েও সাড়া না দেওয়ায় ফুলির নৈতিক অসমর্থন নেই।

ফুলি দীপুর পায়ে পায়ে ঘোরে। বাদে স্বর্ণদিদের বাড়িতে যাওয়ার কালে। ফুলি ওদের বাড়ি যাবার নামে সিঁটিয়ে ওঠে।

কারণ ? কারণ স্বর্ণদের বাড়ির সিঁড়ির উঁচু দেওয়ালে ওঠবার সময় যেটা

মুখোমুখি পড়ে যায়. সেই দেওয়ালে বাহার হিসেবে প্রকাণ্ড একটা মোষের মুণ্ডু সাঁটা আছে বিশাল দুখানা বাঁকানো শিঙ্ সমেত।

দেখলেই ফুলির বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়। মনে হয় এক্ষুনি শিঙ্ দুটো দেওয়াল থেকে নেমে এসে ফুলিকে গুঁতিয়ে দেবে।

আরে দূর, ও তো মরা মোষের কঙ্কাল।

তাতে কী! দৃশ্যটা কী ভয়ঙ্কর!

ফুলি সেই যে দেখে ভয় পেয়ে পালিয়ে এসেছিল, আর যায় না। এবং সতেজে বলে, সাজিয়ে রাখবার আর জিনিস নেই যেন পৃথিবীতে। তাও মোষের মুণ্ডু।

তবু তো দীপু তিনতলার সিঁড়ি পর্যন্ত যায়নি। সেখানে আবার সিঁড়ির দেওয়ালে বিস্তার করে সাজানো আছে চারখানা হাত-পা-ওলা পুরো একটা বাঘ-ছাল। তার আবার চোখের জায়গায় রীতিমত জ্বলজ্বলে ঝকঝকে একজোড়া কাঁচের গুলি। দেখলে দীপুরও রক্ত হিম-হিম হয় বাবা একটু। কোনোমতে চোখ নামিয়ে চারতলার ছাতের খেলাঘরে উঠে যাওয়া।

মোষের মুণ্ডুর চোখের জায়গায় দুটো গহ্বর।

কোন্‌টা বেশী ভয়ঙ্কর তা জানে না দীপু।

কোন্‌টাই বা ভয়ের নয়!

তবু ও-বাড়িটা দীপুকে যেন শতবাহু দিয়ে টানে।

তার কারণটা কি স্বর্ণদির ছোটপিসীর সেই বইয়ের আলমারিটি? যেটা না কি একান্তই তার নিজস্ব। ভাল করে বাঁধানো যত ছোটদের পত্রিকায় ভর্তি সেই আলমারির তাকগুলো 'মুকুল' 'সখা' 'সখা ও সাথী' 'বালক'। আরও কিছু বই। মেয়ের অকালবৈধব্যে তার বাবা মেয়ের জন্যে এসবের গ্রাহক হয়েছিলেন। তবে বদলির দাপটে সব সময় বই ঠিকমত পৌঁছতো না।

সরস্বতী যে বলেন, ওদের কেউ একখানা বইয়ের পাতা ওল্টায় না, সেটা এখন হয়তো প্রযোজ্য, তবে আগে যে ওল্টাতো, ওই চাবিবন্ধ আলমারিটিই তার প্রমাণ।

স্বর্ণর অন্য পিসীদের মতে, বিধবা মানুষ রামায়ণ মহাভারত ছাড়া অন্য বই পড়ছে দেখলে লোকে নিন্দে করবে। অন্য বই মানেই তো নাটক নভেল!

নন্দদি চলে যাওয়ার সাড়া পাবার পর দীপু হঠাৎ বলে উঠল, স্বর্ণদিদের বাড়ি যাবি ফুলি?

ফুলি বলল, ওরে বাবা!

চল্ না বাবা। মোষে তোকে-কামড়াতে আসবে না। চল্ না।

ফুলি বলল, স্বর্ণদির বাড়ি যেতে আমার বিচ্ছিরি লাগে। তোমার এত ভাল লাগে কেন দীপুদি?

কেন লাগে তা দীপু নিজেও জানে না। তবু লাগে ভাল।

দীপু জোর দিয়ে বলল, বিচ্ছিরিটা কিসে রে?

কী জানি বাবা। ভাল না লাগলে কী করব? স্বর্ণদির পিসীরা যে কেমন করে তাকান!

আহা! ছোটপিসীও?

না, না। ছোটপিসী বেশ ভাল। আর ঐ মোষের মুণ্ডু! বাবা!

তুই যেন কী! মনটা খারাপ লাগছিল, মণিদিও নেই। ভাবলাম স্বর্ণদিদের বাড়ি গিয়ে একটু বসিগে। স্বর্ণদি তো সব সময় বলে, আয় না, রেকর্ড বাজাবো।

তুমি যাও না।

নাঃ। তুই যেতিস তো বলা যেত ফুলি গ্রামোফোন শুনবে। গান শুনলে মন ভাল হয়, জানিস।

এই প্রসঙ্গর মাঝখানে ফুলি আচমকা স্বর নামিয়ে বলে ওঠে, জানো দীপুদি, ভামিদির না পেটে ইয়ে ছেলে ছিল!

কী? কী বললি?

ফুলি ভয়ে কাঠ হয়ে বলে, আমি জানি না, আমি জানি না। নন্দদি মাকে বলল। তো মা রেগে গিয়ে বললেন, চুপ করো নন্দরাণী। দীপুদি, রাগ করলে?

ফুলির গলায় চাপা আর্তনাদের সুর। ফুলি ভয়ে কাঠ হয়ে গেছে। কারণ দীপুও কাঠ হয়ে গেছে।

দীপুর চোখের সামনে থেকে একটা দোদুল্যমান অন্ধকারের যবনিকা সরে গিয়ে সব কিছু স্পষ্ট করে দিয়েছে। দীপুর পায়ের তলার মাটিটা সরে সরে যাচ্ছে। দীপু একটা গহ্বরে তলিয়ে যাবে নাকি?

ফুলিকে 'ছেলেমানুষ' ভেবে নন্দরাণী শেষ অবধি গোপন রহস্য ফাঁস করতে দ্বিধা করেননি তাঁর সামনে।

যেমন করে থাকেন 'অভিজ্ঞ' বয়স্করা।

ও ছেলেমানুষ, ও আর কী বুঝবে?

অথচ কত ছেলেমানুষও যে কত কী বুঝে ফেলে।···আর সেই 'বুঝে ফেলা'টা তাকে অনবরত তাড়া করে ফেরে। আর বোধের জগৎ উন্মেষ হতে না হতেই তার সব বোঝা হয়ে যায়।

দীপুর চোখের সামনে থেকে অন্ধকারের যে পর্দাটা এখন সরে গেল, ফুলির চোখের সামনে থেকে তা আর দুদিন পরেই সরে যাবে।

তবে এখন ফুলি দীপুকে অমন কাঠ পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ভয় পায় দীপুদি তার ওপরই ক্রুদ্ধ হয়েছে।

পশ্চিমের আকাশে এখন পড়ন্ত বেলার সূর্য। 'কনে দেখা বেলা' সৃষ্টি করে পৃথিবীর ওপর সোনার আলো ছড়াচ্ছে। আকাশে পাখিরা ঘরে ফেরবার তাগিদে হুড়াহুড়ি করছে। এই খোলা হাতে দাঁড়িয়ে মনে হবার নয়, পৃথিবীতে কোথাও কোনো মালিন্য আছে। অথচ—

ফুলি কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে, চল দীপুদি, স্বর্ণদির বাড়িই চল।

দীপু আস্তে বলে, থাকগে, এখন আর ইচ্ছে করছে না।

তবে নীচে চলো। এখুনি তো সন্ধ্যে হয়ে যাবে।

যাক না।

ফুলি এদিক ওদিক তাকিয়ে বলে, না বাবা, বামুনদি বলেন, ভরসন্ধ্যেবেলা ছাতে বেড়ালে ভূতে পায়।

ফুলির মধ্যেও এখন নানা প্রশ্ন।

নন্দদির বলার ভঙ্গীতে মনে হল, ভামিদির ঘটনাটা খুব গর্হিত। কিন্তু কেন? ভামিদির তো বিয়ে হয়েছিল। তবে ছেলেমেয়ে হবে না কেন?

কী রে দীপু! অনেক দিন আর আসিস না যে?

ছোটপিসী তাঁর মাখন-মসৃণ করতল দীপুর হাতের ওপর একটু ছুঁইয়ে বলেন, আয়, বই নিবি? চাবিটা খুঁজে পেয়েছি।

এর আগে একদিন ছোটপিসী বলে ফেলেছিলেন, 'বই নিবি দীপু?' সঙ্গে সঙ্গে ছোটপিসীর মেজদি বলে উঠেছিলেন, ওমা, তোর বইয়ের আলমারির চাবিটা তো হারিয়ে বসে আছি।

ছোটপিসী একটু থতমত খেয়ে বলেছিলেন, ওহো, তাই তো!

দীপুর মনে হয়েছিল ওই চাবি হারিয়ে যাওয়াটা বোধ হয় রহস্যময়। আজ আবার উনি নিজে থেকেই বললেন।

কোন্ ভরসায়?

সেজদি বাড়ি নেই? না তাঁর হৃদয়ের পরিবর্তন? শেষেরটি হওয়াই সম্ভব। কারণ ছোটপিসী যে লুকোচুরির পথে যাবেন এমন মনে হয় না।

একতলার একটা স্যাঁতসেঁতে ঈষৎ অন্ধকারমত ঘরে ছোটপিসীর বইয়ের আলমারি। এই ঘরের মধ্যে নাকি ওনার বিবাহকালীন দানসামগ্রীর কিছু কিছু জিনিসপত্র রক্ষিত আছে। যেমন একখানা ছত্রী খুলে রাখা পালঙ্ক, যার ওপর ডাঁই করে রাখা আছে বাড়ির সব বাতিল বা বাড়তি বিছানা।

একটা কাঠের সেলফে কতকগুলো মাটির পুতুল, যারা একসময় হয়তো দামী আর সুন্দর ছিল। এসব বিয়ের সময় পাওয়া, আর আছে একটা মস্ত তোরঙ্গ। তার মধ্যে কী আছে স্বর্ণও জানে না।

ঘরে বসবার মত কোনো জায়গা নেই।

বইয়ের আলমারিটা খুলে দিয়ে ছোটপিসী বললেন, স্বর্ণ, তোর পড়ালেখার ঘরে দীপুকে নিয়ে যা। ওখানে বসে পড়েই আবার বাড়ি ফেরার আগে আলমারিতে পুরে চাবি লাগিয়ে দিতে বলিস। কেমন দীপু? এ ঘরে তো বসবার জায়গা নেই।

নেই তাই বাঁচোয়া।

দীপু মনে মনে বলে, থাকলেই যেন এখানে অনেকক্ষণ বসে থেকে মনস্থির করে পড়া যেত। বাবা ঘরটা যেন ভূতুড়ে!

ওই যে বিয়ের তত্ত্ব পাওয়া পুতুল! এই শুনেই দীপুর গা ছমছম করে উঠেছিল। যে বিয়েটা হতে না হতেই 'শেষ' হয়ে গেছে, তার এই তুচ্ছ স্মৃতি-গুলোই যেন একটা 'অকাল মৃত্যুর' সাক্ষী হয়ে বসে রয়েছে।

স্বর্ণর পড়ালেখার জন্যে দোতলায় উঠতে সিঁড়ির মাঝামাঝি নীচু ছাতওলা

ছোট্ট ঘর আছে। এর একটা জানলা রয়েছে রাস্তার দিকে। আলো আসে খুব।

একখণ্ড বাঁধানো 'মুকুল' নিয়ে জানলার ধারের চৌকিটায় বসল দীপু।

স্বর্ণও বসল টেবিলের কাছে নিজের স্কুলের পড়া নিয়ে। কিন্তু স্বর্ণর মনে উসখুসুনি।

এর থেকে দুদান লুডো খেললেও হতো। বেড়াতে এসে আবার বই মুখে নিয়ে বসে থাকা কী? তবে মুশকিল এই—বাড়ি নিয়ে গিয়ে পড়তে পারবে না। ছোটপিসীর আলমারির বইদের নাকি বাড়ির বাইরে বেরোবার উপায় নেই। ছোটপিসীর বাবার অর্থাৎ স্বর্ণর পরলোকগত (যাঁকে স্বর্ণ দেখেনি) ঠাকুরদার বারণ। কবে নাকি পিসীর এক পাড়ার বন্ধু বই নিয়ে গিয়ে হারিয়ে দিয়েছিল, আবার বলেছিল, ভারী তো একটা বই, তোর তো পড়াই হয়ে গেছে, হারিয়ে যাওয়ায় এত আক্ষেপ! আচ্ছা বাবা আর একটা না হয় কিনে দেব।

কোনো পুরনো এবং বাঁধানো পত্রিকা যে ইচ্ছে করলেই কিনে দেওয়া যায় না, সে জ্ঞান অবশ্যই বান্ধবীর ছিল না। এবং সত্যি দেবে, তা ভাবেও নি। রাগের মাথায় কথার কথা।

তবে বান্ধবী নাকি তদবধি বেড়াতে আসা বন্ধ করে দিয়েছিল।

আর পিসীর বাবা কাউকে বই নিয়ে যেতে দেওয়া বন্ধ করেছিলেন।

অতএব এই অবস্থা।

দীপুও বাবা এক অদ্ভুত মেয়ে!

বই দেখল তো মূর্ছা গেল।

মণিটা এমন নয়। আসলে স্বর্ণ তো মণিরই সমবয়সী; মণির সঙ্গেই তার ভাব হয়েছিল বেশি। কিন্তু এ বাড়িতে আসার কিছু পরেই তো মণি বিয়ে হয়ে শ্বশুরবাড়ি চলে গেল। আবার ছেলের মাও হয়ে বসল।

স্বর্ণকে এখন বিয়ে দেওয়া হবে না। ওর কাকাদের মত একটা 'পাস' করিয়ে তবে বিয়ে। শ্বশুরবাড়িতে তো আর পড়া হবে না। গানও হবে না। সেটাও তো এগোচ্ছে একটু।

একটু পরে স্বর্ণ বলে উঠল, আমি একদিন তোদের বাড়ি গিয়ে ক্যারাম খেলা শিখব।

যাবে?

দীপু কৃতার্থমন্য হয়ে বলল, আজই চল না। আজ তোমার ছুটি।

না, বাবা। তোর আবার বইটা শেষ হবে না।

আহা না-হয় কাল আবার এসে শেষ করব।

চল না স্বর্ণদি। দুপুরবেলাই তো বেশ সুবিধে। শেখা আর কী হাতী ঘোড়া। একবার খেললেই শিখে যাওয়া যায়। আসলে হাতের টিপটাই আসল।

দীপুর এই আসল জিনিসটি ভাল আছে বলেই দীপুর দাদাদের খেলার আসরে প্রবেশাধিকার আছে।

যদিও দীপুর পিতৃকুলের কোনো এক মহিলা ওই খেলা দৃশ্য দেখে চোখ কপালে তুলে বলেছিলেন, চোদ্দ বছরে পা দেওয়া মেয়ে, বৈঠকখানা ঘরে দাদাদের

আড্ডায় ইংরিজি খেলা খেলছে ! ধন্যি বাবা !

ইংরিজি খেলা ! শুনে তো দীপু ফুলি হেসেই খুন।

শুনে সরস্বতী অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

বলেছিলেন, 'আড্ডা' আবার কী নতুনদি ? খেলতে পারে তাই দাদারা দলে নিয়েছে।

ওর মধ্যে তো ভাইদের বন্ধুমন্ধুও রয়েছে বাবা।

মা হেসে ফেলেছিলেন।

'মন্ধু' নয়, বন্ধুই। সেও তো কোন বাল্যকাল থেকে চেনাজানা বা পুরনো বাড়ির পাশের বাড়ির ছেলে।

কিন্তু ওসব যুক্তিতে কি আর নতুনদিদের টলানো যায় ? 'ছেলে' শব্দটাই যে বিপজ্জনক।

দীপু বলল,তবে চলো। বইটা রেখে আসি। তুমি ততক্ষণ পিসীদের বলে নাও।

তা বলে নিতে হবে বৈকি।

হলেও প্রায় এক দেয়ালের বাড়ি, আর রান্নাঘরের পাশের দরজাটা খুলেই ওদের দরজার কাছে পৌঁছনো যায়।

দীপু সেই ছায়া-ছায়া ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা ঘরটায় এসে ঢুকে তাড়াতাড়ি 'মুকুল'খানা আলমারিতে পুরে দিয়ে চাবি লাগিয়ে ঘুরে দাঁড়াতেই হিম হয়ে গেল।

কেন ?

এই ভুতুড়ে ঘরে কি হঠাৎ ভূত দেখল দীপু ?

একালের তরুণীরা সেকালের সেই সব ভীত কম্পিত 'তরুণী'দের দেখলে যে কী বলতো। হেসেই অস্থির হতো নিশ্চয়।

এই দীপুর 'ভূত দেখার' মত রক্তহিম হয়ে যাওয়া অনুভূতির কথা শুনলে গায়ে ধুলো দিতো সন্দেহ নেই।

তবে সুবিধে এই—'একাল' কখনো 'সেকাল'কে মুখোমুখি দেখবার সুযোগ পায় না। যা জানে যা দেখে তা কাগজেপত্রে গল্পে কাব্যে।

'সেকাল' কিন্তু একালটিকে ভালই দেখতে পায়। প্রত্যক্ষ মুখোমুখি। কী অভিমত পোষণ করে, সে কথা না হয় থাক। তবে এটুকু মনে রাখতে হবে, দীপুদের ছেলেবেলার আমলে 'তরুণী' শব্দটি তেমন চালু হয়নি। তখন নবীনা নায়িকাকে বলা হতো 'বালিকা' 'কিশোরী' নবোদ্ভিন্না যুবতী। এবং যুবতীদের আবার দু' একটা ভাগ যেমন সদ্যযুবতী, পূর্ণযুবতী, পরিণতযৌবনা যুবতী।

তরুণী ? বড় একটা বলা হতো না।

দীপুকে অবশ্যই কিশোরীর পর্যায়ে ফেলা যায় তখনো। দীপু তো তখনো পনেরো বছরটা পার করেও বসেনি।

অতএব 'স্থান কাল পাত্র' হিসেবে ওই ছায়া-ছায়া ঘরে একটি সহাস্যমুখ উজ্জ্বল মূর্তিকে দেখে দীপুর মনে হলো ভূত দেখেছে।

আশ্চর্য ! সেই মূর্তিটাও ঠিক ওই কথাই বলে উঠল।

কী হল ? অমন চমকে গেলে যে ? ভূত দেখলে নাকি ?

দীপু অবশ্যই নীরব।

বই নেওয়া হয়েছে ?

দীপু বাক্‌শক্তিরহিত।

কী ব্যাপার ! কথাই বলছ না যে ? সেজপিসী বুঝি বাড়ি নেই ? তাই ছোটপিসী বইয়ের আলমারির চাবি খুঁজে পেয়েছে ?

হেসে ওঠে বেশ শব্দ করে।

সেজপিসীর ভয়ে ছোটপিসীকে সব সময় বইয়ের আলমারির চাবি হারিয়ে বসে থাকতে হয়। মুশকিলটা দেখো ! এটা সেজপিসীকে বোঝাতে যাবে কে যে, বই জিনিসটা পড়বার জিনিস, খাবার জিনিস নয়। পড়লে ফুরিয়েও যাবে না কমেও যাবে না। তা বোঝাতে যাবারই বা কার সাহস ? অ্যাঁ, কী বল ? কে সাহস করে বাঘের গুহায় ঢুকতে যায় ?

হা হা হা।

দীপুর মন থেকে পাথর নেমে গেছে। বরফ গলতে শুরু করেছে।

দীপুও হেসে ফেলে।

স্বর্ণর দাদা যে এত হাসিখুশী উজ্জ্বল তা এর আগে ঠিক জানতে পারেনি।

স্বর্ণর দাদা বলল, স্বর্ণ কোথায় ?

ওই যে সিঁড়ির ঘরে। পড়াশুনো করছে।

ইস্কুলের পড়া, তাই না ?

হুঁ।

গল্পের বই পড়ায় মোটেই মন নেই ওর।

স্বর্ণর দাদা গভীর গলায় বলে উঠল, অথচ আমি এত ভালবাসি। কাব্য সাহিত্য এরাই মানুষের মনের খোরাক। ভাত ডাল খেয়ে শুধু পেট ভরানো যায়। কিন্তু মন ভরাতে ?

হঠাৎ হাতের মধ্যে রাখা একখানা পাতলা চটি বই এগিয়ে ধরে বলল, পড়বে ? এইমাত্র কিনে আনলাম। সাবধানে তুলে রাখতে যাচ্ছিলান। পয়সা নষ্ট করে গল্পের বই কিনেছি দেখলে পিসী আস্ত রাখবে না। নিয়ে যাও। পড়া হলে ফেরত দিও, আরও বই দেব।

দীপু কি স্বপ্ন দেখছে ?

দীপু কষ্টে বলল, বা, আপনি এইমাত্র কিনে আনলেন। নতুন বই। আমায় পরে দেবেন।

আরে, আমার আর একটা আছে। নতুন একটা ব্যাপার হয়েছে। আট আনা সংস্করণ। প্রত্যেকটা বই আট আনা। এক টাকায় দুটো নিয়ে এলাম। একটা নিয়ে যাও। যারা বই পড়তে ভালবাসে তাদের আমার খুব ভাল লাগে।

হাতের বইটা ও এগিয়ে ধরল। বলল, আচ্ছা কোন্‌টা আগে পড়বে বল ?

দীপু তাকিয়ে দেখল।

যেখানা দীপুর হাতে চলে এসেছে, তার নাম 'অরক্ষণীয়া'। আর বইয়ের

মালিকের হাতে 'বিন্দুর ছেলে' !

দীপু বলল, এটাই থাক।

এ সময় স্বর্ণ চলে এল।

বলে উঠল, ওমা দাদা ! কখন এলি ?

এই তো। এখুনি। দুটো বই কিনে আনলাম।

আবার ! দাদা ! পিসিকে বলে দেব ?

দিতে ইচ্ছে হলে দিবি। আমি তো আমার হাত খরচের টাকা থেকেই কিনি বাবা ! অন্য ছেলেরা হোটেল থেকে চপ কাটলেট কিনে খায়, আমি না হয় তার বদলে বই কিনি। সংসারের কিছু লোকসান হয় তাতে ?

তোর সঙ্গে কে কথায় পারবে ? এই দীপুটা ঠিক তোর মতন। হি-হি-হি। বই পেলে খেতে ঘুমোতেও চায় না।···এই দাদা. কেটে পড়। সেজপিসি বোধ-হয় মাধো কাকাদের বাড়ি থেকে ফিরল।

শ্যামনগর থেকে ডেলিপ্যাসেঞ্জারী করা বাবুর সংখ্যা গোছা-গোছা।

পাড়ার প্রায় প্রত্যেকটি বাড়িরই তাই প্রায় এক ছাঁচ। শেষরাত্রে উনুনে আগুন পড়ে, বাড়ি বাড়ি থেকে ধোঁয়া বেরিয়ে এসে ভোরের আকাশকে ভারী করে তোলে।

আগের রাতে কুটনো বাটনা সব মজুত থাকে, মায় চালটি পর্যন্ত ধুয়ে ভিজে ন্যাকড়া চাপা দিয়ে রেখে দেওয়া হয়। এবং তেমন তাড়া থাকলে একটা কাঠের উনুনে কাঠ ঠেলে দিয়ে ভাতটা চড়িয়ে দেওয়া হয়।

তবে সব বাড়ির অফিস-যাওয়া বাবুর সংখ্যা মণির শ্বশুরবাড়ির মত নয়। মণির শ্বশুরবাড়ি থেকে ভোরবেলা পান চিবোতে চিবোতে আর পানের ডিবে টিফিন কৌটো পকেটে ফেলে অফিস যাত্রা করে মণির শ্বশুর খুড়শ্বশুর ভাসুর বর এবং একটা ভাগ্নে।

তার মানে একটি যজ্ঞি।

তাছাড়া বাড়িটা আবার বিলাসীর বাড়ি।

কর্তারা মৌজ করে খেতেও যত মজবুত, বাড়ির মহিলারাও তেমনি এতটুকু ত্রুটি হয়ে গেলে দুঃখের সাগরে ভাসেন !

বিশেষ করে মণির পিসশাশুড়ী।

কবে যেন একদিন সজনেফুল ভাজাটি দিতে ভুল হয়ে গিয়েছিল। সেই নিয়ে পিসশাশুড়ী সারাদিন আক্ষেপ করেছেন, গিন্নীবান্নী ভাজকে এবং ছোট ছোট দুটো ভাইপোবৌকে সারাদিন ধিক্কার দিয়েছেন, তাদেরই বা মনে পড়েনি কেন, এই অভিযোগে।

অতঃপর আবার বিকেলে সজনেগাছ ঝাড়া দিয়ে রাশীকৃত ফুল সংগ্রহ করে তাকে কড়াইশুঁটি মিশিয়ে সরষে-ফোড়ন দিয়ে ভেজে স্বস্তি পেয়েছিলেন, ওরা রাতে ভাত খাবার সময় খাবে।

হ্যাঁ, ভাত তো বটেই।

দুবেলাই ভাত।

ভাত ছাড়া আবার কোনো বিকল্প আছে নাকি!

ভোরের রান্নাঘরের ভারপ্রাপ্ত অফিসার দুই গিন্নী।

মণির শাশুড়ী আর পিসশাশুড়ী।

কারণ তাঁরাই ঝাড়া হাত-পা। ঝপ করে উঠে পড়তে পারেন, কুয়োতলায় গিয়ে পড়তে পারেন। কোলে কচিকাঁচা তো নেই!

তাছাড়া সকালের রান্নার পদও ভারী ধরনের।

পিসীর নিরামিষ ডিপার্টমেণ্ট।

যেখানে নিত্যই সুক্ত শাকেরঘণ্ট মোচারঘণ্ট কুমড়োডাঁটা-চচ্চড়ি, কচুর শাক পোস্তর বড়া ডালচাপড়ি ধোঁকার ডালনা—আরো কত কী। মণি বেচারী গুনেই উঠতে পারে না।

মণির বাপেরবাড়িতে এত সব হাবিজাবির পাটই ছিল না। যে রান্নার সময় নষ্টর প্রশ্ন, তা সে কুটতে বাটতে অথবা রাঁধতে, সরস্বতী তার দিকে নেই।

অতএব মণি জানতো না, ফাল্গুন থেকে নিমবেগুন ভাজা না খেতে পাওয়াটা একটা দারুণ লোকসান, কলমীর ঝোল একটা পরম পদার্থ জিনিস।

জানতো না এমন অনেক কিছুই মণি।

তবে জানছে ক্রমশই।

এখন ও নিজেই বলে উঠতে পারে, কুটনো কোটা তো শেষ করলে খুড়ীমা, পাঁজি দেখিয়েছিলে তেরোদশী কিনা?

তো গিন্নীরা বিবেচক।

তাঁরা ভোরের সময়কার সব দায়ভার নেন। এবং স্নানপুণ্য পুজোপাঠ সেরে এসে আবার একদফা লাগেন পরবর্তীজনেদের জন্যে।

অতঃপর অর্থাৎ মধ্যাহ্নভোজনের পর তাঁদের ছুটি। তারপর থেকে রাত পর্যন্ত ওই তিনটি রমণী। মণি, তার বড় জা আর খুড়শাশুড়ী।

সেও 'পালা' সাপেক্ষে। এসব পালার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন গিন্নীরাই।

খুড়শাশুড়ীর ভাগে জলখাবারের ভার।

বিকেলে ছেলেপুলে বৌ-ঝির জন্যে 'রোলার' আটায় তৈরি ধবধবে লকলকে রুটির গোছা বানাবার পর তিনি জম্পেস করে ময়ান দিয়ে মাখতে বসেন 'ফুল-ময়দার' তাল। মাথা থাকে, অফিসবাবুরা বাড়ি ফিরলেই তা থেকে মাথা পিছু চারখানা করে ফুলকো লুচি ভাজা হয় এবং বাকিটা রাত করে ছোট ছোট সাইজে মচমচে করে পরোটা ভোরের যাত্রীদের জন্যে, যার যার টিফিন-কৌটোয় ভরে রাখেন। তার সঙ্গে ভাজা ভাজা করে আলুছেঁচকি।

সন্ধ্যার জন্যে নতুন কোনো উপকরণ তৈরী করতে হয় না, সেও গিন্নীরা শেষ-বেলায় কিছু-না-কিছু বানিয়ে রাখেন।

লুচির জন্যে ফালা-ফালা বেগুনভাজা অথবা গোটা-গোটা আস্ত পটলভাজা। কি শীতের সময় ফুলকপির চচ্চড়ি। আর রুটির জন্যে এক কাঁসি কুমড়োর ঘ্যাঁট, নয় তো বা খানিকটা হাবিজাবির মিশেল চচ্চড়ি। তা তাই তো পড়তে পায় না।

অবশ্য আনুষঙ্গিক কিছুও আছে। থাকে মজুদে। যেমন আমের মোরব্বা, তেল-আম, কুলের আচার, ছড়া তেঁতুল এটা-সেটা। সারা বছরই তো ভগবান টক ফলের যোগান দিয়ে চলেছেন—কুল তেঁতুল আমড়া করমচা জলপাই কাঁচা আম। বুদ্ধি করে তাদের সময় অসময়ের জন্যে বোতলে বয়ামে ভরে রাখা।

তো সে বুদ্ধি এ সংসারে প্রভূত পরিমানেই আছে।

মণির শাশুড়ী তো আবার চালতাগুলো কেটে ছাড়িয়ে রোদে ঝুনো করে ঢেঁকিতে কুটিয়ে গুড়ের রসে পাক করে 'চালতাচুর' করে রাখেন।

ঢেঁকিটা বাড়িতে নেই বটে। কিন্তু চালতা গাছ যে গোটাতিনেক।

মণির জানা জগতের সঙ্গে এদের জগতের মিলমাত্র নেই। বিশেষ করে স্বরস্বতীর সংসারের সঙ্গে। তথাপি মণি আস্তে আস্তে এদের সঙ্গে মিশেও যাচ্ছে। এদের তালে তালও দিয়ে চলেছে।

মণিকে কি বেঁধে মারছে রাতদিন ?

তা কিন্তু মনে হয় না।

মণির মধ্যে এই সংসারের উপর গভীর একটি ভালবাসা জম্মে গেছে। ভালবাসার কেন্দ্রবিন্দুতে অবশ্য একটিই মানুষ। পোশাকী নাম তার যাই থাকুক, বাড়িতে সদাসর্বদা 'নাড়ু'।

পাড়ার ছেলেপুলেবাও এসে হাঁক পাড়ে 'নাড়ুদা'।

কিন্তু তাতে কী ?

নামেতে কী করে ?

গোলাপে যে নামে ডাকো—

মণির সমস্ত মন প্রাণ চিত্ত চিন্তা সেই নাড়ুকে ঘিরেই স্পন্দিত হয়। অনেক-জনের কথার মধ্যে সেই লোকটার গলার স্বর কানে এলেই মণির প্রাণের মধ্যে জলতরঙ্গ বেজে ওঠে।

অফিস ফেরার কালে যখন পাঁচ বাবু একসঙ্গে জুতো মসমসিয়ে বাড়ি ঢোকে, মণি রান্নাঘরের মধ্যে থেকেও টের পায় কোন্ পদধ্বনি বা জুতোর ধ্বনিটি কার।

সেই মহামুহূর্তে কোনো ছুতো করে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে পড়ে 'একটিবার' দেখবার ইচ্ছেটাকে দমন করতেই হয়। যে ছুতোই করো অন্যেরা ঠিক ধরে ফেলবে।

মণির যেদিন রান্নার পালা সেদিন তো রান্নাঘরে বন্দী হতেই হবে কিন্তু যেদিন পালা নয়, সেদিনও বড় জায়ের পায়ে পায়ে ঘুরতে হবে। কারণ সেটাই সৌষ্ঠব।

তা মণি শ্যামনগরের এই মজুমদার-গোষ্ঠীর: তালে তাল মিলিয়ে সৌষ্ঠব করেই চলতে শিখে গেছে। এবং মণি তাতে যে অসুখী তাও নয়। মণি তো এই রাঁধার পরে খাওয়া এবং খাওয়ার পরে রাঁধার আবর্তনেই আবর্তিত হয়ে চলছিল, হঠাৎ একদিন—

হ্যাঁ, একদিন এক অশনিপাত।

অন্ততঃ মণির তাই মনে হলো।

চা খেতে খেতে মণির খুড়শ্বশুর একটু শ্লেষমিশ্রিত গলায় বলে উঠলেন, আচ্ছা দিদি, নাড়ুর একটি বিবাহযোগ্য শালী আছে না ?

দিদি মানে অবশ্যই মণির পিসশাশুড়ী।

কর্তারা কথা বলতে হলে কদাচ নিজের গৃহিণীর দিকে তাকিয়ে নয়। গুরুজনের উপস্থিতিতে সে প্রশ্নই নেই। এমন কি 'দিদি' সামনে থাকতে বৌদির দিকে তাকিয়েও নয়। যখন যে কথাই হোক, অথবা যে আলোচনাই হোক, দিদিকে উদ্দেশ করে বলতে হবে এটাই সভ্য রীতি। সে রীতিতে অবিচল আছেন এ বাড়ির কর্তারা।

ছোটকর্তার প্রশ্ন শুনে মণির বুকটা আহ্লাদে উথলে উঠল। নিশ্চয় কোনো ভাল পাত্রের সন্ধান পেয়েছেন কাকা। আর বৌমার বোনটির কথা মনে এসেছে।

আনন্দের সঙ্গে কৃতজ্ঞতাও বোধ করে।

'দিদি' উত্তর দেন, নাড়ুর শালী ? তো একটি কেন, দুটিই তো রয়েছে বিয়ের যুগ্যি। একটি তো বলতে গেলে বিয়ের বয়েস পারই হতে চলেছে। আমাদের বৌমার সঙ্গে গায়ে গায়ে পিঠোপিঠি। তা কী? কোনো ভাল পাত্তরের সন্ধান পেয়েছিস নাকি ?

অর্থাৎ মণির সঙ্গে মণির পিসশাশুড়ীর চিন্তাধারার যতই ব্যবধান থাকুক, আপাতত একেবারে এক।

কিন্তু ছোটকর্তা সেদিক দিয়ে গেলেন না, বললেন, সেসব কিছু না। তো বৌমার বোনের নামটা কী ?

নাম ?

দিদি এদিক ওদিক তাকিয়ে বললেন, অ ছোটবৌমা, তোমার বোনের নাম কি ?

শুনে নিয়ে এদিকে তাকিয়ে বলেন, নাম হচ্ছে 'দীপমালা'। মণিমালার সঙ্গে মিলিয়ে।

ছোট খুড়শ্বশুর বললেন, হুঁ। ঠিকই বলেছে আমাদের অফিসের মৃত্যুঞ্জয়।

ওমা! তোদের অফিসের লোক আবার নাড়ুর শালীর বিষয় কী বললেন ?

ওই দীপমালা ম্যাগাজিনে 'আর্টিকেল' লিখেছেন গো দিদি।

দিদি হোঁচটা-খাওয়া গলায় বললেন, কিসে কী লিখেছে ?

ওই তো—পত্রিকায় গল্প লিখেছে। মৃত্যুঞ্জয়েরও তো একটু লেখাটেকা বাতিক আছে! তার লেখার সঙ্গে পাশাপাশি ওই দীপমালা দেবীরও লেখা বেরিয়েছে।

এমন ভঙ্গীতে বললেন খুড়শ্বশুর, যেন তাঁর অফিসের সহকর্মীর সঙ্গে পাশাপাশি বসে ফটোই তুলিয়েছে দীপমালা দেবী।

খবরটা ঠিক কোন্ পর্যায়ে পড়ছে বুঝতে না পেরে মণির শাশুড়ী আলগা গলায় উচ্চারণ করলেন, ওমা! সে আবার কী ? কই বৌমা তো কিছু—

বৌমা হয়তো জানেন না। তো নাড়ুও তো শুনে এল। কী রে নাড়ু, শুনিসনি ?

নাড়ুর তখন গেঞ্জির মধ্যে ঘামের স্রোত। ঘাড় কনে-বৌয়ের মত নত।

আর মণির ?

তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত একবার একটা বিদ্যুতের শিহরণ খেলে গিয়ে সব স্থির করে দিয়েছে।

কাকা খাবারের রেকাবি থেকে শেষ রসবড়াটি গালে পুরে রসালো গলায় বলেন, আমাদের বৌমাটিকে দেখে তো মনে হয় না ওর বাপেরবাড়িটি এমন আপটুডেট ! মেয়েরা এমন চালু !

নাড়ুর মা শঙ্কিত গলায় বলেন, ও ঠাকুরপো, দোষের কিছু লিখেছে নাকি ? সাহেবদের গালাগাল দিয়ে ?

আরে না না। সে কথা কে বলেছে ? লিখেছে এমনি নভেলি গল্প। যেমন ওই স্বর্ণকুমারী দেবী অনুরূপা দেবীটেবী লেখেন তেমনি ! তবে কথা হচ্ছে দেবেন ঠাকুরের মেয়ের বা ভুদেব মুখুয্যের নাতনীর পক্ষে যা শোভা পায়, তা কি আর তোমার আমার ঘরে শোভা পায় ?

হঠাৎ কোথায় যেন আর একটি ঘোমটার মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা যায়।

দিদি সেই দিকে তাকাল। তারপর বলে ওঠেন, তা হ্যাঁরে, তোর বৌ যে বলছে, শুধু ওঁরা কেন, আরো অনেক মেয়েমানুষই লেখে আজকাল। "প্রবাসী" না "ভারতবর্ষ" কী সব কাগজে ছাপা হয়ে বেরোয়।

ও। তা বলবেন বৈকি। ওই যে ঘরে আর এক পণ্ডিত মশাই আছেন। ঘরে বসে জগতের খবর রাখেন। তবে আমি বলে রাখছি, ওই মেয়ের বিয়ে দিতে নাড়ুর শ্বশুরকে বেগ পেতে হবে।

রেকাবিতে লেগে থাকা রসের ফোঁটাটুকু আঙুলের ডগায় তুলে তুলে চাটতে চাটতে বলেন, তোমাদের ছোট বৌকে বলে দাও দিদি, ওসবই বড়ঘরের কারবার। মৃত্যুঞ্জয় বলেছে আমায়। রামানন্দ চাটুয্যে না কে এক নামকরা লোক, তাঁর এক-জোড়া মেয়েও লেখে। তারা বি. এ. পাস করা মেয়ে। তায় আবার ব্রাহ্ম। তাদের সঙ্গে তুলনা করতে গেলে চলবে কেন ? তা যাকগে, আমার মতে বৌমাকে আর ঘন ঘন বাপেরবাড়ি পাঠানোর দরকার নেই। অন্য হাওয়া গায়ে বেশী না লাগানোই ভাল।

সভাস্থলে অবশ্য আরো বিদ্বজ্জন রয়েছেন। খোদ মণির শ্বশুরই তো রয়েছেন। রয়েছেন ভাসুর, ভাগ্নে। এবং নাড়ুও।

কিন্তু ছোটকর্তার মুখের ওপর প্রতিবাদ করে এমন বুকের পাটা কার আছে ?

স্বর্ণর সেজপিসি গালে হাত দিয়ে বললেন, অ স্বর্ণ, তোর দীপুর যে দেখছি 'গাছে না উঠতেই এক কাঁদি'। এখনো বিয়েই হল না, আই বুড়ো মেয়ে, এখনই বিধবার দুঃখে কাতর ? গপ্পো লেখবার আর বিষয় পেল না ?

দীপুর লেখা গল্প পত্রিকায় ছাপা হয়েছে এই আহ্লাদেই বোধহয় স্বর্ণ পাত্রা-পাত্র জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল, তাই সেজপিসিকে সামনে পেয়ে তাকেই দেখিয়ে-ছিল।

পিসি নামটা দেখে নিয়ে সন্দেহের গলায় বললেন, নিজে লিখেছে ? না

কোনোখান থেকে ঢুকেছে ?

ওমা ! ঢুকবে কী গো ? ঢুকলে কখনো ছাপতে পাঠাতো ?

অ। তা'—তা' পাঠাল কী করে ?

কেন ? ঠিকানা লিখে খামে পুরে বেশী করে ডাকটিকিট মেরে।

ও বাবা ! ঘরে বসে বসে এতো সব জানল শিখল কী করে ? তুই পড়েছিস ?

তা আবার পড়িনি ? হাতে পেয়েই।

কেমন লিখেছে ?

খুব ভাল পিসি। ঠিক লোকেরা যেমন বইতে লেখে তেমনি ! মনেই হচ্ছে না বাড়ির লোক লিখেছে। তাও আবার ওইটুকু একটা মেয়ে।

পিসি বলল, এমন কিছু 'টুকু' না ! বিয়ের বয়েস কবেই হয়ে গেছে।

বলেই বোধহয় মনে পড়ল স্বর্ণ দীপুর থেকে বয়সে বড়। তাই তাড়াতাড়ি বলেন, তোর থেকে আর কতই ছোট। তা কী নিয়ে লিখেছে ?

আর তারপরই উত্তর শুনে ঐ মন্তব্য।

স্বর্ণ ভয়ে ভয়ে বলে, ইয়ে বিধবাদের দুঃখ দেখেই—

সেজপিসি খরখরিয়ে বলেন, কেন ? বিধবাদের কী এত দুঃখু দেখলেন মেয়ে ! গয়না কাপড় জরি বারানসী না পরতে পেলেই জীবন বৃথা ?

স্বর্ণ এ প্রশ্নের উত্তর দিতে সাহস করে না। চুপ করে থাকে।

বইখানা দুপুরবেলা আমায় একবার দিস। পড়ে দেখব। কিসে ছাপা হয়েছে ?

ইয়ে—অর্চনায়।

ও।

তারপর রান্নাঘরের দিকে চলে যেতে যেতে বলেন, এখনকার মেয়েরা সব কী এঁচোড়ে পাকা হয়েছে। দীপুটিকে নিরীহ-নিরীহ মনে হতো। ভেতরে ভেতরে এতো ! বাবাঃ !

কিন্তু এইখানেই কি দীপুর লাঞ্ছনা থেমে থাকল ?

স্বর্ণদের বাড়িতে গুঞ্জন উঠল,—দীপু বেণুকে নিয়ে গল্প লিখেছে।

কেন নয় ?

দীপুর গল্পের নায়িকাও যে নেহাৎ বালিকা বয়সে বিধবা হয়েছে। আর খবরটা যখন পেয়েছিল তখন বনে বাগানে খেলে বেড়াচ্ছিল।

স্বর্ণর দাদা একসময় একা পেয়ে বলল, এই দীপু, অমন বোকার মত সোজা-সুজি লিখতে গেলে কেন ছোটপিসিকে নিয়ে ? একটু ঘুরিয়ে লিখতে হয়।

দীপু আরক্ত হল। উত্তেজিত হল।

বলল, মোটেই আমি বেণুপিসিকে নিয়ে লিখিনি।

সে কথা বললে তো হবে না। ছাপটা যে স্পষ্ট।

এখন দীপু সাহসিকা। বলল, ও গল্পের বিধবা অনুপমা তো ইচ্ছে করে বড়লোক বাপের বাড়ি থেকে সেই দুদিনের জন্যে দেখা গরীব শ্বশুরবাড়িতে থাকতে গেল।

অভিযোগকারী গলার স্বর নামিয়ে বলল, সেটাই তো আরো ভাবনার। যদি তোমার গল্প পড়ে কারো মনে তেমন দুর্মতি জাগে!

দীপুর সেই প্রথম দিকের আড়ষ্টতা অনেকটাই কেটে গেছে। বিশেষ করে বইয়ের সূত্রে। স্বর্ণর দাদা যে নতুন বই কিনে আগেই দীপুকে পড়তে দেয়, দীপু বই-পাগল বলে, এর জন্যে দীপুর কী কম কৃতজ্ঞতা?

আড়ষ্টতা নেই। দীপু তাই ঝটপট বলে উঠল, হ্যাঁ, তা আর নয়। ভারী লেখা তার আবার—আচ্ছা ঠিক আছে, আর লিখব না।

এই ধ্যেৎ! ছি ছি! লিখবে না কী বল? গল্প হিসেবে তো খুব ভালই হয়েছে। তোমার হাত আছে। শরৎবাবুর বই পড়ে পড়ে ভাষাটা—

একটু হাসল।

বলল, অবিশ্যি পড়ি তো আমিও। এক লাইনও লিখতে পারব?

আর তারপর একটু হেসে বলল, তার থেকে তুমি আমায় নিয়ে একটা গল্প লেখো।

আপনাকে নিয়ে? আপনার কিসের দুঃখু?

কেন? দুঃখ না থাকলে কি তার গল্পের নায়ক হওয়া সাজে না? সুখী নায়ক হয় না? সুখী হাসিখুশি—

কথা শেষ হবার আগেই স্বর্ণ এল হাঁপাতে হাঁপাতে, ওমা! দাদা তুই এখানে? আর ন'পিসি তোর জন্যে চন্দরপুলি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

চন্দরপুলি! তাই নাকি! সেটা আবার কখন জন্ম নিলো? হা হা! দেখছো তো দীপু কত সুখী?

ধাবিত হলো ন'পিসির উদ্দেশে।

ওকথা কেন বলল রে দাদা?

স্বর্ণ ভুরু কোঁচকালো, সুখীর কথা বলল কেন?

ওই তো—বলছিলেন দুঃখের গল্প না লিখে সুখী মানুষের কথা লিখতে।

তা সত্যি। ঠিক বলেছে। দুঃখের গল্প পড়লেই তো মন খারাপ।

দীপু খুব লজ্জার সঙ্গে আস্তে বলল, কী জানি আমার যেন মনে হয় দুঃখের গল্পই লোকে বেশী দিন মনে রাখে। দেখো রামায়ণ মহাভারত-এর কোন্‌টা সুখের, মানে সুখী মেয়ের গল্প বল? অথচ এতো এতো হাজার বছর ধরে লোকে পড়ে দুঃখু পায় আবার যেন সুখও পায়। না হলে পড়তো না। হাসছো?

না রে না হাসছি না। তুই বললি বলে হঠাৎ দেখছি তা সত্যিই তো বাবা। এই এখনকার কথাও তো ভাবলেও তো তাই। বিষবৃক্ষ কৃষ্ণকান্তর উইল এতো বিখ্যাত। তো তাদের মধ্যে কে বা সুখী? ঠিক বলেছিস।

তারপর স্বর্ণও আস্তে বলল, ছোটপিসির না তোর সঙ্গে একদিন চুপিচুপি দেখা করার খুবই ইচ্ছে, বুঝলি? কিন্তু যা পাহারা বাবাঃ! পুলিসের অধিক।

'পাহারা' সেটা বুঝতে আটকায় না দীপুর। দুই বিধবা দিদি যে তাঁদের বিধবা ছোট বোনটাকে প্রায় নজরবন্দী রাখেন তা অনুভব করে দীপু। অথচ

ত্রিসীমানায় 'পুরুষ' নামক ভৌতিকের কোনো প্রাণীর তো ছায়ামাত্রও নেই। বাদে দাদারা ভাইপোটা আর বাড়ির বহু পুরনো ভৃত্য দুজন।

তবে কীসের এত নজর রাখা?

আসলে, মেয়েদের অর্থাৎ মহিলাদের কাছেও এই বোকা আর ভাবুক-ভাবুক বোনটা কি জানি কার কাছে কী আলগা ভাবে কথা বলে বসে!

প্রতিবেশিনী বা আত্মীয়াকুলের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটলেই দুই দিদির একজন সর্বকর্ম পরিত্যাগ করে বেনুর ধারেকাছে থাকবেনই!

দীপুর মত তুচ্ছ প্রাণীটাকে প্রথম প্রথম অবশ্য তেমন গণ্য করেননি। কিন্তু এখন তাকেও গণ্য করতে শুরু করেছেন। যে মেয়ে রাতদিন নাটক নভেল পড়ে, আর তাই দেখাদেখি নিজেও কলম ধরার দুঃসাহস করে বসে, 'বিধাতার' দুঃখ বুঝতে বা বোঝাতে চায়, তাকে ভরসা কী?

অতএব বেণুপিসির সঙ্গে নিভৃতে দেখা হওয়া দীপুর ভাগ্যে কবে জুটবে কে জানে।

এক যদি গঙ্গাস্নান বা মন্দিরে-টন্দিরে যান। তা সেক্ষেত্রেও দুই পাহারাদারের একজন হয়তো থেকেই যাবেন। অথবা ছোট বোনকেও নিয়ে যাবেন সঙ্গে। বৈধব্য তো তিনজনকে একই বয়সী করে রেখেছে।

তা ওনারা যে শুধু বিধবা বোনকেই নজরবন্দী রাখেন তা তো নয়। এমন পক্ষপাতদুষ্ট নন ওনারা। সধবা ভাজেদের প্রতিও তাঁদের দৃষ্টি সর্বদা সজাগ। পাছে তারা স্বামীর সঙ্গে রাত্রে ছাড়া (সেটা নেহাৎ আটকাবার উপায় নেই বলেই) অন্য কোনো সময় চোখাচোখি মুখোমুখিটি হতে দেখলেই ঠিক সেই মহামুহূর্তে ননদিনীদের কারো না কারো কিছু না কিছু 'দরকারি কাজ' পড়ে যাবেই।

অথচ আবার বৌরা স্বামীপ্রভুর বাড়িতে উপস্থিতির ক্ষণে সাংসারিক কোনো কাজে হাত দিতে আসুক দিকি। রক্ষে থাকবে না। বৌদের বাবার বিয়ে দেখিয়ে ছাড়বেন।

বরের সামনে কাজ করতে আসা মানেই তো দেখাতে আসা, 'দ্যাখো গো খেটে খেটে আমার কী হাল! ননদরা পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে থাকেন, আর আমরা দুটো বৌ সংসার মাথায় করে রাখি!'

এহেন অভিসন্ধি নিজেদের মধ্যে আছে, এই শুনেই ভাজেরা পাথর বনে যায়। নিজের কোলের ছেলেটাকেও দুধ খাওয়ার সময় হলেও খাওয়াতে বসতে সাহস হয় না। তখন ঠাকুরঝিরাই কাপড় ছেড়ে তসর মটকা কিছু একটা পরে দুধের বাটি ঝিনুক নিয়ে বসেন।

ভাই বা দাদা যদি বলেন, এ কী, তুমি আবার এসব করতে বসেছ কেন? ওর মা কোথা গেল?

শিশুর সেই মায়ের প্রসঙ্গে ননদিনী অমায়িক হাস্যে বলেন, মায়ের কাছে খেলে তো? শুধু মা ভরসা করে ছেড়ে দিলে কচিকাঁচাগুলোকে আর চোখে দেখতে পেতিস না। বাতাসে উড়ত।

ভাইদের কাছে সরস গল্পর প্রধান বিষয়বস্তুই হচ্ছে তাদের বৌদের অক্ষমতা

অপারগতা আর অপদার্থতা। তা সে প্রতিটি ব্যাপারেই।

ভাঁড়ারঘরের আর নিরামিষ রান্নাঘরের পবিত্রতা হানির ভয়ে যে তাঁরা ভাজেদের সে-সব ঘরের চৌকাঠ মাড়াতে দেন না, সে কথা কে বরের কানে তুলতে যাবে? কার কটা মাথা আছে?

দৈবাৎ যদি ফাঁস হয়ে যায় সে রহস্য!

তাহলে? তাহলে গলায় ফাঁসি লাগিয়ে ঝুলে পড়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে বেচারাদের?

বৌদের সব সময় সেজেগুজে ফিটফাট হয়ে থাকতে হবে। নচেৎ রেহাই নেই!

শুধু বহিরাগতই নয়, বাড়ির লোকেরাও যদি একবার তেমন পারিপাট্যের অভাব দেখে ফেললে ধুন্ধুড়ি নেড়ে দেবেন না তাদের? এটা যে 'ফর-শো' সেটা বুঝিয়ে ছাড়া হবে না তাদের?

স্বর্ণর মার তো বয়েস কম হল না। অতবড় ছেলের মা। কিন্তু স্বামী-সন্তানের অসুখবিসুখেও সেবাযত্ন করতে যাবার অধিকার নেই তাঁদের। সাহসও নেই।

কারুর অসুখবিসুখ করলে ওনারা এমন করে সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে বুক দিয়ে সেবা করেন যে তার ফাঁকে আলপিনটিরও গলবার খাঁজ থাকে না।

বেণু এই ষড়যন্ত্রের শরিক নয়, কিন্তু অবোধ বেণুকে তো কাজে লাগানো হয়। তারও ধারণা হয়েছে, বৌদিরা কোনো কাজের নয়। তবে মাঝে মাঝে অবাকও হয়! অন্য সময় ন'দি সেজদি অনায়াসেই বেশ শক্ত শক্ত কাজ বৌদিদের ওপর চাপান এবং তেমন ভাল করে পেরে না উঠলে ধিক্কার দেন, অথচ এক এক সময় সামান্য কাজে হাত দিতে গেলে হাঁ হাঁ করে বারণ করেন, আহা-হা, তুমি আবার কেন?

এই যেমন সেদিন সিন্দুকে থাকা একরাশ পুজোর বাসন, তামা পেতল আর কিছু কিছু রুপোরও, বার করে দুই বৌকে বললেন মেজে সাফ করে রাখতে। পুরনো দাসী মানদা গেছে দেশে।

তো সেই সব কলংকপড়া পেতল তামার বাসনে একটু-আধটু দাগ থেকে গেছল বলে কত ব্যঙ্গ বিদ্রূপ বিরক্তি! এমন জানলে ওনারা নিজেরাই করে নিতেন। অথচ—হ্যাঁ, অথচ এই কাল না পরশু ছোট বৌদি ছেলের দুধের বাটিটা মেজে নিচ্ছিল দেখে সেজদি বলে উঠল, এই দ্যাখো! তুমি আবার ছাই মাটিতে হাত দিতে গেলে কেন ভাই? ফেলে রাখো না জমা বাসনের গাদায়। বিমলা মাজবে। তোমার ছেলের কি বাটির অভাব?

তা ছোড়দা শুনে হেসে বলল, তা ওইটুকুতে তোমাদের ছোট বৌয়ের হাত ক্ষয়ে যাবে নাকি?

সেজদি বলল, তা না যাক। বৌ ঝি ছাই মাটি হাতে মেখে বাসন মাজাঘষা করছে, এটা দেখতে পারি না।

আবার রোজই দেখে এঁচোড় কোটা, ডুমুর কোটা এসব বড় বৌদিরই ঘাড়ে। (তবে মোচা কদাচ নয়। তাতে নাকি বৌমানুষের আঙুলে যে কষ লাগে তা

দেখতে ভাল লাগে না সেজদির।) অথচ চট করে একটা লেবু কাটার দরকার হলে বড় বৌদি হাত বাড়ালেই সেজদি ন'দি বলে উঠবেন, আহা-হা, তোমার আবার তাড়াহুড়োর সময় বঁটিতে হাত দিতে যাওয়া কেন ? আঙুলটি কাটবে ?

অবশ্য উল্টোপাল্টা কথা ওনারা অনেক সময়ই বলেন। যে সব কথা সব সময় সত্যের কান ঘেঁষাও নয়। আগে বেণু বলে ফেলতো, ও কী সেজদি, ওকথা বললে কেন ? তা তো নয়।

সেজদি থাবাড়ি দিতেন, তুই থাম তো। ছেলেমানুষ ! কী বুঝিস আর কী না বুঝিস ঠিক নেই।

আবার কখনো হেসে বলতেন, সংসার করতে বসে অতো যুধিষ্ঠির হলে চলে না রে বাবা !

এখন আর বেণু তেমন বোকামি করে না। এবং এখন বোঝে কোন্ কথাটা ও'দের সামনে বলা চলে না।

তাই প্রতীক্ষায় আছে বেণু কবে সুযোগ পাবে, দীপুকে হৃদয়ের আবেগটুকু জানাতে। ইচ্ছে হচ্ছে দীপুর হাতটি ধরে বলবে, দীপু এইটুকু ছোট্ট মেয়ে তুমি, কী করে বুঝতে পারলে বিধবার মনের মধ্যে কী শূন্য ভাব। আর কখনো কখনো কী ঝড় বয়। তোমার গল্পের মেয়েটার মত সাহস যদি সকলের হতো ! আশ্চর্য ! কী করে তোমার মাথায় এল মেয়েটা বড় মানুষ, বাবার বাড়ি থেকে জোর করে চলে গেল তার অচেনা অদেখা গরীব শ্বশুরবাড়িতে !···তুমি আরো লেখো। অনেক লেখো। যে যা বলুক ছেড়ো না। সত্যিকারের লেখিকার মতন হয়ে যাবে হয়তো। 'মা' 'মন্ত্রশক্তি'র মত বই লিখবে !

আবার ভেবেছে কি জানি কেমন শ্বশুরবাড়ি হবে ওর। তারা যদি লিখতে না দেয় !

দীপুর নিজের বাড়িতে অবশ্য এই 'গল্পীয়' ঘটনায় তেমন কোনো আলোড়ন উঠল না।

দাদারা পড়লও না। বাবা বললেন, রাতদিন যার চাষ চলছে, তার ফসল ফলবে এর আর আশ্চর্য কী ?

শুধু মা বললেন, আমি চিরদিন ভেবেইছি, পারিনি। তবু আমার ছেলে মেয়েদের মধ্যে কেউও যদি পারে—

চুপ করে গেলেন।

কথা বলতে বলতে শেষ না করে চুপ করে যাওয়া এক অভ্যস্ত অভ্যাস সরস্বতীর।

নাড়ু নামের ব্যক্তিটি শুধু যে তার পরম পূজনীয় গুরুজনদের কাছেই নিরীহ গোবেচারা, বৌয়ের কাছেও প্রায় তাই। কিন্তু বৌটি গুরুজনেদের সামনে যেমন মুখচোরা ভালমানুষ বরের কাছে তেমনটি নয় মোটেই।

রাত্রে ঘরে এসে হ্যারিকেন লণ্ঠনের শিখাটা একটু কমিয়ে চোখের আড়াল করে

সরিয়ে বিছানায় বসে পড়ে বলে উঠল, সবাই মিলে যখন আমার বোনটাকে হেয় করছিল, তখন মুখে তালাচাবি এঁটে বসেছিলে যে ? এটুকু বলা যেত না, লেখা ছাপানো এত কী খারাপ কাজ ?

নাড়ু হতভম্ব হয়ে বলে, আমি বলতে যাব ?

কেন ? যাবে না কেন ? দোষটা কী ? বৌ তো আর নয়। বৌয়ের বোন। তাতেও লজ্জায় মাথা কাটা যাবে ?

নাড়ু ভাবেনি হাওয়া এত বিপরীত হবে। তার মানে নাড়ুর আজ আহ্লাদের বারোটা বেজে গেল।

সাবধানে বলল, আহা সেকথা নয়। গুরুজনেরা যেখানে বিরূপতা দেখাচ্ছেন, সেখানে আগ বাড়িয়ে তার বাদপ্রতিবাদ উচিত ?

তা তুমি তো আর বাড়ির বৌ নও ? বাড়ির ছেলে। নিজের বাড়িতে একটা ন্যায্য-অন্যায্য কথা বলতে পারবে না ?

নাড়ু একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলে, যতদিন বিয়ে হয়নি তখন বলতাম ! এখন আর সাহস হয় না।

মণি নামানো গলাতেই ঝঙ্কার দেয়, কেন ? বিয়ে হয়ে চোরদায়ে ধরা পড়েছো নাকি ? তাই সাহস হয়ে গেছে ?

বৌ ঝঙ্কার দেয়। তবু নাড়ু মুগ্ধ হয়, মোহিত হয়। 'কথার ধার' বড় আকর্ষণীয় জিনিস ! তাছাড়া নিজে যেটা পারে না, সেটার সম্পর্কেও একটা মোহ থাকে। নাড়ু পারে না এমন অবলীলায় ঝরঝরিয়ে ধারালো ঝাঁজালো কথা বলতে।

আসলে কথাটাই তো মানুষ ! 'কথা' বাদ দিলে তো মাটির পুতুল।

অবশ্য মণিমালা নামের মেয়েটা তার ওই মাটির পুতুল সদৃশ ভালমানুষ বরটিতেই বিভোর। তবে জোরালো-ধরালো কথাটথা বলা তার একরকম শখ। লীলাই বলা যায়। এই একটামাত্র মানুষই তো আছে সংসারে যাকে যা ইচ্ছে বলা যায়। বলে পার পাওয়া যায়।

নিজের ভাগ্যেও অভিভূত হয় মণি। ভাগ্যিস এমন বরটি জুটেছে তার ! ক'জনের এমন হয় ! দেখতে বা শুনতে তো পায় মেয়েগুলো বরের রাগের ভয়েই মরে।

নাড়ু বলল, কী জানি বাবা কীসে কী হয়। তো সত্যিই বলব, বিয়ে করে বাড়ি এসে ঢুকলাম, যেন অন্য কেউ। অকারণ অপরাধী অপরাধী ভাব। কারুর মুখের ওপর কিছু বলতে সাহস হয় না। তা বিশ্বাস করো, একা আমারই নয়, বন্ধুদেরও জিগ্যেস করে দেখেছি। তারাও ওই কথাই বলে। রমেন ? বাঁড়ুয্যে কাকার ভাগ্নে ? সেও বলল একদিন, বিয়ের পর থেকেই বাড়ির সবাই যেন কেমন 'পর পর' ভাব করতে শুরু করে দিয়েছে। যেন এখন আর আমি ওবাড়ির ছেলে নয়, বাড়ির বৌয়ের বর ! চিরকালই আমার খাওয়া নিয়ে একটু খুঁতখুঁতে আছে ভাই, রান্না ভাল না হলেই বলে বসি—বাজে হয়েছে ছাই হয়েছে। এখন আর সাহস হয় না। একদিন বলে ফেলেছিলাম, কী রান্নার ছিরি হচ্ছে আজকাল ? এমন ভাল রুই মাছটা—তো তোকে কী বলব ভাই সঙ্গে সঙ্গে মা বলে উঠল

কিনা, বুঝেছি—এখন আর আমার হাতের রান্না মুখে রুচবে না, তো বৌয়ের ক্ষ্যামতা থাকে তো কাল থেকে রান্নার ভারটা নিক।

একসঙ্গে এতগুলো কথা বলা নাড়ুর ধাত নয়, কিন্তু এখন নিজের সমর্থ নেই—

মণি একটু মুখ টিপে হেসে বলে, বুঝেছি। বৌ তো শ্বশুরবাড়িতে চিরকেলে চোর। তো বৌটাকে—একটু ভালবাসার দায়ে ছেলেটাও চোরদায়ে ধরা পড়ে যায়। আসল কথা আমাদের ছেলেটা একটা পরের মেয়েকে ভালবেসে বসল, এটা প্রাণে সয় না। অথচ ছেলের বিয়ে দেবার জন্যে মরাও চাই। রাজ্য উটকে সুন্দর মেয়েও খোঁজা চাই। কেন রে বাবা!

নাড়ু আর পারে না। হাত বাড়িয়ে বৌকে কাছে টেনে এনে বলে, ইস্! আমার মনের কথাগুলো কী করে বললে গো এমন ভাবে মনে হচ্ছে ইচ্ছে করলে তুমিও বোনের মতন লিখতে পারো।

মণি একটা নিঃশ্বাস চেপে বলে, সকলেরই কি আর সব ক্ষমতা থাকে! তবে সবাই মিলে আমার বোনটাকে হ্যানস্থা করা হল! যেন কী এক পাতক করেছে! এটি যদি তোমাদের নিজেদের বাড়ির মেয়ে হতো?

বাড়ির মেয়ে! নাড়ু ফস করে বলে ফেলে, আমাদের বাড়ির মেয়ে এ কাজ করতই না।

বলে ফেলেই অবশ্য ভুলটা বুঝে ফেলল।

কিন্তু আর উপায় কী! মুখের কথা আর হাতের ঢিল।

মণি বলল, তা সত্যি। এ বাড়ির মেয়েদের কাছে জীবনের সার সত্য হচ্ছে সারা দিন-রাত রান্নাঘরে পড়ে থাকা আর খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করা!

নাড়ু কী বলবে ভেবে না পেয়েই বোধ হয় বলে উঠল, তা সেটাই তো মেয়েমানুষের প্রধান ধর্ম! আমি বলব বিয়ের আগে এসব করা ঠিক হয়নি দীপুর। কী রকম শ্বশুরবাড়ি হবে কে বলতে পারে? তারা যদি পছন্দ না করে?

মণি নিশ্বাস ফেলে বলল, ওই তো। মেয়েদের তো ওই জ্বালা!

লোহার বাসরেও তক্ষক ঢুকে দংশায়, সাত দেউড়ি ডিঙিয়ে রাজকোষ থেকেও চুরি যায়। কাজেই একদিন বেণুর অভীষ্ট পূরণের সুযোগ ঘটে যায়। পাহারাদার দুই দিদিকেই কিছুক্ষণের জন্যে অন্যত্র যেতে হল কর্তব্যপালন করতে।

স্বর্ণর পিসিদের এক মেসো মরেছেন খবর এলো।

হাড়বুড়ো মেসো হাঁফকাশের রুগী! তা হোক, তবু মরণটাই একটা শোকের ব্যাপার। তার ওপর আবার একটা নড়বড়ে বুড়ী 'বিধবা'ও তো রেখে গেলেন। অতএব দুই বোন মড়াকান্না কাঁদতে কাঁদতে ছুটলেন মাসির বাড়ি।

ছোটাটা তো শুধু শোক জানাতেই নয়, কর্তব্য পালন করতেও বিধবা হয়ে পড়লেও মাসি নিজে নিজে তো আর বৈধব্য বেশ' ধারণ করতে পারে না? তার জন্যে কারো সাহায্য তো চাই? তো কে করবে সে সাহায্য?

এমন বাড়ি যে সাত গুষ্ঠি সব সধবা। তিন জা দুই ননদ এমন কি ভাইঝিটা ভাগ্নীটা পর্যন্ত। ষাটষষ্ঠি নিজের দুই ছেলের বৌও আছে। এ যাবৎকাল মানে

শাশুড়ী মরে পর্যন্ত বাড়িতে আলোচালের বোগনো বসে না। এক হেঁসেল বৈ দু হেঁসেলের পাট নেই।

তো এবার অবিশ্যি হবে সে পাট।

তা সে যাক।

সধবারা তো আর বুড়িকে গঙ্গায় নিয়ে গিয়ে মূর্তি বদল করে আনতে পারবে না। বলে সদ্য বিধবার মুখই দেখতে নেই এয়োস্ত্রী মেয়েদের। সদ্য বিধবা যখন নবরূপে ঘাট থেকে ফিরবেন তখন সদ্য কেনা কোরা থানের আঁচলে মুখ ঢেকে।

এসব বিধি ব্যবস্থা বেণুর সেজদি ন'দি যেমন নির্ভুল জানেন তেমন আর ক'জন জানে? ও'রা অন্তকাল এই কর্মই করে আসছেন।

স্বর্ণ এসে চুপি চুপি ডাক দিল, এই দীপু একটু আসবি? ছোটপিসি ডাকছে।

সেজপিসি ন'পিসি?

ওনারা বাড়ি নেই। ওনাদের মেসোমশাই মারা গেছেন—

মারা গেছেন! অ্যাঁ! ইস! আহা!

আরে সে একদম আশী-নব্বুই বছরের বুড়ো।

ওঃ।

দীপু মাকে বলে বেরিয়ে এল স্বর্ণর সঙ্গে।

স্বর্ণ বলল, তোদের বাড়িটা বেশ ভাই। অত পাহারা নেই।

দীপু মনে মনে হাসল।

পাহারা আবার নেই, খুবই আছে। তবে মায়ের মধ্যে সে ভাব ততটা নেই। তাছাড়া—স্বর্ণদের বাড়ি সম্পর্কে একটা সমীহ ভাব আছে। ওদের মেয়ে ডাকতে এল, 'যেও না' বলা ভাল দেখায়?

তাছাড়া বামুনদি বিদায় নিয়েছেন এই এক ভাগ্য দীপুর। এখন রান্নাঘরের ভারপ্রাপ্ত একটি টিকিধারী বেহারী বালক।

যা দেখে স্বর্ণপিসিরা হেসেই অস্থির। তোর মা কি রাঁধতে জানেই না রে দীপু? ওই পুঁচকেটার হাতে রান্নার ভার!

পুঁচকে হলে কী হবে, ও কিন্তু বেশ ভাল রাঁধে।

পিসিরা হেসেই কুটিকুটি।

'ভাল রান্না' কাকে বলে তা আর তোরা জানলি কবে? চিরকাল তো মাইনে করা লোকের হাতে হাঁড়ি।

হ্যাঁ। এ রকম অনায়াস-অবলীলায় ও'রা অপরকে হ্যানস্থা করতে পারেন।

বলার কিছু নেই।

একমাত্র পথ ওদের সংস্পর্শ ত্যাগ।

কিন্তু সে যে বড় শক্ত। বাড়িটা যে লক্ষ বাহু দিয়ে টানে।

বেণু বিনা ভূমিকায় বলে উঠল, আচ্ছা দীপু, তোমার গল্পের অনুপমার যদি শ্বশুরবাড়িটা গরীব না হয়ে খুব বড়লোক হতো? তাহলেও অনুপমা যেত?

দীপু একটু হেসে বলে, কী করে হবে? আমিই গরীব করেছি তো! ইচ্ছে

করে। বড়লোক হবে কী করে?

বেণু হাসল।

তোর ইচ্ছেতেই যখন সব। ভগবানের তুল্য অবস্থা।

আহা, ধর না হয় বড়লোকই করলি।...এই মা, 'তুই' বলে ফেললাম! হি হি। বললেই বা—

দীপু আহ্লাদে কৃতজ্ঞতায় বিগলিত হয়ে বলে, বলুন না। আমার খুব ভাল লাগল। স্বর্ণদি তো আমায় 'তুই' বলে। আর আপনি ওর পিসিমা।

ঠিক আছে। তাই বলব। তুই না বললে 'আপন আপন' মনে হয় না। তোকে আমার খুব আপন মনে হয়। আচ্ছা বল, ধর অনুপমার শ্বশুরবাড়িরা খুব বড়লোক! তাহলে?

দীপু একটু হেসে ইতস্তত করে বলে, তাহলে তো লোকে ভাবতে পারে সম্পত্তি-টম্পত্তির লোভে—

দীপু!

বেণু পিসি তার হাতটা চেপে ধরে। শক্ত করে।

কিন্তু মখমল-কোমল সেই হাতের আর কতটুকু শক্ত করার সাধ্য?

দীপুর যেন হাতটা আবেশাচ্ছন্ন হয়ে যায়। আর দীপুর হঠাৎ একটা কথা মনে হয়।

তো সাধে কি আর বেণুর দিদিরা দীপুকে পাকা মেয়ে বলেছেন!

না হলে দীপুর হঠাৎ মনে হল কেন শুধু বেণু পিসিই নয়, বেণু পিসির সেই অকালে মরে যাওয়া বরটিও কী দুঃখী! এই হাতের স্পর্শটি পেল না সে কোনোদিন। আর এই পরম ভালবাসাভরা মনটির ভালবাসা।

হাতটা ধরাই থাকল।

বেণু বলল, দীপু, তুই এতটুকু মেয়ে কী করে বুঝতে পারলি এ কথা? ঠিক। ঠিকই বলেছিস। বড়লোক শ্বশুরবাড়িতে যদি তোর "অনুপমা" শুধু 'স্বামীর ঘর' বলে থাকতে যেতে চাইতো, শ্বশুরবাড়ির লোক সেই সন্দেহই করতো। আর তাড়াবার ছুতো করে বলতো, 'অপয়া। বৌটা অপয়া।' কিন্তু—

কী? কী কিন্তু বেণুপিসি?

বলছি—মেয়েমানুষের মনটাই ভগবান এমন ভাবে তৈরি করেছেন, সে তার জন্মস্থানের সংসারটিতেই চিরকাল মন টিকিয়ে থাকতে পারে না। অন্য একটা সংসার, অন্য একটা বাড়ি, অন্য সব আত্মীয় এই সব চায়। অথচ দ্যাখ বেটা-ছেলেরা? সে কথা ভাবতেই পারে না। তারা দিব্য তাদের সাতপুরুষের ভিটেয় গ্যাঁট হয়ে বসে থাকে।

নিঃশ্বাস ফেলে একটা।

দীপুও নিঃশ্বাস ফেলে।

তারপর আবার হঠাৎ বলে ওঠে, সেজপিসি ন'পিসির কিন্তু কোনো দুঃখু নেই?

নেই?

বেণু দীপুর মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলে, তোর মনে হয় তাই ?

দীপু বেণুর অমন নির্মল মুখ আর অলৌকিক সুন্দর বড় বড় চোখ দুটির দিকে অভিভূত চোখে তাকিয়ে থাকে। এ যেন অন্য এক বেণু পিসি।

মেয়েও কি কোনো মেয়ের প্রেমে পড়তে পারে ?

বেণু পিসি বলে, তুই লেখিকা হচ্ছিস বলেই বলছি—আছে দুঃখু। খুব দুঃখু। তা নইলে অন্যকে এমন দুঃখু দিয়ে বেড়ান ? আর কেউ সুখে আছে দেখলেই ওনাদের বুক জ্বলে যায়।···আগে বুঝতে পারতুম না রে। ক্রমশঃ ভেবে ভেবে এটা আবিষ্কার করেছি।

দীপুর চোখের সামনে যেন অন্য আর একটা জগৎ খুলে যায়। দীপু অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

তা এই অন্য আর একটা জগৎ দীপুর সামনে খুলে যাচ্ছে আজকাল কেবলই। যখন-তখন। দীপুকে অবাক হয়ে যেতে হচ্ছে।

হ্যাঁ, আর একটা জগৎ।

দীপু যেন তার মনের মধ্যে অনেক লোকের পায়ের শব্দ শুনতে পায়। অনেকের কণ্ঠস্বর কানে বাজে। দীপুকে যেন তারা এই জগৎ-সংসারের কী এক অজানা রহস্যের কথা বলতে চায়। বলে যায়।

যাদের নিত্যদিন দেখছে দীপু, জন্মাবধিই দেখছে, হঠাৎ যেন তাদের ভেতরটা উদ্‌ঘাটিত হয়ে যায় দীপুর সামনে।

আর দীপুর মনে হয় সবাই যেন ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সবাই যেন থিয়েটারের লোকদের মত অভিনয় করে চলেছে। তাদের নিজস্ব মনের কথাগুলো চাপা আছে, যা বললে ভাল দেখায় তাই বলে।

কিন্তু দীপুর মা ?

মা ঠিক তা নয়। মা যেন অন্য রকম। তাই মায়ের কারোর সঙ্গেই ঠিক খাপ খায় না। সংসারের সবাই দীপুর মাকে বলে 'ছিষ্টিছাড়া'।

এই যে কালই তো—

সরস্বতীর বড়দি এসেছিলেন বেড়াতে। তার সঙ্গে মেজ ভাজ। দীপুদের বাদুড়বাগানের মাসীমা।

একখানা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে দুপুরের দিকে এলেন ও'রা যেমন আসেন।

এসেই সরস্বতীকে চেপে ধরলেন, তোর এই মেয়েটা নাকি গপপো লিখে পত্রিকায় ছাপাচ্ছে ? তা বেশ। কিন্তু সে সব গপপো কেমন তা পড়ে দেখেছিস ?

সরস্বতী একটু হেসে বললেন, সে সব আর কী, দুটো-একটাই তো। পড়েছি। ভালই।

প্রণয় ভালবাসা এই সব নিয়ে নয় তো ?

নাঃ।

তবু ভাল। আইবুড়ো মেয়ে। বিয়ে দিতে হবে তো। তো এই মেয়েটা-কেই বা ঘরে বসিয়ে বসিয়ে এমন বড় করছিস কেন? বিয়ের চেষ্টা করছিস না?

সরস্বতী হেসে বললেন, আমি আর কী চেষ্টা করব? করবে তো তোমরা সবাই।

তা করছি না তা নয়।

বড়দি বললেন, একটা সম্বন্ধ নিয়েই এসেছি। এই মেজবৌয়ের বাপের বাড়ির দিকে—হলে বর্তে যাবি।

'সম্বন্ধ'র বিশদ ব্যাখ্যা করেন বড়দি।

সরস্বতী ম্লানভাবে বলেন, ও'রা তো খুব বড়লোক!

'বড়লোক' তো কী? এমন করে বললি যেন, বড়লোক তোকে কামড়াতে আসছে। মেয়েকে বড় ঘরে দিতে পারাটা তো ভাগ্যের কথা!

সরস্বতীর মুখ দেখে মনে হল ওনাদের কথা কিছুমাত্র মনঃপূত না হলেও, সেদিকে তর্কে নামতে চান না।

আলগা ভাবে বললেন, তা ওদের বড় ঘর, দামী ছেলে, আমার মেয়েকে পছন্দ করবে কেন? সোন্দর তো আর নয়!

মেজ ভাজ এখন বলেন, সেটাই তো কথা। সোন্দর মেয়ে চাইছে না আমার মামাতো ভাই। পরপর দুই বৌ এনেছিল পরমাসুন্দরী দেখে। তো সইল কই? সেই যে বলে না 'অতি সুন্দরী না পায় বর' সেটাই ফলল হাতে হাতে। এখন এই মেজ ছেলের জন্যে মোটামুটি মেয়ে চাইছে।

কটি ছেলে?

ষেটের কোলে ছটি। পাঁচ মেয়ে সবাইয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। সবই বড় বড় ঘরে বিয়ে হয়েছে।

সরস্বতী এখন আবার বলেন, 'বড় ঘরে' আমার বড় ভয় মেজ বৌ।

ওমা কেন? তাদের তো আর খাঁই নেই। বলেছে অমনি নেবে। সেটাই ওদের বাড়ির রেওয়াজ। শুধু শাঁখা শাড়ি পরে বৌ আসবে, ওরা মানিয়ে নেবে।

সরস্বতী মরীয়া হয়ে বলে ফেলেন, নদার মেয়ে সুধারও তো বড়লোকের বাড়ি বিয়ে হয়েছে বড়দি—

ওর কথা আর বলিস নে সরস্বতী। নদা নবৌয়ের দুর্মতি। বিয়ে হওয়া মেয়েকে নিজের মা বাপ চুরি করে নিয়ে পালিয়ে যায়, এমন অনাছিষ্টি কথা ভুভারতে কেউ শুনেছে? বড়মানুষের ছেলেদের বয়েসকালে স্বভাবচরিত্তর একটু এদিক ওদিক হয়েই থাকে। পরে শুধরে যায়। একটুতেই অধৈর্য হলে—তা থাক। এ সম্বন্ধ তোর তাহলে পছন্দ নয়?

সরস্বতী তো অন্যরকম। মনের কথা ঢেকে রেখে অন্য কথা বলতে তো জানেন না বেশী। তাই বলে ফেলেন, না বাবা! আমার ভয় লাগছে!

ও'রা চলে গেলেন।

ও'দের তো আর সরস্বতী তাঁর মেলেচ্ছ সংসারে 'একটু বোসো, একটু জল খেতে হবে—' বলতে পারবেন না।

কিন্তু দীপু কি এই দৃশ্যের সাক্ষী ছিল ?

সেই তো কথা।

কেউ তো আর বিয়ের সম্বন্ধ এনে দীপুকে আড়াল করে বলে না। তো দীপুরই উচিত ওই মোক্ষম প্রসঙ্গ উঠলেই সেখান থেকে উঠে যাওয়া ?

একটু লজ্জা থাকবে তো ?

কিন্তু মুসকিল এই—ওই উঠে যাওয়াতেই দীপুর লজ্জা করে। দীপু হাতের কাজটা নিয়ে বসেই থেকেছে।

কাজটা কী ?

বাবা দুটো পেতলের ফুলদানী (অবশ্যই পুরনো বাজারের) এনে দীপুকে ভার দিয়েছিলেন ব্রাসো দিয়ে ঘসে ঘসে চকচকে করতে। সেটা নিয়েই বসেছিল মায়ের ঘরের সামনের দালানে।

উঠে যায়নি।

তাঁরাই উঠে যাবার সময় বলে গেলেন, সম্বন্ধ এনেছিলুম। তোর মার পছন্দ হল না।

দীপু লক্ষ্য করে মাসিরা তো মার বোন, তবু যেন মার দলে নয়। বিরোধী পক্ষের দলে। মার সঙ্গে ওদের বয়েসের অনেক তফাৎ, বলে কী ?

মা মেয়ে যে যার কাজ নিয়েই থাকল।

কেউ কোন কথা বলল না।

শুধু দীপুর মনটা মায়ের ওপর কৃতজ্ঞতায় ভরে গেল।

ভাগ্যিস মা ভয়ে অথবা সৌজন্যে ওদের ফাঁদে পা দেননি !

তবে দীপু টের পাচ্ছে আব তার রেহাই নেই।

এবার তাকে ফাঁসিতে ঝোলানো হবেই হবে।

একেই তো বয়েস বসে থাকছে না। পিঠোপিঠি বোন মণির ছেলে হেঁটে বেড়াতে শিখল, আর দীপু এখনো বাপের ভাত খাচ্ছে বসে বসে।

তার ওপর আবার নতুন সংযোজন, কাগজে লেখা ছাপা। সেও যে কী করে আত্মীয়মহলে এতো চাউর হয়ে গেল এও এক রহস্য।

আবার একদিন বর্গীর হানা।

আর কেউই একা আসেন না। আসবেনই বা কেন ? নগদ পয়সা দিয়ে আস্ত একটা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে কোনো মহিলা একা আসেন ? বাড়ির একটা ছোটোমোটো ছেলেকে তো আনতেই হবে বডিগার্ড হিসেবে, তাছাড়া ভাড়াটা উসুল করতে আরো দু-চারজন !

সহজে তো বেরোনো হয় না। তবু একটা উপলক্ষ হলে। আপাততঃ উপ-লক্ষ্যটা কী ?

আর কী ?

দীপুর মা-বাপকে চৈতন্য করাতে আসা।

তবে বাপের নাগাল আর মহিলারা কে কত পাচ্ছেন ? নাগালের মধ্যে যাকে

পাওয়া যায়, তার ওপরই হানা।

সেদিন এলেন দীপুর জনা-দুই পিসি, একজন পিসতুতো দিদি, আর গোবিন্দদা। উদ্দেশ্য সেই একই।

ও'রা যে এবার দীপুর মাকে একেবারে পেড়ে ফেলবার জন্যে তোড়জোড় করেই এসেছেন তা মা মেয়ে দুজনেরই কারো আর বুঝতে বাকি রইল না।…একেই বলে আত্মজন। যার মেয়ে তার হুঁশ নেই আত্মজনের ঘুম নেই!

কিন্তু আশ্চর্য! সকলেরই লক্ষ্য দীপুর মা। কই দীপুর বাবাকে তো কেউ পেড়ে ফেলতে আসে না? তিনি তাঁর অফিস আর হাজারো 'হবি' নিয়ে বেশ গা বাঁচিয়ে কাটিয়ে দিয়ে চলেন।

ও'র ভাইয়েরা ভগ্নিপতিরা বা মাতব্বর ভাগ্নে-ভাইপোরাও কেউই ও'কে কিছু বলতে আসে না। উনি আপন মহিমা নিয়ে দিব্যি আছেন।

দীপুর মামারা আছেন বটে অনেকগুলিই। এবং বেশ কেষ্টবিষ্টুও। কিন্তু তাঁরা তো চাকরিমাহাত্ম্যে সকলেই প্রায় প্রবাসী। কেউই কলকাতা শহরে কলম-পেষা কেরানী নয়। তাঁরা নিজেদের ছেলেমেয়ের বিয়ের ব্যাপারে পাত্রপাত্রী যোগানোর জন্য কলকাতাবাসী আত্মীয়দের শরণ নেন।

তো দীপুর মাসির সংখ্যাও তো নেহাৎ কম নয়। এক মেসো একদিন বলেছিলেন ভায়রাভাইকে, কী হে, শুনতে পাই তুমি নাকি নিজের শখ-টখ নিয়েই মশগুল। মেয়ের বিয়ের ভাবনা ভাব না!

দীপুর বাবা সুকান্তি মানুষ। সুরসিকও। আর হাসিটি মধুর।· সেই হাসি হেসে বললেন, কার কাছে শুনলেন?

কার কাছে আর? গিন্নীর কাছেই। সরস্বতী বলছিল, ছুটির দিন হলেই তুমি—

দীপুর বাবা ছিপের হুইলে সাবধানে সুতো জড়াচ্ছিলেন, হাত থামিয়ে বললেন, তা আপনারাই তো বলেন 'জন্ম মৃত্যু বিয়ে তিন বিধাতা নিয়ে'।

আহা সে তো সবাই বলে। তা বলে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা তো নিয়ম নয়। কাঠখড় পোড়াতে হয় বৈকি!

দীপুর বাবা আরো মধুর অমায়িক হাসি হেসে বললেন, তিনটের মধ্যে দুটোর জন্যে তো কোনো কাঠখড় পোড়াতে হয় না। বাকিটাই বা নিজের হাতে নেবার কী দরকার? যখন হবার ঠিক হবে।

অতএব আর কে কী বলতে আসবে?

কিন্তু দীপুর মার তো আর পালাবার পথ নেই। তাই তাঁকে পেড়ে ফেলার তোড়জোড়। ষোলোয় পা দেওয়া মেয়েকে তুমি বাড়ি বসিয়ে রাখবে, সত্যবাদী যুধিষ্ঠির হয়ে মেয়ের বয়েস এক ইঞ্চি কমিয়ে বলবে না লোকসমাজে, এবং তার ওপর সোনায় সোহাগা 'চাঁদের ওপর চুড়ো' অথবা 'গোদের ওপর বিষফোড়া' নিয়ে বইকাগজে লিখে লিখে নাম বার করছেন!

এতোখানি সহ্য করা শক্ত বৈকি। অসহ্যই।

সরস্বতীর ননদ বললেন, খুব ভাল পাত্তর একটি আমার হাতে আছে। ছেলে

বিয়ে পাস, একশো টাকা মাইনের চাকরি করে, মা বাপ আছে, দেশে ঘরবাড়ি আছে। এখুনি তাদের ধরে পড়তে পারি। তবে একটি কথা—কাল দেখতে এলে যেন ফাঁস হয়ে না যায় তোমার বিদুষী লীলাবতী কনো কাগজে নাম ছাপিয়েছেন।

সরস্বতী একটু গম্ভীর হাসি হেসে বললেন, তা ছাপাই যখন হয়ে গেছে, তখন সেটা তো আর চাপা থাকবে না সেজঠাকুরঝি। যেখানেই সম্বন্ধ হোক বলে-কয়েই এগোতে হবে।

শুনে মেজঠাকুরঝি কপালে হাত দিলেন। অপর ঠাকুরঝি গালে।

ওঃ! তাহলে আর তোর মেয়ের বিয়ে হয়েছে মেজবৌ!

মেয়ে আমার নয় ঠাকুরঝি, তোমাদের ভাইয়ের—তবে চাপাচুপি দিয়ে বিয়ে দেওয়া কী ভাল?

দীপুর পিসতুতো দিদি বলে উঠল, তুমি আর হাসিও না মেজমাসী। বলে সমুদ্দুর চুরি হয়ে যাচ্ছে, আর তোমার পুকুর চুরিতে ভয়। এক মেয়ে দেখিয়ে অন্য মেয়েকে ছাদনাতলায় এনে দাঁড় করানো, কালো পেত্নী মেয়েকে যাত্রাথিয়েটারের মতন 'পেন্ট' মাখিয়ে 'মেম' করে কনে দেখানো, কী না হচ্ছে! আর এইটুকুতে তোমার ভয়? আগ বাড়িয়ে বলতে যেতে হবে?

তা পরে তো জানতে পারবে?

আহা সে তখন বললেই হবে, ছেলেবয়েসের ছেলেবুদ্ধিতে কী বুঝি করেছে। সেসব ভাল হয়ে গেছে।

ভগ্নী! গুরুজন নয়। তাই সরস্বতী হেসে ফেলে বলেন, ব্যাপারটা তাহলে রোগের মত? ছেলেবেলায় 'পালাজ্বর' ছিল, এখন আর নেই। সেরে গেছে।

এই হলো মামীর কুতর্ক শুরু। বলি আরও বয়েস বাড়লে মেয়ের আর বিয়ে দিতে পারবে? যো সো করে এইবেলা—ওই যে মেজমাসি যে সম্বন্ধ দিল—

তা উনি তো বললেন, শ্বশুর-শাশুড়ী দেশের বাড়িতে, ছেলে মেসে থাকে। তার মানে—

আহা শনিবারে শনিবারে তো বাড়ি যায়।

মেজ ননদ বললেন, তাছাড়া তারা ছুটিছাটায়ও বাড়ি যায়। কলকাতা থেকে অনেকটা দূর, ডেলিপ্যাসেঞ্জারী পোযায় না। দেশে অবস্থা খুব ভাল। শ্বশুর কবরেজি করে, পসার আছে। মেয়ে খুব সুখে থাকবে।

এহেন হিতৈষীদের হতবাক করে দিয়ে সরস্বতী বলে ওঠেন, নাঃ, মেসে থাকা ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেব না।

মেয়ের বিয়ে দেব না! কী অসমসাহসিক বাক্য!

ওমা! এ আবার কী দৃপ্ত ঘোষণা!

কলকাতা শহরে বাসা করে থাকবে এমন চাও নাকি? মেস কী অপরাধ করল?

বলেই বোধ হয় কোনো পূর্ব ইতিহাস মনে পড়ায় একটু ঢোক গিলে বলে, তা একজনার ভাগ্যে অন্যরকম হয়েছে বলে কি আর সবাইয়ের তাই হবে? ক'জনায় রাস্তায় গাড়িচাপা পড়ছে! তা বলে কেউ রাস্তায় হাঁটবে না?

সরস্বতী আর সেকথার উত্তর না দিয়ে হঠাৎ বললেন, গোবিন্দ, চা খাবি তো?

খাবো কি না জিগ্যেস করছো মাসী? বলে, সেধো ভাত খাবি? না, আঁচাবো কোথায়? তবে কথাটা মেজমাসী ঠিকই বলেছে মাসি! ঘরপোড়া গরু তো! তা তোমরা ওর লেখা নিয়ে এত হাঁপাচ্ছ কেন বাবা! এখনকার ছেলেরা তো একটু লেখাপড়া গানবাজনা জানা কনেই চায়! তা দীপু তো আমাদের গান-বাজনায় অপ্সরম্ভা। তবু বই লেখে এটাই বা মন্দ কী? বরের পছন্দই হবে!

দীপুর পিসতুতো দিদি খরখরিয়ে বলে ওঠে, আহা, মরে যাই রে গোবিন্দ! তোর যেমন বুদ্ধি, তেমন কথা। বলি শুধু 'বর'টি নিয়েই বুঝি ঘর করবে? বলি বিয়েটা কি শুধু বরটি আর কনেটির মধ্যে? বিয়ে হচ্ছে দুটো পরিবারের মধ্যে মালাবদল গাঁটছড়া বাঁধা। বুঝলি? শ্বশুরবাড়ির লোক যদি পছন্দ না করে? না করতেই পারে। ভাল কিছু লেখেনি। নাটক-নভেলই তো!

দীপুর এই পিসতুতো দিদিটি প্রায় দীপুর মার বয়সী। কিন্তু ধরনধারণ আদিকালের মত। তাই খরখরিয়ে বলতেই থাকে, মেজমামী আর বলবে কী? নিজেই তো চব্বিশ ঘণ্টা নাটক-নভেলে ডুবে আছে। তাতেই মেয়েদের পরকাল ঝরঝরে হয়ে গেছে।

ঘরের মধ্যে দীপু ছিল না অবশ্য। কিন্তু ফুলি বসেছিল একধারে। চির-শান্ত আর বড়দের সামনে প্রায় বোবা ওই মেয়েটা হঠাৎ সকলকে চমকে দিয়ে বলে উঠল কিনা, নাটক-নভেল যদি এত খারাপ জিনিস তো ওঁত লেখা হয় কেন? এত বিক্কিরী হয় কেন? লেখকদের এত নাম হয় কেন?

ওমা! এই উচ্চিংড়েটা আবার কোথায় বসেছিল। হঠাৎ ফড়ফড়িয়ে উঠল! তুই এসবের কী জানিস?

ফুলি একবার যখন ফড়ফড়িয়ে উঠেছে, যা বলবার বলে নেবে। শুনে শুনে অসহ্য লাগছিল তার। বলল, জানবার আবার কী আছে? কে না জানে? তো মাইকেল মধুসূদন বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র অনুরূপা দেবী নিরুপমা দেবী এঁরা সব যা লেখেন সেসব খারাপ? আর যারা এঁদের বই পড়ে তারাও খারাপ? নিজেরা পড়ো না তাই জানো না—

দুই পিসির কপালে হাত!

মেজবৌ তোমার এই ছোট মেয়েটি যে দেখছি সবার উপরে যায়। মুখটি বুজে বসে থাকে, ভেতরে ভেতরে এত! কই, তোমার ছেলেরা তো এমন না?

মেজবৌ একটু হেসে বলেন, ছেলেরা বাড়ির মতন।

গোবিন্দ হঠাৎ বলে ওঠে, তা যাই বল বাহাদুরি দিতে হয় আমাদের 'ফুলু-বাবু'কে। বি. এ, এম. এ পড়া বেটাছেলেরা যা না জানে তা জেনে বসে আছে। নাঃ! সেলাম ঠুকতে হয়। কী রে ফুলি, যাঁদের সব নাম করলি তাঁদের বই পড়েছিস?

সব। আরও অন্য লেখকদেরও পড়েছি তো, এঁদের সঙ্গে তুলনা হয় না।

সরস্বতী একটু তাড়া দিয়ে বলেন, আচ্ছা, তোকে আর ওঁদের হয়ে ওকালতি করতে হবে না।···দেখগে যা দীপু চা দিতে এত দেরি করছে কেন?

দেরি করছে সত্যি।

এখানে যে দীপুর মরণবাঁচনের প্রসঙ্গ! দীপু দালানে দাঁড়িয়ে সবই শুনেছে।

আর এখন?

এখন তার বুকের মধ্যে ঢেঁকির পাড়। এরা নির্ঘাত মাকে রাগিয়ে দিয়ে কিছু একটা প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়ে যাবে। কী হবে!

তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে এসে চা-টা করে নিয়ে এল। ইতিমধ্যে বামুনদি সরস্বতীর নির্দেশে চ্যাঙারি-ভর্তি নোনতা খাবার, ভাঁড়ভর্তি মিষ্টি এনে হাজির করে রেখেছে নিঃশব্দে।

দীপু-বাহিত হয়ে সেগুলি রেকাবি-সজ্জিত হয়ে এসে উপস্থিত হতেই গোবিন্দ প্রায় লাফিয়ে উঠে বলে, এই তো। এতক্ষণ তাই ভাবছিলাম। কেবল বাজে কথার কচকচি চলছে, 'আসল কাজটি'র নামগন্ধ নেই কেন? দে রে দীপু, আগে আমার দিকে। মাসীরা তো শুচিবাই। দোকানের ভাজা-খাবার খায় না। ঝুনুদি, তুমি আর আমি তো? তো চা?

দীপু বলল, আনছি। ফুলি আয়, জলের গেলাসগুলো নিয়ে আসবি।

চা নিয়ে ঘরে ঢোকার সময় দীপুর কানে হঠাৎ মধুবর্ষণ করল। দীপু তার মায়ের উদ্দেশে একটি ভক্তির ডালা নামিয়ে রাখল।

দীপু এসেই শুনতে পেল, মা বলছেন, কিছু মনে কোরো না মেজঠাকুরঝি, দীপুর বিয়ে আমি কলকাতায় দেব।

তা ভাল। পারলেই ভাল।

মেজঠাকুরঝি মুখ কালো করে বলেন, কলকাতার বরের বাপদের খাঁই মেটাতে পারলেই ভাল। মেয়ে তো আর তোমার রূপসী নয়, নেহাৎই পাঁচপাঁচি। আমার ভাই অবিশ্যি রোজগার ভালই করে, কিন্তু এক পয়সা কি রাখতে পেরেছে? তোমার নবাবি আর অপব্যয়ের দায়েই তো ফতুর। ওঠ ঝুনু!

গোবিন্দ গুলি আলুরদম দিয়ে বাগিয়ে কচুরি খেতে খেতে বলে, তোমাদের মতন কিপ্টে হওয়াও কিছু ভাল নয় বাবা। হাত দিয়ে জল গলে না। বাড়িতে মানুষজন গেলে দুটো রসমুণ্ডি! 'নে গোবিন্দ, জল খা।' বলি পয়সা তো সুখসুবিধে আরাম আয়েস মণিষ্যত্ব করার জন্যেই গো। ছাতা পড়াবার জন্যে তুলে তুলে রাখার? ওই মেজমাসির আচার-আমসত্ত্বর মত? হে হে হে! কষ্ট করে করে মরবে, কিন্তু প্রাণ ধরে কাউকে একটু দিতে পারবে না। যখন পচ ধরবে, ছাতা পড়বে, তখন লোককে ডেকে ডেকে দিতে আসবে।

আ গেল! মুখপোড়া ছেলের কথা শোন, টাকায় বুঝি আমসত্ত্বর মতন ছাতা পড়ে?

তা একরকম তাই। টাকা থাকতে খরচ করলে না, হাড়ির হালে থাকলে। তারপর 'ফুট' করে পটলটি তুললে। ব্যাস! না গো সেজমামী, তোমার বুদ্ধিই ঠিক। খাও মাখো, পাঁচজনকে খাওয়াও মাখাও, চুকে গেল। জীবন তো পদ্মপত্রের জল। হ্যাঁ হ্যাঁ, দীপুর বিয়েটা তুমি কলকাতাতেই দিও। আর কাছেপিঠেই দিও। যাতে মাঝেমধ্যে গিয়ে ওর হাতের চা-টি খেয়ে আসা যায়।

হঠাৎ ঝুনুদি বলে ওঠে, ওই চা-ই তোকে খেয়েছে রে গোবিন্দ। নচেৎ তোর মতিবুদ্ধি তো এমন ছিল না। বরং সেজমামীর নবাবি দেখে কত ঠাট্টা করতিস!

তা করতাম। অস্বীকার করছি না। সেজমামী তা জানে। তবে এও জানে, গোবিন্দ ন্যেয্য কথার ভক্ত। পেটে মুখে আলাদা নয়। তখন জ্ঞান জন্মায়নি, যা মনে হয়েছে বলেছি। এখন ক্রমশঃ তোমাদের হালচাল আর প্যাঁচ দেখে দেখে জ্ঞানচক্ষু খুলছে। ফুলি ঠিক বলেছিস রে! বই লেখা যদি খারাপই হবে তো লিখিয়েদের এত মান্য কেন?

ঝুনুদি ক্রুদ্ধগলায় বলেন, তো গাইয়েবাজিয়েদেরও তো আসরে খুব মান্য—তো শিখলি না কেন?

গোবিন্দ দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে বলে, ওরে বাপস! তাহলে আর মামীদের ঘরে ঠাঁই হতো? ওনাদের মতে তো গানবাজনা করা আর মোদোমাতাল হওয়া দুইয়ে তফাত নেই। এই তো, বড়মামার ছেলেটার প্রাণে কী শখ একটু গান শেখবার। বলতে পারছে সাহস করে? আমার কাছে দুঃখ করে বলে, যখন বড় হবো স্বাধীন হবো তখন শিখবো।···তো তখন কী আর হবে গো? কথায় বলে কাঁচায় না নোওয়ালে বাঁশ, পাকলে করে টাঁশটাঁশ। গলা হচ্ছে ওই বাঁশের মতন। সময়কালে ঘষোমাজো তো ওই বাঁশই বাঁশি!

হুঁ! তোর আজকাল খুব জ্ঞান হচ্ছে দেখছি।

গোবিন্দ একটু উদাসভাবে বলে, পরের ভাতে মানুষ হতে হলে জ্ঞান একটু জন্মায় গো ঝুনুদি!

ঝুনু ভুরু কুঁচকে বলে, মামা কাকা যদি পর হয় তো আপন কে? দিদিমা এখনো বেঁচে। ও-বাড়িটা তোর পরের বাড়ি হল কী সূত্রে? তো যাক—বড়-মামার কোন্ ছেলেটার গানের শখ? বড়র না মেজর?

এই মরেছে! দোহাই বাবা, আবার লাগিয়ে দিতে বোসো না। তোমাদের তো সে-গুণে ঘাট নেই! কোনো ছেলেটাই নয়। ও আমি এমনি বলেছি। বাবাঃ! তোমাদের কাছে একটু গল্প করাও বিপদ। যাকগে—সেজমামী, ওই কথাই রইল। দীপুর বিয়েটা কলকাতাতেই দিও।

কিন্তু দীপুর মার ইচ্ছা আর বোকা গোবিন্দর শুভেচ্ছা কী সফল হয়েছিল?

অথচ—দীপুর স্বর্ণদির!

স্বর্ণর বিয়ে হয়ে গেল। অবশ্যই খুব ধুমধামের সঙ্গে।

স্বর্ণ ওদের বাড়ির সব প্রথম মেয়ে। স্বর্ণ রূপে গুণে আলো করা মেয়ে। তার ওপর আবার স্বর্ণ একটা 'পাস' দিয়েছে। তখনো 'রেজাল্ট' বেরোয়নি বটে, তবু বিয়ের বাজারে রীতিমত দামী মেয়ে।

স্বর্ণর মায়ের অন্তরে অন্তরে ছিল দুটি প্রার্থনা। স্বর্ণর যেখানে বিয়ে হবে, সেখানে যেন ঘরে বিধবা ননদ না থাকে। আর স্বর্ণর যেন কলকাতা থেকে অনেকটা দূরে বিয়ে হয়।

দ্বিতীয় প্রার্থনাটি অবশ্য মাতৃহৃদয়ের পক্ষে বিপরীত বিস্ময়কর। কারণ কবে কান্ মা চেয়েছে মেয়ের দূরে শ্বশুরবাড়ি হোক! তাজ্জব! মুখ ফুটে কাউকে বলে ফেলেনি এই ভাগ্যি!

কিন্তু এই রকম অদ্ভুত প্রার্থনাই করেছিল স্বর্ণর মা।

মনে মনে বলেছিল, ভগবান তুমি আমার দোষ নিও না। অনেক ভেবেই এ প্রার্থনা করছি। মায়ের প্রাণ ফেটে গেলেও করছি। কাছের গোড়ায় শ্বশুরবাড়ি হলে ওর স্নেহময়ী পিসিরা কি ওকে শ্বশুরঘর করতে দেবে? সর্বদা নিয়ে আসবার বায়না করবেন, সর্বদা খোঁজখবর নিতে পাঠাবেন, এবেলা ওবেলা 'স্বর্ণ ভালবাসে' বলে খাদ্যসম্ভারের তার সরবরাহ করবেন, আর বাড়িতে নিয়ে এসে কুমন্ত্রণাও দেবেন। এবং জামাইটিকে 'হাত করবার' চেষ্টা করবেন।

ভবিষ্যতের এই দৃশ্য স্বর্ণর মা চোখের সামনে দেখতে পেয়েছিল।

শ্বশুরবাড়ির লোকদের এঁরা বুঝিয়ে ছাড়বেন স্বর্ণ তাঁদের কত আদরের মেয়ে। স্বর্ণ তোমাদের এখানে কষ্টে আছে।

স্বর্ণর মাকে তাঁর ননদরা বোকাসোকা ভালমানুষ বলেই নির্ভয়ে থাকেন। তাঁর মধ্যে যে এত চিন্তাশক্তি আর 'মনুষ্যচরিত্র' সম্পর্কে এত সূক্ষ্ম গভীর অভিজ্ঞতা তা তাঁরা কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবেননি।

ওঁরা উঠে পড়ে লেগে বাজারের সেরা পাত্র কেনবার তালে চেষ্টা করছিলেন, এবং জোর গলায় ঘোষণা করছিলেন স্বর্ণকে আমাদের কাছছাড়া করব না। ওকে রোজ একবার না দেখতে পেলে বাঁচব না।

এমনি আশ্চর্য ওঁদের ঠাকুরই কলা খেলেন। স্বর্ণর বিয়ে হল 'দুয়ার থেকে অদূরে'। ছেলে হীরের টুকরো। দেখতে সুকান্তি।

এত কাছে থেকেও যে কেন এতদিন সন্ধান পাননি!

তবে স্বর্ণর মার একটা প্রার্থনা পূর্ণ হয়েছে। বিধবা সধবা কুমারী কোনো ননদই নেই স্বর্ণর। কেবলমাত্র দুই ভাই।

কিন্তু অলৌকিক আশ্চর্য!

পিসিরা বললেন, ননদ নেই! বাঁচা গেছে বাবা! স্বর্ণর ভাগ্যটা যে বরাবরই উত্তম। ও জন্মানোর পর থেকেই বাপের আয়-উন্নতি বেড়েছে। ননদ থাকা মানেই তো আদর ভালবাসার ভাগ হয়ে যাওয়া! মা বাপ নিজের মেয়েদের কোলেই ঝোল টানবেন। এ বাবা নির্ঝঞ্ঝাট। একলা একেশ্বরী। দ্যাওরটা এখনো ছোট, বিয়ে হতে দেরী।

স্বর্ণর মার মানুষচরিত্র সম্পর্কে জ্ঞানের আর এক দিগন্তের উন্মোচন ঘটল।

স্বর্ণর বিয়েতে ওরা মণির শ্বশুরবাড়িতেও চিঠি দিয়ে বলে কয়ে আনালেন। কারণ মণিই তো তার 'বন্ধু'।

তা এই ঘটার বিয়েতে চার-পাঁচদিন ধরে উৎসব অনুষ্ঠান। অতএব নেমন্তন্ন। যাওয়া-আসা করতেই হচ্ছে দীপুকে। তবু ভাগ্যি যে মণিদি এসেছে, তার ছেলেটা আছে একটা স্বস্তির জিনিস। নইলে দীপুকে যদি একা যেতে হত!

বাবা! ভাবলে ভয় করে।

কত আড়ম্বর কত বহিরাগত আত্মকুটুম্ব, কত সোনাদানার ছটা, তার মধ্যে নিষ্প্রভ দীপু। আর সবচেয়ে বড় কথা দীপুও রীতিমত বিয়ের যুগ্যি। (অন্যের হিসেবে বিয়ের বয়েস পার করা!) সেই দীপু অম্লানবদনে পাঁচজনের সামনে ঘুরবে? দীপুর মার 'সেকেলেপনা' ছিল না, কিন্তু আত্মমর্যাদাবোধ ছিল। তাই বলেছিলেন নেহাৎ এক দেয়ালে বাড়ি বললেই হয়! না গেলে ভাল দেখাবে না। না হলে দীপুকে আমি বিয়ে বাড়ি পাঠাতাম না।

দীপুর বাবা কিন্তু শুনে বলে উঠলেন, সে কি! ওর অত প্রাণের 'স্বর্ণদি'। আর ওকে ওরা খুব ভালবাসে। না গেলে ভাল দেখায়? তাছাড়া আর কদিন স্ত্রী হয়ে আমোদ-আহ্লাদ করতে পাবে? আর দুদিন বাদেই তো মণির মতন অবস্থা হবে।

তা, মণির অবস্থা যাই হোক বলতেই হবে তার শ্বশুরবাড়ির লোকের 'নজর' আছে। বৌয়ের বাপের বাড়ির পাড়ার একটা পুরনো বন্ধুর বিয়েতে কে কবে ঢাকাই 'গুলবাহার' শাড়ি দিয়ে আইবুড়ো ভাত দেয়?

নগদ চোদ্দ টাকা দাম।

অকল্পিত ব্যাপার!

মণির শ্বশুর বাড়িতে তার খুড়শ্বশুরই সংসারের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। তিনি যা করবেন তার ওপর কারো কথা চলে না। তাঁর দাদাও তাঁর কাছে অনুজের ভূমিকায় থাকেন।

তবু তাঁর এই বাড়াবাড়িতে সবাই সমালোচনায় মুখর হলো। অ্যাঁ, এ কী কাণ্ড! একখানা 'নৌকতার শাড়ির দাম চোদ্দ টাকা!'

খুড়ো রাগ করলেন না।

হাস্যবদনে বিবেচকের গলায় বললেন, তা হোক, একবার বৈ তো দশবার নয় বলি যেমন-তেমন একখানা কাপড়ও তো দিতে হতো! তার ওপর নয় আর কিছু বেশী চাপান দিয়েছি। তা বাপের বাড়ির পাড়ার বন্ধুর বিয়ে। বৌমার মুখখানি কেমন বড় হবে তা ভাবো? কী বৌমা, রঙ পছন্দ হয়েছে? শুনলাম বন্ধু খুব ফর্সা তো সেকথা বলতে দোকানী বলল, তা হলে এই জামরঙা জামদানখানা নিয়ে যান, ফর্সারঙে খুব খুলবে!

বৌমা অবশ্য কথায় অভিব্যক্তি জানাতে পারে না, ঘোমটার মধ্যে গালের ওপর সেই অভিব্যক্তির ধারা গড়িয়ে পড়ে। গভীর কৃতজ্ঞতায় মন ভরে ওঠে।

মানুষটাকে মেজাজী বলে সবাই ভয় করে।

বালির নীচে ফল্গুধারাও বয় তাহলে?

•

এদিকে দীপু মণির বাবা ওই শাড়ি দেখে মাথায় হাত দিয়ে বললেন, সেরেছে তোর শ্বশুর যদি এই কাপড় দেয়, তোর বাবাকে তো বারাণসী শাড়ি দিতে হবে

সরস্বতী বিরক্তগলায় বললেন, তবে তাই দাও। বেয়াইয়ের সঙ্গে পাল্লা দাও শ্বশুরবাড়ি থেকে দিয়েছে তাতেই তো যথেষ্ট 'মুখ' থাকছে।

আহা তা কেন?

বাপ বললেন, দীপুরও তো একটা মুখ আছে ? সেটাই বা উজ্জ্বল করা হবে না কেন ? না, তোমার ওই তাঁতিনীর কাছে কিনে রাখা কাপড় থাক। আরো অন্য দরকারে লাগবে। আমি ভাল কাপড় কিনে আনছি।

নিয়ে এলেন চওড়া জরির পাড় বসানো একখানা 'ম্যাড্রাসী' শাড়ি। জেল্লাদার শাড়ি। তা দাম অবিশ্যি নিয়েছে। দরাদরি করে সাড়ে ষোলো টাকা। তবে হ্যাঁ, দীপুর মুখটা থাকবে। কী বলিস রে দীপু ?

দীপুরও হঠাৎ তার দিদির মতই দশা আর কী। দীপু ভাবে পুরুষ মানুষের মধ্যেকার 'স্নেহ মমতা ভালবাসা' এগুলো কোথায় লুকনো থাকে ? কৌটোর মধ্যে কৌটো সাত কৌটোর ভেতর খোপে ?

দীপুর বাবা যেমন সব সময় হালকা দীপুর মা তেমনি সব পরিস্থিতিতেই সিরিয়াস। এই আনন্দঘন মুহূর্তে কিনা বলে বসলেন, আচ্ছা. খুব বিবেচনা দেখিয়েছো। মাসের প্রথম বলে এত বাহাদুরী। তা দীপুর মার মুখটা রাখবার একটা ব্যবস্থা করে ফেল না চটপট ? ওই স্বর্ণদের সামনে দেখানো যায় এমন একটা বর যোগাড় করো না দীপুর জন্যে ? মেয়ে নিয়ে ঘরে-পরে তো মুখ দেখাতে পারা দায় হয়ে উঠেছে।

স্বর্ণ বলেছিল, মামার বাড়ি থেকে ছাড়া এত সুন্দর শাড়ি আর কেউ দেয় নি যে মণি দীপু ! কত খরচ করেছেন বাবা। সত্যি ভারী সুন্দর।

মণি বলল, তোর থেকে তো আর সুন্দর নয় ? তুই যত ভাল শাড়িই পরিস শাড়িরই বাহার খুলবে।

স্বর্ণ বলল, বিয়ে হয়ে তুই অনেক পাকা পাকা কথা শিখেছিস।

মা একটু হেসে বলল, তুইও শিখবি।

কথাটা শুনে হঠাৎ ভারী ভয় করল দীপুর। দীপু উঠে গিয়ে একটা বারান্দায় দাঁড়াল।

আর সেই ভয়ের মুহূর্তে আর এক কাণ্ড ! ভয়ের ওপর ভয়।

পিছন থেকে খুব মৃদু একটু গলা বলে উঠল, যাক বাবা ! তবু একটু দেখা পাওয়া গেল।

দীপু চমকে তাকাল।

এ কী দুঃসাহস ! এত কাছে এসে দাঁড়ানোর মানে ? চারিদিকে লোকে-লোকারণ্য !

'দুঃসাহসী' আরো কাছে সরে এল।

বলল, স্বর্ণ অন্য বাড়ি চলে যাবে ভেবে এত মন খারাপ লাগছে ! মেয়েদের এই বড় কষ্ট। নিজের জায়গায় থাকতে পায় না।···স্বর্ণ শ্বশুরবাড়ি চলে গেলে তুমিও আর আসবে না হয়তো। কী দীপু ? আসবে ?

দীপুও হঠাৎ একটা দুঃসাহসিক কথা বলে ওঠে, আমিও তো ওই মেয়েমানুষ-দেরই একজন। আমিই কি চিরদিন থাকতে পারব নিজের জায়গায় ?

দীপু !

দীপু আস্তে হাতটা ছাড়িয়ে নেয়।

দীপু! ভিড়ের মধ্যেই বেশী নির্জনতা। তোমায় একটা কথা বলবার জন্যে কতদিন ধরে চেষ্টা করছি।

দীপু আস্তে বলল, কী কথা?

বলছিলাম বিয়ে হয়ে গিয়েও তুমি লেখা ছাড়বে না তো?

এই কথা!

দীপু একটু হাসল, এ তো আরো একদিন বলেছেন।

আবারও বলছি। লিখবে আমাকে নিয়ে 'আমাদের' নিয়ে একটা গল্প লিখবে?

'আমাদের' মানে? আপনাদের বাড়ির সবাইকে নিয়ে?

দীপু! এই কথা বলবার জন্যে আমি তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম? বুঝেও বুঝছ না কেন বল তো? 'আমাদের' নিয়ে মানে তোমাকে আর আমাকে নিয়ে।

দীপুর সর্বশরীরে যেন ভয়ের কাঁপুনি ধরে। বলে, এ কথার কোন মানে হয় না। সরুন আমি যাই।

না। সরব না। কেউ আমাদের দেখছে না। আজ তোমার কাছে দুটো কথা আদায় করতে চাই। একটা হচ্ছে আমাদের নিয়ে গল্প লেখা। আর একটা হচ্ছে তুমি আর আমায় 'আপনি' করে কথা বলবে না।

দীপু ভয় থেকে আত্মরক্ষা করতে হাসির মত করে বলে, তবে কী বলব 'তুই'?

হেসে উঠল সেও।

উঃ খুব চালাক হয়েছ! আর খুব দুষ্টু!

তারপর বিষণ্ণ ভাবে বলে, ছেলে হয়েও আমার পোজিশান মেয়েদের থেকে কিছুই উন্নত নয়। বুঝলে দীপু? নিজের জীবনকে নিজের হাতে রাখবার মত সাহস দেখাবার ক্ষমতা আমার নেই।

দীপু কেন না জানি হঠাৎ ভয়ের হাত থেকে মুক্ত হয়। দীপু তীক্ষ্ন গলায় বলে, সে সাহস যখন নেই তখন আর এলোমেলো সাহস দেখিয়ে কী হবে? সরো, যেতে দাও।

দীপু! তাহলে 'তুমি' বললে?

কী করব? তুইটা পেরে উঠলাম না। দেখো দু জোড়া চোখ অলক্ষিতে এই দিকে তাকিয়ে আছে।

যাক। তুমি আমায় কথা দাও। একটা অনুরোধ রেখেছ আর একটা অনুরোধও—

দীপু চোখ তুলে বলে, 'গল্প লেখার' মত কী আছে?

কিছুই কি নেই?

আমি তো কিছু খুঁজে পাচ্ছি না।

কিছুই না?

কই?

এ ছাড়া আর কী বলবে দীপু?

তাকে তো নৌকোখানাকে চড়ায় আটকে রাখতে হবে। স্রোতে ভাসতে দিলে তো চলবে না।

ও একবার গভীর দৃষ্টিতে তাকাল।

আস্তে বলল, তবে থাক। 'কিছুই' যদি না থাকে, তাহলে আর বলার কী আছে?

দীপুর মনের মধ্যে তো ভয়ানক ছটফটানি। এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে কথা বলতে দেখলে এক্ষুনি ফিসফিসিনি শুরু হয়ে যাবে এবং তম্মুহূর্তেই দীপুকে একটা দাগী আসামীর ছাপ মেরে দেওয়া হবে। একেই তো দীপু গল্প লিখে ছাপিয়ে মরেছে।

কিন্তু—

দীপু চলে যেতে পারছে কই?

ওই বন্ধ গভীর আহত দৃষ্টি তাকে যেন এখানে পুঁতে রেখেছে। আর দীপুর মনটা করুণায় ভরে উঠছে।

দীপু তাই হঠাৎ হেসে উঠে বলল—গল্প-লিখিয়েরা অবশ্য শূন্যে প্রাসাদ নির্মাণ করতেও পারে।

'শূন্যে'! একেবারে শূন্যে আর লাভ কী?

দীপু হঠাৎ শক্ত হল। স্থির গলায় বলল, যদি 'শূন্য নাই হয়! যদি শক্ত মাটির ভিৎই থাকে, তাতেই বা কী লাভ হবে?

হবে দীপু। হবে। আমি জানি, আমি বুঝতে পারি—

দীপুকে আবার হাত ছাড়িয়ে নিতে হয়।

শান্ত ভাবে বলে, এত সাহস কেন? স্বর্ণদির বাসরটা দেখতে দিতে চাও না?

ওঃ। মাপ করো। আচ্ছা যাচ্ছি। আরো অনেক অনেক কথা বলার ছিল। রইল।

কিন্তু সেই 'অনেক কথা' কি আর শোনা হল কোনোদিন দীপুর?

স্বর্ণর বোকা বেণু পিসি একদিন বলে ফেলেছিল তার দিদিদের কাছে, ওঁরা তো দীপুর বিয়ের জন্যে খুব ব্যস্ত। খোকারও দেখি দীপুর ওপর খুব টান। আচ্ছা বললে কেমন হয়?

শুনে তার দিদিরা ন ভূতো ন ভবিষ্যতি করেছিলেন। বেণুকে যে কেন এখনো পাগলা গারদের বাইরে রাখা হচ্ছে সে প্রশ্নও উঠেছিল।

তার পর জোর ধমক দিয়ে বলেছিলেন খবরদার! এমন কথা আর যেন মুখে না আনে সে। 'খোকার ওর ওপর টান!' নাটক নভেল পড়াটা একটু ছাড় বেণু!

তা এ ঘটনা অবশ্য স্বর্ণর বিয়ের পরে।

স্বর্ণদির বাসর দেখার সুখ থেকে বঞ্চিত হতে হয়নি দীপুকে। সরস্বতী মণিকে বলেছিলেন, তোর ছেলেকে আমি রাখব, তোরা দুই বোন বাসর জাগগে যা! স্বর্ণ যখন নিজে মুখে বলেছে অত করে। মেয়েটা বড় ভাল। চাল অহঙ্কার নেই। নিজেদের তো কত বড়লোক বড়লোক আত্মীয় রয়েছে তবু

তোদের আঁকড়েছে।

মণি বলে উঠেছিল, ওবাড়ির ওই গিন্নী দ্'টি বাদে সবাই ভাল। স্বর্ণর মা তো কী ভাল। এত কাজের মধ্যেও আমাকে ডেকে কত গল্প করলেন। বরপক্ষরা পাকা দেখার কী গয়না দিয়েছে বললেন। দেখাতে অবিশ্যি পারলেন না। সে তো স্বর্ণর পিসিদের সিন্দ্কে। স্বর্ণর দাদাও কত ভাল করে বলল, তোমার বন্ধ্র বিয়ে ভাল করে খেয়ো মণি। আর দীপ্র লিখে দেওয়া পদ্যর কত স্খ্যাতি করল। আর স্বর্ণ শ্বশ্রবাড়ি চলে যাবে বলে এতো দ্ঃখ করল। বলল, স্বর্ণ আর এ বাড়িতে থাকবে না, অন্য বাড়ির লোক হয়ে যাবে ভাবতেই পারছি না। সাদাসিধে না হলে এমন বলে ? আমরা কে বল ?

হ্যাঁ দীপ্র 'লেখিকা' হবার দায়ে স্বর্ণর পিসিদের জবানিতে স্বর্ণর বিয়ের পদ্য লিখে দিতে হয়েছিল।

যদিও সেজপিসি নপিসি মেয়েমান্ষের বই লেখা তেমন ভাল চক্ষে দেখেন না তব্ প্রয়োজনে সেটাই কাজে লাগাতে দ্বিধা করলেন না।

প্রথমে অবশ্য বলেছিলেন বেশ জম্পেশ করে একটা পদ্য লিখে দে দীপ্ তোর স্বর্ণদির বিয়ের। গোলাপি কাগজে ছাপিয়ে বিয়ের রাতে বিলি করা হবে।

তা দীপ্ একটা লিখে নিয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু 'সম্রাজ্ঞী' ও তাঁর পাশ্বর্চারিণীর তেমন মনঃপ্ত হল না। এ আবার কী ? এ কী পিসিদের উপয্ক্ত ? সম্রাজ্ঞী স্বয়ং আগাগোড়া বক্তব্য গদ্যে ডিকটেশন দিয়ে সেটিকে পদ্যে র্পান্তরিত করতে বলেছিলেন।

তো পাগল বেণ্ সেই বাতিলটি নিয়েই বলে বসেছিল, আচ্ছা ছাপতে কত লাগবে মেজদি ?

কি জানি। খোকা বোধহয় বলছিল, শ পিছ্ দেড় টাকা। তবে দ্শো ছাপালে তিন টাকা আর চারশো ছাপালো নাকি প্রো ছ টাকা লাগবে না কিছ্ কম হবে।

বেণ্ সেই বাতিলটা নেড়েচেড়ে বলেছিল, তো এটা যখন লেখাই হয়ে গেছে মেজদি আমার নাম দিয়ে না হয় দ্শো ছাপিয়ে দাও বাপ্ !

ওঃ ! তোর স্পেশাল ? তাহলে দে। দ্টোই হোক। একটা গোলাপি কাগজে একটা নীল কাগজে !

সেই পদ্যরই স্খ্যাতি।

তবে সেজপিসির ডিকটেশনটার নয়। বেণ্ পিসির নামে যেটা ছাপা হল।

বিয়ের রাতে নেমতন্নর সারিতে বসতে সিঁড়ি দিয়ে ছাতে যেতে আসতে এখানে সেখানে কতবারই দেখা হয়ে যাচ্ছিল সেই গ্ণগ্রাহীর সঙ্গে। চেষ্টা থাকলে আকস্মিকটা বারেবারে ঘটতে পারে।

এক সময় আবার সেই জনারণ্যের মধ্যে নিভৃতি !

দীপ্। তুমি পদ্যও এত স্ন্দর লিখতে পারো।

আহা ! ভারী তো স্ন্দর !

খ্ব স্ন্দর হয়েছে। আমার বন্ধ্রা বলল, তোর 'ছোটপিসি' তো দেখছি

বেশ কবি ! হা হা। আমি অবশ্য 'ছোটপিসি'র গৌরবটা নষ্ট করলাম না। ওরা বলল সচরাচর বিয়ের পদ্যয় এমন লেখা হয় না। অন্য পিসিদের নামে যেটা হয়েছে সেই রকমই হয়।

বড় আদরের কন্যা মোদের
প্রাণের স্বর্ণলতা।
আজ রাতে তুমি 'পর' হয়ে যাবে
ভেবে বুকে জাগে ব্যথা

এ সব একেবারে গতানুগতিক। 'আমাদের ভুলো না' 'পতিগৃহে সুখে থাকো—' একদম একঘেয়ে। কিন্তু হা-হা, আমার 'ছোটপিসির' লেখাটা ?

এক ফাগুনের হাওয়া লেগে বন
ছেয়ে যায় ফুলে ফুলে।
এক রজনীর বরিষণে নদী
ভরে ওঠে কুলেকুলে।
প্রাসাদে প্রাথারে 'এক' করে দেয়
এক নিমিষের বাণ।
এক নিমিষের শুভদৃষ্টিতে
'এক' করে দুটি প্রাণ !

ওরা বলছিল নিশ্চয় তোর ছোটপিসি লুকিয়ে কবিতা-টবিতা লেখেন। হা-হা।

ভারি খোলামেলা হাসি।

তারপরই হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলে, আচ্ছা দীপু! 'শুভদৃষ্টি'র গুণটি কি শুধু ছাদনাতলাতেই ফোটে ? অন্য কোথাও অন্য কোনো সময়ে ঘটতে পারে না।

বাসরে বসে স্বর্ণ একবার ব্যাকুলভাবে কাকে যেন বলেছিল, এই দাদাকে একবার ডাক না রে।

এমা! বেটাছেলে আবার বাসরে আসবে কী? তাও আবার দাদা! জামাইবাবু-টাবু হয় সে আলাদা কথা।

আহা কতই যে বড় দাদা। ও বলেছিল, তোর বাসরে আমি একটা গান গেয়ে দেব রবিঠাকুরের গান।

বর লাজুকের ভঙ্গীতে মাথা নীচু করে বসেছিল।

তার কান বাঁচিয়েই বলতে চেষ্টা করেছিল স্বর্ণ। তবু তার কান এড়ায়নি।

সে বলে উঠেছিল, আহা ডাকুন ডাকুন। তবু একটু স্বজাতির মুখ দেখতে পাই।

কে একটা বাচাল মেয়ে বলে উঠেছিল কেন? 'বিজাতি'দের মুখ দেখতে বেজার লাগছে ?

বাসর-জাগানিয়ারা সবাই বাচাল হয়ে ওঠে। ওটাও একরকম বাহাদুরি।

হারমোনিয়ম এসেছিল।

স্বর্ণর দাদাও এসেছিল। তবে বাসরের সমস্ত জানলা দরজা বন্ধ করা

হয়েছিল।

স্বর্ণদের বাড়িতে ঘরে ঘরে না হলেও বেশ কটা ঘরে ইলেক্‌ট্রিক ফ্যান ছিল। এ ঘরে তো থাকবেই।

দুঃসাহসিক ছেলেটা বলেছিল গানটা এই বাসরের, বরের হয়ে গাইছি, যদিও গলা খাদে নামিয়ে গেয়েছিল—

ভালবেসে সখী নিভৃতে যতনে
আমার নামটি লিখিও—
তোমার মনের মন্দিরে—
আমার পরাণে যে গান বাজিছে
তাহার তালটি লিখিও—

কিন্তু বরের হয়ে গাইলেও বারে বারেই কেন কনের বান্ধবীর ছোট বোনের দিকে চোখ ফেলছিল?

আর চোখ যে ফেলছিল, সেটাই বা সেই 'ছোট বোন' টের পাচ্ছিল কী করে?

স্বর্ণর মা মনে মনে প্রার্থনা করেছিল স্বর্ণর যেন কলকাতার বাইরে বিয়ে হয়। কিন্তু স্বর্ণর বিয়ে হল খাশ কলকাতার মধ্যে।

দীপুর মায়ের মনেপ্রাণে প্রার্থনা ছিল—দীপুকে যেন 'কলকাতা ছাড়া' হতে না হয়, তা হল না। দীপুকে বিয়ে হয়ে চলে যেতে হল কলকাতার বাইরে একটা মফঃস্বল শহরে।

তা এই রকমই তো হয় সাধারণ মানুষের। অথবা সব মানুষেরই। অসাধারণদের। ক'জন আর জীবনটাকে আপন ইচ্ছের ছাঁচে ঢালাই করে নিয়ে স্বস্তি-সন্তোষের মধ্যে কাটাতে পায়?

দীপুর মার চাওয়ার মধ্যে আর কোনো কারণ ছিল না। দীপুর মার তো মনে মনে ধারণা ছিল কলকাতা নামক এই শহরটার মধ্যে 'বন্ধন'টা যেন বড় প্রত্যক্ষ, গ্রামে গঞ্জে বোধ হয় একটা মুক্তির স্বাদ মেলে। যেখানে মেয়েদের এমনভাবে চার দেওয়ালের মধ্যেই জীবনটা কাটিয়ে চলতে হয় না। তবু দীপুর মায়ের একান্ত প্রার্থনা ছিল দীপু যেন কলকাতার মধ্যে থাকতে পায়। গ্রামে গঞ্জে মফঃস্বলে কোথাও চলে যেতে হলে দীপু কি আর লেখালেখি করার সুযোগ পাবে?

এই হতাশ প্রশ্নটি নিয়েই দীপুর মাকে মেয়ের বিয়ের তোড়জোড় করে চলতে হচ্ছে। শুভাথী আত্মীয়দের দ্বারা আনীত 'সম্বন্ধ' যাকে নাকি সব বিষয়েই ভাল বলা যায়, সেই সম্বন্ধকে দীপুর মা কোন্ মুখে বাতিল করতে চাইবে? পনেরো বছর পার করে বসে আছে যে মেয়ে।

ঝুনো সংসারীদের কাছে অবশ্য সরস্বতী চিরদিনই 'পাগল' আখ্যা পেয়ে এসেছেন। কিন্তু সে আলাদা। এখন এমন অদ্ভুত আবদেরে আচরণ করতে চাইলে সকলে মিলে 'পুরো পাগল' আখ্যা দিয়ে গরাদে পাঠাতে চাইবে না?

অতএব দীপুর মা মেয়ের বিয়ের ঠিক হয়ে যাওয়ায় উল্লসিত নয়, বিষণ্ণতা

আচ্ছন্ন করে রেখেছিল স্বর্ণর মাকেও মেয়ের বিয়ের সময়। সকলে ভেবেছিল 'মন-কেমনে'র জন্যে! একটা মাত্র মেয়ে! আহা!

কিন্তু দীপুর মায়ের বেলায় তো সে প্রশ্ন নেই। এই তো আরও একটা মেয়ে মেঘে মেঘে বেলা বইয়ে বিয়ের যুগ্যি হয়ে উঠছে। মণি আসছে মাঝে-মাঝেই মায়ের কাছে, ম্যালেরিয়ায় রোগা শরীরটাকে সারাতে। হয়তো আর একবারও আসবে শীগগির আতুড় তোলাতে। তবে? শূন্যতার অবকাশ আছে সরস্বতীর?

বিষণ্ণতার এই কারণটি তো আর কারুর কাছে বলা যায় না! স্বামীর কাছেও নয়। মেয়েটার কাছেও নয়। যদিও দুজনের 'কারণে'র সঙ্গে আদৌ কোনো মিল নেই।

কিন্তু মেয়ে দুটো?

স্বর্ণ তো বাপেরবাড়ির কাছাকাছি শ্বশুরবাড়ি। পাছে দূরে শ্বশুরবাড়ি হয় এই ভয়ে বেচারি কখনো পা ছড়িয়ে বসে ভাত খায় নি। এমন কি পিঁড়ির কাছে পায়ের গাঁট চেপে গেলেও একবারের জন্যেও পা ছড়ায়নি।

স্বর্ণদের বাড়িতে বেটাছেলেরা মস্ত একখানা সাদা পাথরের টেবিলে খেতো। কিন্তু মেয়েরা মাটিতে। স্বর্ণকে অবশ্য কেউ 'মেয়ে' বলে তেমন ধর্তব্য করত না। ইচ্ছে হলে টেবিলে বসে পড় বাবা কাকা দাদার সঙ্গে। ইচ্ছে হলে মাটিতে বোস মা খুড়ির সঙ্গে। তা স্কুলের ছুটির দিনেই যা হইহইটা হতো। ভাগ্যিস হতো, তা নাহলে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে মুস্কিলে পড়তে হতো বেচারীকে।

স্বর্ণর শ্বশুররা যথেষ্ট অবস্থাপন্ন। তাহলেও এখনো যথেষ্ট প্রগতিশীল হয়ে উঠতে পারেনি। তবে ভীষণ নাকি মাণনী। বৌ যে যখন-তখন বাপের বাড়ি যায় এ তাদের ইচ্ছে নয়! গাড়ি পাঠিয়ে দেব, স্বর্ণকে একটু পাঠিরে দেবেন —'পিসিদের এ আবদার খাটছে না। ওঁরা বলেন, কী দরকার? বরং আমাদের গাড়িই যেদিন ওদিকে যাবে, সঙ্গে করে নিয়ে যাব।

তার মানে ফেয়াটি তাদের হাতে থাকবে।

তাছাড়া গান জানা মেয়ে শুনে আহ্লাদে ভেসেছিলেন, কিন্তু একদিনের জন্যেও নাকি স্বর্ণ সেখানে টুঁ শব্দটি করতে পার নি। কবে নাকি এসে দাদার কাছে বলেছে, 'গলাটায় মর্চে পড়ে যাচ্ছে রে দাদা! এরপর আর সুর বেরোবে না।'

তবু আশ্চর্য! স্বর্ণর বেশ সুখী-সুখী ভাব। আর স্বর্ণর মার? ওই নেহাৎ নিরীহ মানুষটির মনস্তত্ত্ব যে এত জটিল তা কে বুঝবে? স্বর্ণর মাও খুশী। খুশী এইজন্যে স্বর্ণর পিসিরা নিজেদেরকে যেন অপমানিত অপমানিত ভেবে আহত হচ্ছেন।

তা যাক, ও তো স্বর্ণর কথা।

দীপু কি তার মায়ের মত বিষণ্ণ হতাশ?

নাকি দীপুর প্রার্থনা ছিল দূরে চলে যেতে পারার! দীপুর মনের মধ্যে যে অহরহ তার দিদির বান্ধবীর বাসরঘরে শোনা একটি গানের দুটি লাইন ঝঙ্কৃত

হয়ে চলে তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। দীপুর দুরেই ভাল।

দীপু একদিন মণিকে বলেই ফেলল, মা যে কেন রাতদিন আমার লেখার ভবিষ্যৎ নিয়ে এত ভাবছেন বুঝি না। ভারী তো লেখা। তাছাড়া ও'রা তো 'লিখিটিখি' জেনেই ঘরে নিচ্ছেন। কোথায় কোথায় কী কী লেখা বেরিয়েছে, উটকে বার বার দেখতে দেওয়া হলো তাঁদের। মনে নেই তোমার? ওঃ।' তুমি তো তখন ছিলে না!

মণি বলল, 'জেনেশুনে'র কথা আর বলিস না দীপু। এই যে স্বর্ণর শ্বশুরবাড়ির ব্যাপার। গান শুনে তারিফ করে মেয়ে পছন্দ করে গেলেন, এখন একদম বিস্মরণ। একবারও কেউ বলে না, 'বৌমা একটা গান গাও।' নিজে নিজে তো আর হারমোনিয়ম নিয়ে সা রে গা মা করতে বসবে না!

দীপু হেসে ফেলেছিল। বলেছিল, গানের সঙ্গে লেখার ওই একটু তফাৎ মণিদি। লেখাটা অনায়াসেই নিজে নিজে খাতাটা টেনে নিয়ে লেখা যায়।

তা লেখা যেন যায়। কিন্তু ছাপানোটা হবে কী করে?

তা দেশ থেকে তো আর ডাক-ব্যবস্থা উঠে যায় নি!

আর যদি তারা অপছন্দ করে?

করলেই হল! শুনিয়ে দেবার মত জবাব নেই হাতে?

হুঁ, তুই নইলে আর উচিত কথা শুনিয়ে দেবে কে? তুই তো আমার থেকেও মুখচোরা।

দীপু অন্যমনস্ক ভাবে বলে, আমি যে কী তোমরা ঠিক জানো? আমি কিন্তু নিজেই জানি না।

তা সত্যিই বুঝি জানে না দীপু, সে নিজে কী! তার মধ্যে যেন আর এক দীপু বসে থেকে, এই মুখচোরা বোকা দীপুটাকে তারিয়ে তারিয়ে দেখে। বুঝিবা করুণা করে।

সেই আর এক দীপু কোথায় ছিল এতদিন? এই তার চেনা দীপু কি তাকে চেনে? তার হদিস পায়? সেই অচেনা দীপুর মধ্যে কী একটা অস্থিরতা জন্ম নিচ্ছে, কী একটা আলোড়ন। যেন অন্য এক জগতের দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে সে। সেখানে যেন কত মানুষের আনাগোনা, কত মানুষের ভিড়। এরা কারা? এদের কি দীপু চেনে?

দীপুর সেই মুখস্থ করা কবিতার দুটো লাইন মনে এসে যায়।

'যে কথা শুনিনি বলি সেই কথা,
যে ব্যথা বুঝি না, জাগে সেই ব্যথা,
জানি না এনেছি কাহার বারতা—
কারে শুনাবার তরে।'

দীপু যেন ভেতর থেকে একটা 'ডাক' পাচ্ছে, তাকে কাউকে কিছু বলতে হবে। কার কথা কাকে বলতে হবে, তা জানে না। শুধু যেন একটা কাজের বোঝা কেউ তার ওপর চাপাতে চাইছে।...

মণি বলেছিল, ওই ডাকঘরের কল্যাণে যদি চালিয়ে যেতে পারিস তো ভাল।

মার তাহলে দুঃখটা যাবে। তবে তোর বরটা কেমন হয় কে জানে। মেয়ে হওয়ার যে কী জ্বালা রে দীপু। তোর জামাইবাবুটি লোক ভালো, নেহাৎই গো-বেচারী। আমার জন্যে তো প্রাণ পড়ে থাকে। তবে গুরুজনদের ভয়ে একদম কাঁটা।

দীপু হেসে উঠেছিল, তা তোমার ভয়েও তো কাঁটা বাবা!

তা যা বলেছিস! সে তো একেবারে অফিসের বড়বাবুর মত ভয়।

দুই বোনের হাস্যোচ্ছ্বাস শুনে সরস্বতী আবার যেন কেমন মনমরা হয়ে গেলেন। কেন? কে জানে! পাগলদের তত্ত্ব কে বোঝে?

এদিকে আবার দীপুর বাবার একধরণের পাগলামি দেখা যাচ্ছে। দীপু তাঁর প্রথম মেয়েও নয় শেষ মেয়েও নয়, তিন নম্বরের একটা মেয়ে মাত্র, অথচ তিনি উঠেপড়ে লেগেছেন দীপুর বিয়েতে খুব ঘটাপটা করবেন। খুব সুন্দর সুচারু করে করবেন।

হয়তো সম্প্রতি পাশের বাড়ির বিয়ের সমারোহ তাঁর চিত্তকে চঞ্চল করেছে। মানুষটি তো বরাবরই একটু সৌখিন আর ছেলেমানুষী ধরনের। তাঁর মনোবাঞ্ছা, বরাসনটি ওদের থেকেও ভাল করে সাজাবেন। ওদের বাড়ির যতটা বড়লোকী বিলিতিআনা ফ্যাসান আছে ততটা সুরুচি নেই। ওরা 'বরাসনে' শুধু মোটা মোটা মখমলের তাকিয়া বসিয়েই সন্তুষ্ট। কিন্তু কত সুন্দর হতো যদি সেই জায়গাটিকে ঘিরে ফুলের ঝালর ঝোলানো হতো! সেই সুন্দরটি করে দেখিয়ে দেবেন দীপুর বাবা।

কিন্তু দীপুর মা তো চিরকাল 'সিরিয়াস'।

অতএব তিনি এই পরিকল্পনার কল্পনা বুঝে ফেলে রেগে আগুন হয়ে গিয়ে প্রশ্ন করলেন, তুমি কী ওদের সঙ্গে পাল্লা দিতে চাও?

পাল্লা?

আকাশ থেকে পড়লেন ভদ্রলোক।

বা, তা কেন? এমনি শখ হচ্ছে।

কেন? এমন অন্যায় শখ হবে কেন?

কী মুস্কিল! ওতে আর কতটুকু বাড়তি খরচ হবে?

সেটা কোনো কথা নয়। বিয়েতে তোমার আত্মীয়রা আসবে না? তোমার ভাই-বোনেরা? তাদের কার মেয়ের বিয়েতে এত বাহার হয়েছে? সানাই বাজাতে গেট বানিয়ে তার ওপর ঘর বানানো হয়েছে?

দীপুর বাবা রেগে উঠে বললেন, তাদের যদি শখ না থাকে! তারা যদি কিপটে হয়! আমাকেও তাই হতে হবে?

হ্যাঁ, হবে। ওসব শখ ছাড়ো।

মণি পাশের ঘরের মধ্যে চুপি চুপি বলল, যাই বলিস বাপু, মা কিন্তু বড় নিষ্ঠুর। সব সময় বাবাকে এমন কঠোর ভাবে কথা বলেন!

প্রসঙ্গটা দীপুর বিয়ে-সংক্রান্ত, তাই দীপু চুপ করেই থাকে। কিন্তু ফুলি

বলে ওঠে, তবে যা বলেন ঠিকই বলেন।

কেন ঠিক? কারুর একটু শখসাধ থাকাতে পারে না?

ফুলি বলল, অবস্থার সঙ্গে মানায় না এমন শখসাধ না থাকাই ভাল।

মণি একটু অবাক হয়। তলে তলে ফুলি আবার এত কথা শিখল কী করে? একটু তপ্ত হয়ে বলল, বাবা এমন কিছু গরীব নয়। একটু কিছু ইচ্ছে হলে—

কিন্তু মা যা বলেছেন সেটাও ভাবো। কাকা জ্যাঠামশাই পিসিরা—সবাই আসবেন তো? তাঁদের কার মেয়ের বিয়েতে তিনশো লোক খেয়েছে? বরের আসনে ফুলের ঝালর ঝুলেছে?

মণি আরো রেগে উঠল। মণিকে বড় এমন রেগে উঠতে দেখা যায় না। আসলে বাবার মনোভঙ্গের কথা ভেবে মণির মন কেমন করছে। শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে বাবার জন্যেই সব থেকে বেশী মন কেমন করে মণির। আর মনে পড়ে বোনেদের থেকে দাদাদেরই বেশী।

মণি রেগে রেগে বলল, দ্যাখ বলবার কথা বাবার দিকেও ঢের আছে। বাবার শরীরে মায়া বেশী তাই কিছু বলেন না। ইচ্ছে করলে বলতে পারতেন, আমার কোন্ ভাই-বোনের বাড়িতে তিন-তিনটে ঠাকুর চাকর ঝি? কার বাড়িতে তিন-তিনটে লাইব্রেরী থেকে বই আসে শুধু বাড়ির গিন্নীর পড়বার জন্যে? কার বাড়িতে মাসে পাঁচসাত টাকার পত্রিকা কেনা হয়? অ্যাঁ, ওগুলো তো মার শখেই!

ফুলিও খুব রেগে বলে, এটা শখ?

তা তুই আমি না হয় বলব মাহাত্ম্য, কিন্তু অন্য লোকে শখই বলবে। এসব খরচ তো বাবাই করেন। কক্ষনো বলেন কিছু? আসলে যা বললাম, বাবার প্রাণে মায়া আছে। মার মতোন কঠোর নয়।

দীপু অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখল মণিকে। মণিকে তো বরাবর একটু বোকা-বোকাই ভেবে এসেছে। তার মধ্যে এমন একটা আলাদা দৃষ্টি রয়েছে! যে দৃষ্টি বদ্ধমূল ধারণার এক মুহূর্তে বদলে যেতে পারে?

মণি এমনভাবে মানবমন বিশ্লেষণ করতে শিখল কখন? তার মানে দূরে গিয়ে মণি এই বাড়ি এই সংসারটি দেখেছে মনে মনে। আর তখনি তার চোখে সঙ্গতি অসঙ্গতি আর 'সত্য'টি ধরা পড়েছে।

দূরে থেকেই বুঝি বেশী স্পষ্ট দেখা যায়। যেমন ছাদে উঠলে রাস্তাটা দেখা যায়, রাস্তায় দাঁড়িয়ে নয়।

দীপুর চোখের সামনে থেকে একটা পর্দা সরে যায়। ওর মনে হয়, তার মানে আমরা যাকে যা ভাবি সে হয়তো ঠিক তা নয়।

বরাবরই দীপু তার সত্যসন্ধ কঠোর কঠিন মাকে বাবার থেকে উঁচু আসন দিয়ে এসেছে। বাবার ছেলেমানুষী শখ, হালকা স্বভাব, কোনো ব্যাপারেই কঠোর হতে না পারাকে একটু এলেবেলের দৃষ্টিতে দেখেছে। হঠাৎ মনে হল, একটা খুব উঁচু আসন বাবার প্রাপ্য। মমতার স্নেহের ভালবাসার আর ক্ষমার ক্ষেত্রে। সত্যিই তো, বাবাকে কোনোদিন মাকে দু কথা শুনিয়ে দিতে

শোনেনি। ছেলেমেয়েদের এতটুকু বকতে ধমকাতে! অথচ সেটা কোনোদিন ভেবে দেখিনি।

বাপেরবাড়ি ছেড়ে চলে যাবার প্রাক্কালে হঠাৎ বাবার জন্যে প্রানটা কাটতে থাকে দীপুর।

কিন্তু প্রাণ-কাটবার বস্তু কি তবু ওই একটাই ?

যেদিকে তাকায় সেদিকেই যে সহস্র বন্ধন।

এ বাড়িটাকে আর দীপু 'আমাদের বাড়ি' বলতে পাবে না। চারিদিকে ছড়ানো এই বইগুলো আর পড়তে পাবে না দীপু। অনেকদিন অনেকদিন পরে এসে, অনধিকারিণীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবে মাত্র।

মেয়েদের জীবনে যেন দুবার মৃত্যু ঘটে। এই তো একবার মৃত্যু ঘটতে চলেছে। দীপু আর এ সংসারের কেউ থাকবে না। হয়তো তখন বইগুলো অগোছালো দেখলে গোছাতে বসলে, মা বলে উঠবেন, 'থাক থাক তুই আবার কেন ? দুদিনের জন্যে এসেছিস।'

আর দীপুর যদি নতুন আসা কোনো বই দেখে পড়তে ইচ্ছে করে, মায়ের কাছে আবেদন করতে হবে, 'মা বইটা নিয়ে যাব ?'

হঠাৎ ভিতর থেকে দারুণ একটা কান্না ঠেলে এলো দীপুর মনের মধ্যে। শ্বশুরবাড়ি চলে যাবে বলে কারো জন্যে মন কেমন করে নয়। এ কান্না নিজের সেই অনধিকারিণীর ভূমিকা কল্পনা করে। এ কান্না নিজের মৃত্যুশোকে।

•

কথায় বলে রাজায় রাজায় দেখা হয় তো বোনে বোনে দেখা হয় না।

দীপুর বিয়ে হয়ে গেলে তো সেই অবস্থাই ঘটবে। তাই মণি এসে রয়েছে কিছুদিন। আর মণি রয়েছে শুনে স্বর্ণ এল একদিন। অবশ্য শ্বশুর বাড়ি থেকে নয়। একদিনের জন্যে বাপের বাড়ি এসেছিল, তার মধ্যেই।

বিয়ে হয়ে সাহস বেড়েছে, তাই সহজেই বলতে পেরেছে, পিসি, একবার মণিদের বাড়ি যাচ্ছি। শুনলাম এসেছে শ্যামনগর থেকে।

পারমিশান পাবার আগেই চলে এল।

মণি থাকলে দীপু আর স্বর্ণদির নাগাল পায় না। ওদের হাসি-গল্পর রেশ কানে আসে সর্বত্র।

আজও তাই হয়েছে। তবে স্বর্ণ শ্বশুরবাড়ির বৌ হয়েছে তাই সরস্বতী ভাল করে জলখাবার সাজিয়ে বললেন, দিয়ে আয় তো দীপু। আমি আর ওদের হাসিগল্পর মাঝখানে গিয়ে ব্যাঘাত ঘটাবো না।

দীপু বলল, দুটো রেকাবি ?

মণিকেও দিবি একটা। দুই বন্ধু একসঙ্গে খাবে।

হাসলেন একটু। বললেন, মণিও তো অন্যবাড়ির বৌ। অতিথির মর্যাদাটা পাক।

অতিথির মর্যাদা।

দীপুর মধ্যে আবার সেই আলোড়নটা উঠল। আশ্চর্য। কত সহজে কত

অবলীলায় একথাটা উচ্চারণ করলেন মা।

দীপু দুহাতে দুটো রেকাবি নিয়ে ঘরে ঢোকবার মুখে হঠাৎ শুনতে পেল 'দাদা।' তারপর শুনতে পেল 'দীপু।'

দীপুর পা স্থির হয়ে গেল।

কী বলছে স্বর্ণদি দীপুর সম্পর্কে? এসব কী কথা?

তুই একবার বলে দেখ তো ভাই মণি। মেয়েপক্ষ থেকে না বললে তো আর বিয়ের কথা এগোয় না। সত্যি বলতে প্রায় দাদার মুখ চেয়েই আমি এই কথাটাই বলতে এসেছি।...অবিশ্যি আমারও খুব ভাল লাগবে দীপু যদি আমার বৌদি হয়।...হি হি হি! পরের বাড়ির মেয়ে বলে ভয় সমীহ করতে হবে না। মাসিমাকে বল্ তুই।

রেকাবি দুটো যে হাত থেকে পড়ে যায়নি এই দীপুর পরম ভাগ্যি।

এঘরে এসে বলল, এই ফুলি, খাবারটা স্বর্ণদি আর মণিদিকে দিয়ে আয় তো। আমার হঠাৎ কী রকম মাথাটা ঘুরে উঠল।

তা ঘুরবে না? ফুলি তাড়াতাড়ি ওর হাত থেকে খাবারের থালা দুটো নিয়ে বলে ওঠে, বাপির বিছানা নিয়ে ছাতে রোদ্দুরে দাওগে। বসে পড়ো বাবা! কী রোদ তখন। উঃ।

যখন তখন কোনো একটা ছুতো করে ছাতে ওঠা যে একটা নেশা হয়ে উঠেছে, তা এখনো ধরতে পারেনি ফুলি। বাড়ির আর কেউও না।

কিন্তু কেন ওঠে?

শুধু পাশের বাড়ি তিনতলার কোনো একটা ঘরের একাংশ দেখতে পাওয়া যায়, শুধু মাত্র তো এই। দেওয়ালটা মাত্র।

স্বর্ণ চলে যাবার পর মণি মায়ের কাছে এল উদ্ভাসিত মুখে।

কিন্তু ফিরল কি তেমনি আলো আলো মুখে?

সরস্বতী যে প্রস্তাবটাকে একদম নস্যাৎ করে দিয়ে বলবেন, তোর বোকা বন্ধুটা পাগলের মত একটা কথা বলেছে বলে, আমিও পাগল হবো? ওদের ওই রূপের কার্তিক ছেলে, বাড়ির প্রথম ছেলে, তার জন্যে নিশ্চয় ডানাকাটা পরীর অর্ডার দেওয়া হয়ে গেছে। তাছাড়া সেরা বনেদি ঘরে ছাড়া কাজ করবে না। বলতে গিয়ে হাস্যাস্পদ হবেই!

মাগো! স্বর্ণর মায়েরও মন আছে। তিনি না কি স্বর্ণর কাছে বলেছেন, তোর দাদা যাতে খুশী হয় সেটাই তো ভাবতে হবে। পরী নিয়ে কে ধুয়ে জল খাবে?

তার কথা বাদ দে। তার কথা কে পোঁছে? বাপকাকা আর মহারাণী ভিক্টোরিয়া পিসিরাই সব।

তবু একবার বলে দেখলেই বা কী হয়, মেয়ের বিয়েয় কত নতিস্বীকার করতে হয়।

ইচ্ছে হয় তোদের বাপকে বলগে। আমার দ্বারা 'ছোট' হওয়া সম্ভব নয়।

তা বেচারী মণি মরীয়া হয়ে বাবাকেও বলেছিল।

বাবা আকাশ থেকে পড়লেন।

আমি? আমি বলতে যাবো ওই সাহেব-বাড়িতে আমার যেমন-তেমন মেয়ের কথা নিয়ে? ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে তোর মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে দেখছি। তাছাড়া—এদিকে এই বিয়ের কথাটা প্রায় পাকা হয়ে গেছে। তা হয় নারে।

অতএব তা হল না। অহমিকা যে বড়লোকেরই একচেটে তা নয়। গরীবের অহমিকাটি আবার তার থেকে বেশী মজবুত।

দীপুর বিয়েতে বরাসনে ফুলের ঝালর দোলেনি, রোসুন চৌকীও বসেনি। দীপুর বাবা মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে বলেছিলেন, 'আমি আর এতে নেই। ছেলেরা যা পারে করুক।'

তবে নেমন্তন্ন-পত্র ছাড়া হয়ে গিয়েছিল আগেই। কাজেই নিমন্ত্রিতের সংখ্যা বেশীই রয়ে গেল।

কিন্তু এত লোকের ভিড়েও দীপুর মনের মধ্যে একটা গভীর শূন্যতা। স্বর্ণদি এল না তার বিয়েতে। এল না স্বর্ণদিদের বাড়িরও কেউ। দীপুর বিয়ের দিনই স্বর্ণর এক ননদের বিয়ের দিন স্থির করা হয়ে আছে।

নতুন কুটুম! দুবেলার মত নেমন্তন্ন করে গেছে তারা অনুরোধ করে। এমন কি বাড়ির ঝি-চাকরদের পর্যন্ত।

আর পিসিরা? সেও এক সুবর্ণ যোগাযোগ। বিয়ের দিনটায় তিথিটা পড়েছে একাদশী। অতএব ঘুরচেন তাঁরা বিয়ে-বাড়িতে সারাদিন গরদের থানের ওপর গরদের চাদর জড়িয়ে। 'জলস্পর্শে'র অনুরোধটি আসবে না।

এই সুযোগে 'মেয়ে'র বাড়িতে অন্ধি-সন্ধি সব দেখে নেওয়া যাবে।

দীপুর বিযের দিন তাই স্বর্ণদের বাড়িটা সারাদিন তালাবন্ধ পড়ে রইল। শুধু গেটএ দ্বারোয়ানটি রইল মাত্র।

তবে বিয়ের আগেরদিন ওদের পুরনো ঝিয়ের হাতে বাহিত হয়ে আইবুড়ো ভাতের শাড়ি আর একথালা ক্ষীরমোহন এসে হাজির হল। দামী শাড়িই। সঙ্গে এল বেণু।

বেণু বলল, খুব মনখারাপ লাগছে একই দিনে ওদের বাড়িতে বিয়ে পড়ায়। কী করা যাবে। নতুন কুটুম। সবাই না গেলে হয়তো স্বর্ণকে কথা শুনতে হবে।

তারপর নিজের চাঁপার কলি আঙুল থেকে একটি পান্না বসানো আংটি খুলে (বিধবার না কি এই আংটি পরা চলে।) চুপিচুপি বলেছিলেন, তোমাকে আমার খুব ভাল একটা গহনা দেবার ইচ্ছে ছিল দীপু। কিন্তু গহনাগুলো তো আর আমার কাছে নেই। তবু খুব ইচ্ছে করছে। এটা তুমি পরো।

না না না। বেণুপিসি! তোমার এই সুন্দর আঙুলে কত সুন্দর দেখাচ্ছে চুনীর আংটির পাশে পান্নার আংটি।

আমায় আবার সুন্দর দেখানো। গলায় দড়ি। তুই পরবি, তাতেই আমার সুখ। তারপর একটু কেমন লজ্জা লজ্জা হেসে বলেছিলেন, তুলে রাখ। এখানে পরিসনি, শ্বশুর বাড়িতে পরিস! সেজদির তীক্ষ্ণদৃষ্টি। ওনাকে তো বলতে আঙুল থেকে পড়ে হারিয়ে গেছে।

না। সে আংটি দীপু নেয়নি। নিতে পারে নি। বলেছিল, আমার জন্য তোমায় শুধু শুধু মিছেকথা বলতে হবে? ছিঃ।

বেণু মলিন মুখে বলল, 'শুধু শুধু' কেন? খুব ইচ্ছে মেটাবার জন্যেই তো—

তা হোক। মনে কর তোমার দেওয়া আংটি আমি মনে মনে পরে বেড়াচ্ছি। লুকোচুরি! না না। ছিঃ।

খুবই ম্রিয়মাণ হয়ে চলে গিয়েছিলেন বেণু!

আর তার পরই স্বর্ণর শ্বশুরবাড়ি থেকে তত্ত্ব এসেছিল। হালকা জরির ক্রেপ বেনারসী, প্রসাধনের নানান সামগ্রী, আর বড় বারকোষের একভর্তি বড় বড় সন্দেশ! ড্রাইভারের সঙ্গে ঝি দিয়ে গাড়ি করে পাঠিয়ে দিয়েছে।

দীপুর জ্যেঠি খুড়ি পিসিরা এসে গিয়েছিলেন আগের দিনই। তাঁদের গালে হাত। তাকিয়ে বলে ওঠেন, ওমা বন্ধুর শ্বশুরবাড়ি থেকে? আমরা ভাবছি, বুঝি বরের বাড়ি থেকেই আগের দিন গায়ে হলুদের তত্ত্ব পাঠিয়ে দিয়েছে। কী চমৎকার কাপড় দ্যাখ দীপু! খুব বন্ধু একখানা বাগিয়েছিলেন বাবা।

এই বলার মধ্যে আহ্লাদও ছিল আক্ষেপও ছিল বৈ কি।

তাঁদের কারুর কোনো মেয়েই তো এমন একখানা বন্ধু বাগাতে পারে নি!

কিন্তু দীপুর কি তখন শাড়ি দেখবার মন?

দাসীর হাতে স্বর্ণ দীপুকে যে চিঠিখানা দিয়েছে সেটা নিয়ে তো দীপু ছাতে চলে গেছে। ছাতটা আজ থেকেই হোগলা ছাওয়া হয়েছে। একপাশে ডাঁই করে আনাজপাতি ঢালা। রাত্রে মহিলার দল কুটনোয় বসবেন। এখন কেউ কোথাও নেই। রাশীকৃত মাটির খুরি গেলাস কলাপাতা রয়েছে। দীপু একটা কোণে একখানা কলাপাতা পেতে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে পড়ল।

স্বর্ণর হাতের লেখা তেমন সুন্দর নয়, কিন্তু স্বর্ণর মনের ভাষাটি বড় সুন্দর।

লিখেছে, ভাই দীপু, ভাগ্যচক্রের খেলা। তোর বিয়েতে যেতে পেলাম না। তুই শ্বশুরবাড়ি চলে যাবি, তার আগে একবার দেখাও হল না। ভীষণ মন খারাপ লাগছে। আরো খারাপ লাগছে দাদার কথা ভেবে। দাদাকেও তো এই বাড়িতেই বন্দী হয়ে থাকতে হবে, কড়া পাহারার মধ্যে। তোর কনে সাজা চেহারাটা একবার দেখতেও পাবে না।

দাদা তোকে সত্যিই ছোটবোনের মত স্নেহ করে। হয়তো বা তারও বেশী। বন্ধুর মতই। অন্য একটা ইচ্ছে হয়েছিল তা সে তো হল না উচ্চবাচ্যও কিছু শুনলাম না। তোর মা হয়তো পিসিদের কাছে অপদস্থই হয়েছেন। এখন ভেবে লজ্জা করছে, যা হয়েছে ভালই। হয়তো ধরাধরির জোরে তাকে ঘরে এনে

হ্যানস্থাই করতেন ওনারা। এমনিতেই তো বৌ জিনিসটাই হ্যানস্থার। তা বৌরাই যে শুধু পরাধীন তা নয়, ছেলেরাও কম পরাধীন নয়। দাদা কি বলতে পারল, 'তোমরা তো সবাই কুটুম বাড়ি যাচ্ছ, আমি পাড়ার বিয়েটাতেই থাকি। পাড়ার লোকের সাহায্য করাও তো উচিত।' ও বাবা! তাহলেই হয়েছে।

তোর সঙ্গে আবার কবে দেখা হবে কে জানে। এই যে আমি। শুনতে বড়-লোকের বাড়ির বৌ, গাড়ি আছে ড্রাইভার আছে। তবু একটিবারের জন্যে গিয়ে কি তোর শাড়িটা নিজের হাতে দিয়ে আসতে পেলাম? ও বাবা।

পাশের খবর বেরোবার পর আমায় কলেজে ভর্তি করা হয়েছে। কিন্তু যাওয়া আসা বাড়ির গাড়িতে, সঙ্গে পুরনো-দাসী! সে আবার টিফিন নিয়ে যায় সঙ্গে করে। আর অন্যদের সামনে আমায় জোর করে ধমকে ধমকে গাদা গাদা ফল-মিষ্টি খাবার-দাবার খাইয়ে ছাড়ে। এত লজ্জা করে। কিন্তু উপায় নেই। দাসীকেও মেনে চলতে হয় বৌদের। আমার মনে হয় বরং গেরস্থালি বাড়িই ভাল। তোদের বাড়িটা আমার তাই অত ভাল লাগে।...যদি শ্বশুরবাড়ির লোকের দাপটে তোর গল্প লেখা বন্ধ না হয়, তো এই আমাদের মতন বৌদের কথা-টথা লিখিস। যাদের দেখে মনে হয় খুব সুখী। অথচ ভেতরে সুখী নয়। বরং দুঃখীই।

আর যদি লেখা বন্ধ হয়ে যায় তো 'হয়েই গেল।'

যাক, বিয়ের দিনে তোকে যতসব আবোল তাবোল লিখলাম। আসলে আজকেই চিঠিলেখার একটা ছুতো পেলাম। আর কাজের ব্যস্ততায় কেউ দেখতে আসবে না, 'কই কী লিখলে বন্ধুকে, দেখি?' বলে। তোর বিয়ের নেমন্তন্নর চিঠিটা থেকে তোর শ্বশুরবাড়ির ঠিকানাটা লিখে নিয়েছি লুকিয়ে। সুবিধে হলে. কলেজে গিয়ে কোনো বন্ধুর হাত দিয়ে পাঠিয়ে দেব।...এবাড়িতে 'পিসি' বলে কিছু নেই বটে। তবে শ্বাশুড়ী একাই একশো। আর তাঁর বুদ্ধিদায়িনী ওই পুরনো ঝি-টি।

আমার অনেক অনেক স্নেহ ভালবাসা নিস। তোর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা যেন খুব ভাল হয় ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা। আর একটা কথা, দাদা তো তোকে বলবার কোনো সুযোগ পেল না, তাই আমায় বলতে বলেছিল, 'দীপু, তুমি রান্নাঘর-ভাঁড়ার ঘরের মধ্যে হারিয়ে যেও না। তোমার নাম সার্থক করে দীপমালা হয়ে জ্বলে ওঠো।'

ইতি স্বর্ণদি

এই অমূল্য চিঠিখানা কোথায় রাখবে দীপু? যে জায়গাটা থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছে সেখানে দীপুর নিজস্ব কোনো জায়গা কি আছে? কে বলতে পারে কারো হাতে পড়ে যাবে কিনা।

আর যেখানে যাচ্ছে?

সে তো একটা অজানা অন্ধকার লোক। বলতে গেলে পরলোকেরই মতই। আর বুকের মধ্যেই বা কতক্ষণ রাখতে পারে? বিয়ের কনে তো পাঁচজনের হাতের পুতুল। আর অসহায়।

চিঠিখানা কুচিকুচি করে ছিঁড়ে নিশ্চিহ্ন করে ফেলে দেওয়া ছাড়া আর উপায় কী ?

হঠাৎ বিয়ের কনেকে কোথাও খুঁজে না পেয়ে বাড়িতে তোলপাড় চলছিল। তবে বকাবকির উপায় আর রইল না কারুর অন্যদের উদভ্রান্ত করার জন্যে। আগামীকাল যে মেয়ের বিয়ে হবে, সে যদি নিভৃতে কোথাও গিয়ে কেঁদে-কেঁদে চোখ-মুখ ফুলিয়ে উপুড় হয়ে পড়ে থাকে, দোষ দেওয়া যায় না।

বিয়ে হয়ে গেল। কেমন একটা আচ্ছন্নতার মধ্যে।

দীপু যেন যন্ত্রচালিত হয়ে গেছে।

দীপুর বাসরে গান-টানের তেমন কোনো পার্টি ছিল না।

শুধু সন্ধ্যেবেলা দুটো ছোট মেয়ে 'পরস্পর-বিরোধী' কণ্ঠে একসঙ্গে গোঙিয়ে গোঙিয়ে গেয়েছিল।

'অন্তর মধুময় প্রীতি-ভরা।
ওগো মরমে চারু আঁখি নত-করা।

লাইন বারে বারে ভুলে যাচ্ছিল. আর তাদের মা শুধরে দিচ্ছিল—

আজি কি সুখের নিশি
আজি কি হাসিছে দিশি
'আজ কি মধুর সাজে সেজেছে ধরা।'

বলল, শেষটা ভুলে গেছি।

থামলে যেন হাড়ে বাতাস লাগল।

কিন্তু স্বর্ণর বিয়ের বাসরে যে গান গেয়েছিল, সে এখানে উপস্থিত থাকলেও কি বাসরে গান গাইতে আসতো ?

আগের দিন অনেক কান্না খরচ করে ফেলেছিল বলেই কি দীপু নামের মেয়েটা 'মেয়ে বিদেয়'-এর সময় এমন শুকিয়ে খটখটে হয়ে রইল ?

ওর মধ্যে যে কোনো 'ভাব' কাজ করছে তা বোঝা গেল না।

বরকনে বিদেয়। চিরকালীন দৃশ্য। শোকাবহ দুঃখাবহ।

শৈশবাবধিই দেখে আসছে দীপু। বহু বহু অভিনীত নাটকের একটি দৃশ্য। পুতুলের বিয়ের খেলা। যার অভিজ্ঞতায় শুরু।

কিন্তু দর্শকের আসনে বসে দেখার অভিজ্ঞতায় আর নিজে মঞ্চে উঠে অভিনয়ের সামিল হওয়া এক নয়।

তাই দীপুর মা যখন ঘোড়ার গাড়ির দরজার কাছে এসে আঁচল দিয়ে মেয়ের পায়ের তলা মুছিয়ে দিয়ে মনে মনে মন্ত্রটি উচ্চারণ করলেন, 'কখনো যেন তোমার পায়ে কাঁটাটি ফোটে—।' আর দীপুর হাতে ধরিয়ে দেওয়া 'কনকাঞ্জলির থালাটা দীপু মায়ের আঁচলে ঢেলে দিয়ে বলতে বাধ্য হল, 'এতদিন তোমাদের যা খেয়েছি পরেছি সব শোধ করে দিয়ে গেলাম।' তখন দীপুর মনে হল এর থেকে নির্লজ্জ আর নিষ্ঠুর প্রথা বোধহয় পৃথিবীতে আর দুটি নেই।

মা-বাপের মৃত্যু ঘটলে ছেলেকে দিয়ে মৃতের মুখাগ্নি করাতে হয় এটাই প্রথা। নির্মম নিষ্ঠুর প্রথা। কিন্তু মেয়েকে দিয়ে জীবিত মা-বাপের মুখে এই

আগুনের গোলাছুঁড়ে দেওয়া ? মা দ্রুত ফিরে গেলেন মেয়ের দিকে আর না তাকিয়ে।

আর দীপুর এতক্ষণের বালির চড়া-পড়া চোখে উথলে উঠল জোয়ারের জল।

সহিস কোচম্যান তৎপর হল।

আর ঠিক এই মুহূর্তে একটা ছোট মেয়ে কোথা থেকে ছুটে এলো বুকের ওপরে জড়করা সবুজ সিল্কের ফিতেয় বাঁধা উঁচু হয়ে ওঠা একগোছা নতুন বই নিয়ে। কোনো মতে গাড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে বলল, 'এটা কনেকে দিয়ে দিতে বলল।'

বরকর্তাও গাড়ির মধ্যে। ভুরু কুচকে বললেন, 'কে বলল ?'

ওই যে ফর্সামতন একটা ছেলে বলল। বিয়েতে আসতে পারেনি আর এতক্ষণ মেয়েদের ভিড়ে এখানেও চলে আসতে পারে নি।...কনের আত্মীয়।

বরের বাপ ভুরুটা আরো কুঁচকে বললেন, 'একেই গাড়ির মধ্যে জায়গা নেই, আবার শেষ বাজারে—গাড়ির মাথায় তুলে দিলে হতো।

দীপু একটি শান্ত গম্ভীর স্বর শুনতে পেল, 'থাক থাক। জায়গা হয়ে যাবে।'...এই স্বরই বিগত রাত্রের মন্ত্র উচ্চারণ করা স্বর ?...

দীপুর মাথায় বেনারসী শাড়ির ঘোমটা।

দীপুর উপায় নেই গাড়ির খড়খড়ি বন্ধ জানালা ঠেলে খুলে উদভ্রান্ত দৃষ্টিটাকে বাইরে নিক্ষেপ করবার।

অতএব দীপু ঘোড়ার পিঠে সহিসের হাতের চাবুকের সপাং শব্দটা শুনতে পেল, এবং টের পেল গাড়ি তড়বড়িয়ে ছুটতে শুরু করেছে !...যাবে হাওড়া স্টেশনে।

গাড়ি ছুটতে থাকে। দীপুর মনে হয় সে যেন ক্রমেই একটা অন্ধকার গহ্বরের তলায় তলিয়ে যাচ্চে

দীপুর জানা নেই তাকে যেখানে যেতে হচ্ছে, সেই জায়গাটা কেমন ! কেমন ঘরবাড়ি, কেমন পরিবেশ কেমনই বা সেখানের মানুষগুলো। কিন্তু কোন্ মেয়েটাই বা জেনে বুঝে যেতে পায় ? এটাই তো মেয়েদের জীবনের পরম রহস্য !

গোয়েন্দা গল্পের ডাকাত-টাকাতরা যেমন কাউকে ধরে নিয়ে গিয়ে চোখ বেঁধে কোথাও নিয়ে গিয়ে ফেলে, এবং সম্পূর্ণ অপরিচিত একটা জায়গায় নিয়ে গিয়ে ফেলে চোখের বাঁধন খুলে দেয়, এও তো প্রায়ই তাই।

ঘোমটার আড়াল থেকে তো আন্দাজও করা যাচ্ছে না, কী রকম দৃশ্যের মধ্য দিয়ে রেলগাড়িটা ছুটে চলেছে।

অতএব দীপুর মনে হচ্ছে এই ছুটে চলাটা বুঝি পাতালের পথে। অজানা অন্ধকারে।

দীপু কী ওই অন্ধকারের মধ্যেই চিরতরের মত তলিয়ে যাবে ?

দীপু রান্না ভাঁড়ার ঘরের মধ্যে হারিয়ে যাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে ?

না কি কোনো এক দূর কালে কোথাও কোনোখানে কোনো নতুন দিগন্তে দীপমানা হয়ে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে পারবে ?

দীপু জানে না। দীপু বুঝতে পারছে না।

তবু এই তলিয়ে যাবার অনুভূতির মধ্যেও কি মন্ত্র-উচ্চারণের সেই শান্ত গম্ভীর কণ্ঠই দীপুকে যেন একটা আশ্বাসের বাণী জানিয়ে দিয়ে চলেছে—'জায়গা হয়ে যাবে। দীপু, এই একটুখানি পরিসরের মধ্যেও জায়গা হয়ে যাবে তোমার স্বপ্নের, তোমার সম্ভাবনার, তোমার বৃহতের সাধনার আর তোমার শপথের।...এখান থেকেই তোমার উত্তরণ ঘটবে—অজানিত অভাবিত দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে।'

ছুটে চলেছে রেলগাড়িটা। আর—তার দুরন্ত শব্দের মধ্যেও ধ্বনিত হয়ে চলেছে সেই আশ্বাসবাণী।

—শেষ—